ফসলের রোগ ও আগাছা

CROP DISEASES AND WEEDS

BAE 5201



স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট

SCHOOL OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট
SCHOOL OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

BAE ৫২০১

ফসলের রোগ ও আগাছা
CROP DISEASES AND WEEDS

কোর্স ডিভেলপ্‌মেন্ট টিম

লেখক

ড. হাসান আশরাফউজ্জামান

উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদক

ড. মোঃ তোফাজ্জল ইসলাম

ড. মোঃ শাহ আলম সরকার

ডা. আ ন ম আমিনুর রহমান

স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

রচনাশৈলী সম্পাদক

ড. মোঃ শাহ আলম সরকার

ডা. আ ন ম আমিনুর রহমান

স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সমন্বয়কারী

ড. আবু হেনা মোঃ ফারুক

স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

এ কোর্সবইটি রেফারি কর্তৃক নিরীক্ষণের পর বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট এর ছাত্রদের জন্য মুদ্রিত হয়েছে।

ফসলের রোগ ও আগাছা

(PHASALER ROGH O AGACHHA)
CROP DISEASES AND WEEDS

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

ড. আবু হেনা মোঃ ফারুক
ডীন, স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

PHASALER ROGH O AGACHHA (Crop Diseases and Weeds), a 2 Credit Coursebook for the Bachelor of Agricultural Education Programme. **Written by :** Dr. Hasan Ashrafuzzaman. **Edited by :** Md. Tofazzal Islam, Md. Shah Alam Sarker & Dr. A N M Aminoor Rahman. **Style Edited by :** Md. Shah Alam Sarker & Dr. A N M Aminoor Rahman. **Published by :** Publishing, Printing & Distribution Division, Bangladesh Open University, Gazipur-1704. © School of Agriculture and Rural Development, Bangladesh Open University. **First Edition :** December 1997. **Computer Compose & D.T.P :** Md. Abdur Rahman. **Cover Design :** Md. Monirul Islam. **Cover Photographs Provided by :** Dr. A N M Aminoor Rahman. **Inside Photographs Provided by :** Dr. Hasan Ashrafuzzaman. **Illustration :** Dr. Hasan Ashrafuzzaman. **Printed by :** Hazi Printing and Packaging Ltd. 147/6 Arambag, Dhaka- 1000.

ISBN 984-34-5023-X

সূচিপত্র

পাঠ নির্দেশনা

"ফসলের রোগ ও আগাছা" কোর্সবইটি বিশেষভাবে স্কুল অভ্ এগ্রিকালচার এন্ড রুর‌্যাল ডিভেলপ্মেন্ট এর বিএজিএড প্রোগ্রামের ছাত্রদের জন্য লেখা হয়েছে। আপনি জানেন, দূর শিক্ষণে শিক্ষকের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি নেই। তাই পাঠের কোনো কঠিন বিষয় যেন আপনার বুঝতে অসুবিধা না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখেই কোর্সবইটি লেখা হয়েছে। কোর্সবইটির আঙ্গিক ও উপস্থাপনা তাই প্রচলিত পাঠ্যবই থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরনের। যেহেতু সরাসরি শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই কোর্সবইটি আপনাকে নিজে পড়ে বুঝতে হবে, তাই এটি কীভাবে পড়বেন প্রথমেই তা জেনে নিন। এতে কোর্সবইটি পড়তে ও বুঝতে আপনার সুবিধা হবে।

কোর্সবইটির রূপরেখা

''ফসলের রোগ ও আগাছা'' কোর্সবইটি সাতটি ইউনিটে বিভক্ত। প্রতিটি ইউনিটে একাধিক পাঠ রয়েছে। পাঠ সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে ইউনিটের বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করে। ইউনিটের পাঠগুলোকে আলাদা করে সাজানো হলেও এদের মধ্যে একটি যোগস ত্র রয়েছে। এ কোর্সবইটির পাণ্ডুলিপি রচনা করেছেন ড. হাসান আশরাফউজ্জামান, প্রফেসর, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

ইউনিটের ভূমিকা

প্রতিটি ইউনিটের শুরুতেই রয়েছে একটি ভূমিকা। ভূমিকায় ইউনিটের বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য এবং গুর€ত্ব সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। ইউনিটটিতে কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সংক্ষেপে তারও উল্লেখ রয়েছে। এতে আপনি ইউনিটের শুরুতেই জেনে যাচ্ছেন পাঠের মূল আলোচ্যসূচি কী?

পাঠের উদ্দেশ্য

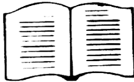
লক্ষ্য করবেন প্রতিটি পাঠের শুরুতে এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য দেয়া আছে। প্রতিটি উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই পাঠের বিষয়বস্তু সহজভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পাঠ শেষে পাঠের উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করা সম্ভব হয়েছে কী না তা নিজে নিজেই ম ল্যায়ন করবেন। এজন্য পাঠ শেষে স্বমূল্যায়ন প্রশ্ন রয়েছে। এতে আপনি পাঠটি কতটুকু বুঝতে পারলেন তা নির্ধারণ করতে পারবেন।

আইকনের (Icon) ব্যবহার

পাঠের বিষয়বস্তুগুলো একদৃষ্টিতে বুঝে নেয়ার জন্য প্রয়োজন অনুসারে কোর্সবইটির বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের প্রতীক বা আইকন ব্যবহার করা হয়েছে, যা দেখে আপনি সহজেই বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা এবং আপনার করণীয় কী তা বুঝতে পারবেন। নিম্নে এ কোর্সবইটিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের আইকনের অর্থ নির্দেশ করা হলো-

 +  = পড়ুন ও লক্ষ্য করুন

 = পাঠের উদ্দেশ্য

 = আবশ্যিক পাঠ/সারমর্ম



= ছবি দেখুন

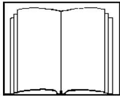
= অনুশীলন/চূড়ান্ত মূল্যায়ন



= পাঠোত্তর মূল্যায়ন



= উত্তরমালা



= তথ্যসূত্র

বক্স লিখন



পাঠের গুরুত্বপ র্ণ শিক্ষণীয় অংশকে আরও আকর্ষণীয় করে প্রদর্শনের জন্য মাঝে মাঝেই "বক্স লিখনের" মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি "বক্স লিখন" মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং মনে রাখার চেষ্টা করুন।

অনুশীলন

আপনি পাঠটি ভালোভাবে বুঝতে পারছেন কি-না তা যাচাই করার জন্য পাঠের মাঝে কোনো কোনো জায়গায় দেয়া রয়েছে অনুশীলন। অনুশীলনগুলো আপনাকে সমাধান করতে হবে। এসব অনুশীলন আপনার জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

সারমর্ম

প্রতিটি পাঠেই সারমর্ম দেয়া আছে। সারমর্ম পড়ে আপনি নির্দিষ্ট পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অতি সহজেই ধারণা নিতে পারবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

প্রতিটি পাঠের শেষে আপনি পাঠটি কতটুকু বুঝতে পেরেছেন তা যাচাইয়ের জন্য রয়েছে পাঠোত্তর মূল্যায়ন। পাঠটি ভালোভাবে বুঝার পর পাঠোত্তর ম ল্যায়নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার চেষ্টা করুন। অতঃপর আপনার দেয়া উত্তর ইউনিট শেষে দেয়া উত্তরের সাথে মিলিয়ে নিন। সবগুলো উত্তর সঠিক হলে পরবর্তী পাঠ শুরু করুন অন্যথায় পাঠটি পুণরায় পড়ুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

প্রতি ইউনিটের শেষে রয়েছে চূড়ান্ত মূল্যায়ন। এতে সংক্ষিপ্ত ও রচনাম লক প্রশ্ন রয়েছে। এ প্রশ্নগুলোর উত্তর তৈরি করার চেষ্টা করুন, যা আপনাকে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে সাহায্য করবে। এক্ষেত্রে তথ্যস ত্রের পুস্তকগুলোর সাহায্য নিতে পারেন। এছাড়া প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সাথেও কথা বলতে পারেন। ইউনিটের সবগুলো পাঠ ভালোভাবে পড়লে চূড়ান্ত মূল্যায়নের প্রশ্নগুলো সমাধানে কোনো অসুবিধা হবে না।

ইউনিট ১
উদ্ভিদ রোগের ধারণা, গুরুত্ব ও প্রেক্ষাপট

ইউনিট ১ উদ্ভিদ রোগের ধারণা, গুরুত্ব ও প্রেক্ষাপট

উদ্ভিদ রোগ পৃথিবীর বুকে এমন কোনো নতুন ঘটনা নয়। রোগ হলে উদ্ভিদের দেহক্রিয়ায় গোলযোগ দেখা দেয়। ফলে উদ্ভিদের গোটা দেহে বা দেহাংশে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যহত হয়। অনেক সময় অকাল মৃত্যু হয়। মৃত্যু না হলেও উদ্ভিদের ফলন অনেক কমে যায়। বিভিন্ন

রোগের জন্য বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন বিভিন্ন হারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রোগের জন্য এ ক্ষতির পরিমাণ শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ। ফসল উৎপাদন হ্রাস ছাড়াও কৃষি পরিকল্পনা, কৃষি ব্যবস্থা, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদির ওপরও উদ্ভিদের রোগের প্রভাব বিপুল। উদ্ভিদে রোগ বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, রোগের ফলে ফসলের চাষ বন্ধ হয়ে কৃষি ব্যবস্থা পাল্টে যায়। মহামারীর সৃষ্টি হয় ফলে মানুষ নিজ এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ফসলের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হওয়ায় মানুষকে খাদ্যাভ্যাস পাল্টাতে হয়। কাঁচামালের অভাবে অনেকক্ষেত্রে শিল্পকারখানার উৎপাদন ব্যহত হয়। খাদ্য বিষাক্ত

হওয়ায় মানুষ ও পশুপাখি ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত হয়। সামগ্রিকভাবে মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট হয়। এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে উদ্ভিদ রোগের উৎপত্তি ও বিস্তার, লক্ষণ, শ্রেণিবিভাগ, রোগনাশকের শ্রেণিবিভাগ ও প্রয়োগ পদ্ধতি, রোগজীবাণু শণাক্তকরণ প্রভৃতি বিষয়গুলো তাত্তিক ও ব্যবহারিকসহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

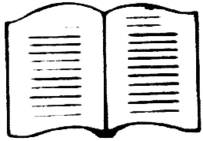
পাঠ ১.১ উদ্ভিদ রোগের উৎপত্তি ও বিস্তার



এ পাঠ শেষে আপনি –

- উদ্ভিদের রোগ বলতে কী বুঝায় তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- উদ্ভিদ রোগের কারণসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।
- উদ্ভিদ রোগ কীভাবে বিস্তারলাভ করে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

উদ্ভিদ রোগের উৎপত্তি



সাধারণ অবস্থায় গাছ পূর্ণ বিকশিত হওয়ার জন্য এর দেহাভ্যান্তরে স্বাভাবিক কাজগুলো সম্পন্ন হয়। ঐ কাজগুলো সর্বদাই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সমতা রক্ষা করে চলে। এ সমতায় বিঘ্ন ঘটলেই রোগের উৎপত্তি হয়। বিভিন্ন ধরনের রোগ উৎপাদক এ বিঘ্ন ঘটায়। গাছ ও রোগ উৎপাদকের মধ্যে অবিরাম মিথষ্ক্রিয়ার (interaction) ফলে গাছে যে বিকৃত ধরনের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া চলতে থাকে তার ফলে গাছের দেহে ধারাবাহিকভাবে রোগের লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। যতক্ষণ রোগে গাছটি মরে না যায় বা গাছের প্রতিক্রিয়ার ফলে রোগ উৎপাদক নিষ্ক্রিয় না হয়ে পড়ে ততক্ষণ উভয়ের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া চলতে

গাছের কোনো অংশ রোগাক্রান্ত হলে ঐ অংশের কোষগুলোর স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা লোপ পেতে থাকে ও আনুষাঙ্গিক লক্ষণগুলো ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে থাকে।

থাকে এবং রোগের বিভিন্ন লক্ষণ ক্রমান্বয়ে প্রকাশ পেতে থাকে। গাছের কোনো অংশ রোগাক্রান্ত হলে ঐ অংশের কোষগুলোর স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা লোপ পেতে থাকে এবং আনুষাঙ্গিক লক্ষণগুলো ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে থাকে। ফলে, গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে অকালে মৃত্যু হতে পারে। আর

মৃত্যু না হলেও গাছের ফলন কমে যায়। উদ্ভিদ রোগের কারণসম হকে প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা-

উদ্ভিদ রোগের জীবীয় কারণ

- উদ্ভিদ – যথা, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, শৈবাল, পরগাছা, মাইকোপ্লাজমা ও পাইম মোল্ড ইত্যাদি।
- প্রাণী – যথা, কৃমি, পোকামাকড়, মাইট ইত্যাদি।
- ভাইরাস ও ভাইরোয়েডজাতীয় অতি ক্ষুদ্র সংক্রামক নিউক্লিওপ্রোটিন কণা।

ব্যাকটেরিয়া

ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদ রোগের অন্যতম কারণ। ব্যাকটেরিয়া এককোষী উদ্ভিদ কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সবুজ কণাবিহীন। এদের নিউক্লিয়াস সরল ও সাইটোপ্লাজমের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থাকে এবং অনুপ্রস্থ বা দ্বিভাজন পদ্ধতিতে প্রজনন সম্পন্ন করে। এদের দেহে এক বা একাধিক ফ্লাজেলা থাকতে পারে এবং কতিপয় প্রজাতি স্পোর উৎপন্ন করে। এরা মৃতজীবী অথবা পরজীবী এবং বায়ুজীবী অথবা অবায়ুজীবী। এরা গোলাকার, লম্বা, কমা অথবা প্যাঁচানো হতে পারে। তবে উদ্ভিদে রোগ সৃষ্টিকারী সকল ব্যাকটেরিয়া লম্বাকৃতির। চিত্র ১ দেখুন।



চিত্র ১ ঃ ব্যাকটেরিয়া (সঞ্চালকযুক্ত)

ছত্রাক

ছত্রাক সবুজকণাবিহীন উদ্ভিদ। এদের কোনে কান্ড, শিকড় ও পাতা নেই। এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা প্রস্তুত করতে পারে না। এ কারণে এরা মৃতজীবী, পরজীবী অথবা মিথোজীবী। এদের দেহ এককোষী বা শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট, সূতাকৃতি এবং বহুকোষী। এরা চলাফেরা করতে পারে না। যৌন বা অযৌন পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করে। কোষপ্রাচীর কাইটিন দ্বারা নির্মিত। এদের সঞ্চিত খাদ্য গ্লাইকোজেন। অধিকাংশ উদ্ভিদ রোগ ছত্রাক দ্বারা হয়ে থাকে। ছত্রাকের জন্য চিত্র ২ দেখুন।

চিত্র ২ ঃ ছত্রাক
ক- এককোষী বিভিন্ন ধরনের ছত্রাক
খ- বহুকোষী সূতাকৃতি ছত্রাক

মাইকোপ-াজমা



মাইকোপ্লাজমা ক্ষুদ্রতম ব্যাকটেরিয়া থেকে অনেক ছোট এবং আলোক মাইক্রোস্কোপে দেখা যায় না। বস্তুত এদেরকে জীবজগতের ক্ষুদ্রতম কোষ বলা যেতে পারে। এদের কোষ

প্রাচীর নেই কিন্তু তিনস্তরবিশিষ্ট অত্যন্ত সম্প্রসারণশীল (elastic) প্লাজমামেমব্রেন দ্বারা আবৃত। এরা দ্বি-বিভাজন পদ্ধতিতে, স্পোর উৎপাদনের মাধ্যমে প্রজনন ক্রিয়া সম্পন্ন করে। এরা পরজীবী অথবা অপরজীবী এবং

টেট্রাসাইক্লিন এন্টিবায়োটিকে অত্যন্ত সংবেদনশীল। মাইকোপ্লাজমার জন্য চিত্র ৩ দেখুন।

চিত্র ৩ ঃ মাইকোপ-াজমা

রোগ উৎপাদক কৃমির মুখে বর্শার মতো স্টাইলেট নামে এক প্রকার অঙ্গ থাকে। এর মাধ্যমে কৃমিরা গাছকে দংশন করে রস শোষণ করে।

কৃমি

কৃমি খুবই ছোট আকৃতির জীব ও দেখতে মূলা, নাশপাতি, লেবু, লাটিম অথবা সূতার ন্যায়। এদের মুখ, পাকস্থলী ও লেজ আছে। রোগ উৎপাদক কৃমির মুখে বর্শার মতো স্টাইলেট নামে এক প্রকার অঙ্গ থাকে। এর মাধ্যমে কৃমিরা গাছকে দংশন করে রস শোষণ করে। এদের খাদ্যনালী, রেচকনালী ও প্রজনন অঙ্গ আছে। স্ত্রী কৃমি পুরুষ কৃমি থেকে বড় এবং একসঙ্গে ৫০০-৩০০০টি ডিম পড়তে পারে। কৃমির জন্য চিত্র ৪ দেখুন।

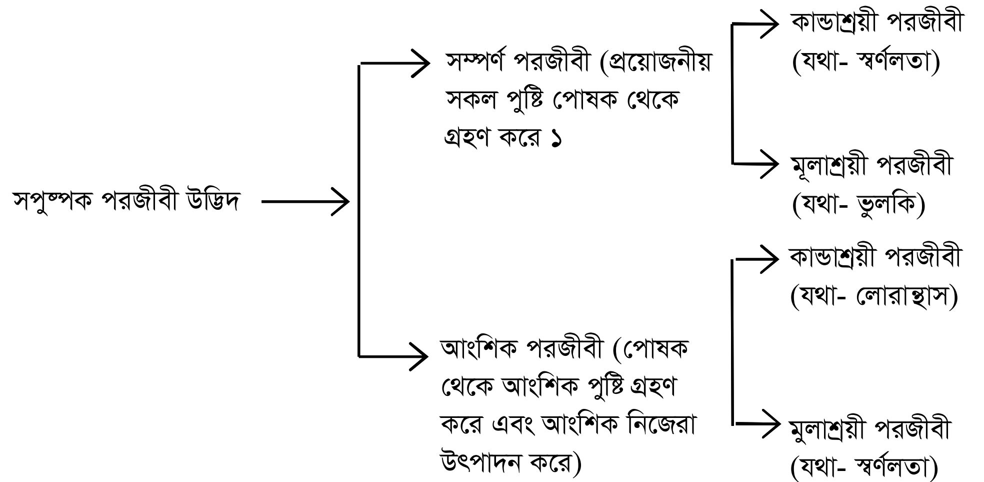


চিত্র ৪ ঃ কৃমি (স্টাইলেট)

যেসব পরজীবী কান্ডকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে সেগুলোকে কান্ডাশ্রয়ী এবং যেগুলো মূলকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে সেগুলোকে মূলাশ্রয়ী পরজীবী বলা হয়।

সপুশ্পক পরজীবী উদ্ভিদ

এরা এক প্রকার উদ্ভিদ এবং জীবনধারণের প্রকৃতি অনুযায়ী এদেরকে দুভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা- সম্পূর্ণ পরজীবী ও আংশিক পরজীবী। আবার যেসব পরজীবী কান্ডকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে সেগুলোকে কান্ডাশ্রয়ী এবং যেগুলো মূলকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে সেগুলোকে মূলাশ্রয়ী পরজীবী বলা হয়। নিচে সপুষ্পক পরজীবীর একটি তালিকা দেওয়া হলো।



শেওলা

শেওলার সবুজকণা আছে বিধায় নিজের খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে। এদের দেহ মূল ও পাতায় বিভক্ত নয়। এরা সরাসরি গাছে রোগ সৃষ্টি করতে পারে না। তবে ছত্রাকের সঙ্গে জন্মে পাতা, কান্ড ও ডালপালায় ছোট ছোট দাগ সৃষ্টি করে সালোকসংশ্লেষণে ব্যাঘাত ঘটায়। সিফালিউরস নামে এক প্রকার শেওলা ছত্রাকের সঙ্গে জন্মে আম ও চা গাছের পাতার উপরিভাগে কালো বর্ণের আচ্ছাদন সৃষ্টি করে সালোকসংশ্লেষণে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটায়।

ভাইরাস

ভাইরাস অতি আণুবিক্ষণিক গোলাকৃতি, দন্ডাকৃতি, সুতাকৃতি, বহুভুজাকৃতি সংক্রমণাক্তক এক প্রকার নিউক্লিওপ্রোটিন। অর্থাৎ ভাইরাস কণা নিউক্লিইক এসিড (ডি.এন.এ অথবা আর.এন.এ) ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত। ভাইরাসের সংক্রামক অংশ হচ্ছে এর ডি.এন. এ বা আর.এন.এ. অণু। প্রোটিন এ নিউক্লিক এসিডকে আবৃত করে রাখে ও ভাইরাস কণাকে আকৃতি প্রদান করে। প্রোটিন অংশের কোনো

> প্রোটোপ্লাজমের মতো ভাইরাসও সক্রিয় এবং পোষক কোষে অবিকল প্রতিরূপ পুনরুৎপাদন করে সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

সংক্রামক ক্ষমতা নেই। ভাইরাস বাধ্যতাম লক পরজীবী এবং জীবে রোগ সৃষ্টি করে। প্রোটোপ্লাজমের মতো ভাইরাসও সক্রিয় এবং পোষক কোষে অবিকল প্রতিরূপ পুনরুৎপাদন করে সংখ্যা বৃদ্ধি করে কোষ বা প্রোটোপ্লাজমসম্পন্ন জীবদের ন্যায় দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে সংখ্যা বৃদ্ধি না করে ভাইরাস পোষক কোষের সহায়তায় প্রতিলেপন পদ্ধতিতে প্রজনন কার্য সম্পাদন করে। জড় পদার্থে কখনো কোনো অবস্থাতেই প্রজনন ঘটে না। এসব গুণাবলীর জন্য ভাইরাসকে জীব বলে মনে করা হয়। ভাইরাসে আবার জড় পদার্থের অনেকগুলো গুণ আছে। ভাইরাস নিউক্লিওপ্রোটিনের স্ফটিক, রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় এবং কোষের বাহিরে কোনো প্রকার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ছাড়াই এদেরকে অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রাখা যায়। ভাইরাসের কলেবর বৃদ্ধি ঘটে না এবং এদের বিভাজনও ঘটে না;

শ্বসন ও বিপাক হয় না। এসব গুণের জন্য ভাইরাসকে জীব বলা যায় না। এককথায় জীবন্ত কোষে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সমর্থ অতি আণুবীক্ষণিক রোগ সংক্রমণকারী নিউক্লিওপ্রোটিন কণিকাকে ভাইরাস বলা হয়।

উদ্ভিদ রোগের অজীবীয় কারণ

> জমিতে খাদ্যোপাদান ও বৃদ্ধির উপযোগী উপাদানের আধিক্য বা ঘাটতি থাকলে এবং আবহাওয়া ও পরিবেশ গাছ বৃদ্ধির উপযোগী না থাকলে গাছে ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে।

অজীবীয় কারণগুলোর কোনো প্রাণ নেই। জমিতে খাদ্যোপাদান ও বৃদ্ধির উপযোগী উপাদানের আধিক্য বা ঘাটতি থাকলে, আবহাওয়া ও পরিবেশ গাছ বৃদ্ধির উপযোগী না থাকলে গাছে ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে। অজীবীয় কারণসমূহ হলো-

মাটি- মাটির গঠন, আর্দ্রতা, অ্লতা ও ক্ষারত্ব, জৈব বিষ, পুষ্টির অসাম্যতা গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। তাই মাটিতে এসবের ঘাটতি বা আধিক্য দেখা দিলে গাছ রোগগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

আবহাওয়া- বায়ুর আর্দ্রতা, তাপমাত্রা, গতিবেগ; আলোর পরিমাণ, বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টি, তুষার ঝড়, বরফ ইত্যাদি আবহাওয়াজনিত উপাদান। এসব উপাদানের তারতম্য হলেই গাছে রোগের প্রকোপতা বাড়ে বা কমে।

দূষিত বায়ুমন্ডল- শিল্পকারখানা থেকে নির্গত বিষাক্ত গ্যাস, ধোয়া, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, সালফার-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি বায়ুমন্ডলকে দ ষিত করে গাছের শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপে বিঘ্ন ঘটায় এবং গাছ স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে পারে না।

রাসায়নিক পদার্থ- ছত্রাকনাশক, কীটনাশক, আগাছানাশক প্রভৃতি পরিবেশকে দ ষিত করে গাছের বৃদ্ধিকে ব্যহত করতে পারে।

উদ্ভিদ রোগের বিস্তার

উদ্ভিদ রোগ বিভিন্ন মাধ্যমে বিস্তৃত হয়। বীজ, মাটি অথবা উদ্ভিদের অংশবিশেষ, পানি, বায়ু, পশুপক্ষি, কীটপতঙ্গ, কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, এমনকি মানুষও নিজে দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন

প্রকারের উদ্ভিদের মাধ্যমে রোগ উৎপাদক একস্থান থেকে অন্যস্থানে, একদেশ থেকে অন্যদেশে, দুরদ রাস্তে ছড়িয়ে পড়ে।

দিগন্তের সমান্তরালে যে বায়ু চলাচল করে তা রোগ উৎপাদক বিস্তারে (বিশেষ করে ছত্রাক স্ফোর) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বায়ুর গতি ও প্রকৃতির ওপর স্ফোরের বিস্তার নির্ভর করে। কারণ, স্ফোরধারক থেকে স্ফোর মুক্ত হওয়ার পর বায়ুর মাধ্যমেই এটি বিভিন্ন স্থানে দ রদ রান্ে ছড়িয়ে পড়ে।

সাধারণত মৃত্তিকাস্থিত রোগাক্রান্ত উদ্ভিদের পরিত্যক্ত অংশসমূহের মাধ্যমে রোগ উৎপাদক রোগদ ষিত এলাকা থেকে রোগমুক্ত এলাকায় স্থানান্তরিত হয়। চাষাবাদের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি এমনকি পায়ের জুতোও একস্থান থেকে অন্যস্থানে মাটি স্থানান্তরিত করে রোগ উৎপাদক বিস্তারে সাহায্য করে। অনেক সময় মাটির ক্ষয়সাধনের দ্বারা রোগ উৎপাদক বিভিন্ন স্থানে ছড়ায়। রোগদ ষিত জমি থেকে সংগৃহীত গাছ গাছড়ার শিকড়, শল্ককন্দ, স্ফীতকন্দ প্রভৃতির সঙ্গে মাটির যে সকল কণা লেগে থাকে তাদের মাধ্যমেও রোগ উৎপাদক একস্থান থেকে অন্যস্থানে অতি সহজে বিস্তারলাভ করে থাকে।

বীজ রোগ বিস্তারে সাহায্য করে। বীজের ওপরে ও ভিতরে রোগজীবাণু বেঁচে থাকে। ঐ বীজ বপনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে রোগ দেখা দেয়।

বীজ রোগবিস্তারে সাহায্য করে। বীজের ওপরে ও ভিতরে রোগজীবাণু বেঁচে থাকে। ঐ বীজ বপনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে রোগ দেখা দেয়। প্রকৃত বীজ ছাড়া গাছের যে সকল অংশ (যথা- মূল, শল্ককন্দ, স্ফীতকন্দ ইত্যাদি) রোপণ করে ফসল উৎপাদন করা হয় তাদের মাধ্যমেও রোগ জীবাণু বিভিন্ন স্থানে বিস্তার লাভ করে রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

পানি রোগ জীবাণু বিস্তারের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বায়ুতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা না থাকলে অনেক ছত্রাকের স্ফোর মুক্ত হতে পারে না। বৃষ্টি, বায়ুর আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়াও এরা সরাসরি রোগ বিস্তারে সাহায্য করে। বৃষ্টির ফোঁটা যখন গাছের পাতা, কান্ড ও মাটিতে অবস্থিত ছত্রাক স্ফোর বা ব্যাকটেরিয়ার ওপর পড়ে তখন এরা চারিদিকে বিস্তৃত হয়ে পার্শ্ববর্তী গাছের সুস্থ পাতা ও কান্ডে রোগ উৎপন্ন করে। চলন্ত বা সেচের পানি, বৃষ্টির পানি, খালবিল ও নদীর পানি এক স্তর থেকে অন্য স্তরে এবং এক ক্ষেত থেকে অন্য ক্ষেতে প্রবাহিত হওয়ার সময় রোগজীবাণু বহন করে আনে ও রোগ উৎপন্ন করে। সাধারণত কৃমি, ব্যাকটেরিয়া ও সঞ্চরণশীল স্ফোর উৎপাদনকারী ছত্রাক এভাবে বিস্তারলাভ করে।

কীটপতঙ্গ রোগ বিস্তারের অন্যতম প্রধান সহায়ক। অনেক সময় জীবাণু পতঙ্গের শরীরে আটকে যায়। ঐ পতঙ্গ যখন খাদ্যের অন্বেষণে অন্য গাছে যায় তখন রোগজীবাণু এদের শরীর হতে ঐ গাছে স্থানান্তরিত হয়ে রোগ উৎপন্ন করে।

কীটপতঙ্গ রোগ বিস্তারের অন্যতম প্রধান সহায়ক। অনেক সময় জীবাণু পতঙ্গের শরীরে আটকে যায়। ঐ পতঙ্গ যখন খাদ্যের অন্বেষণে অন্য গাছে যায় তখন রোগজীবাণু এদের শরীর হতে ঐ গাছে স্থানান্তরিত হয়ে রোগ উৎপন্ন করে। অনেক সময় পতঙ্গ ছত্রাক স্ফোর খেয়ে ফেলে ও পরে এর মাধ্যমে স্ে্ফার অন্যান্য গাছে স্থানান্ রিত হয়ে বিভিন্ন ক্ষতের মধ্য দিয়ে গাছের দেহে প্রবেশ করে রোগ সৃষ্টি করে। মৌমাছি অনেক সময় মুখে ও পায়ে ব্যাকটেরিয়া বহন করে থাকে। পরে মধু আহরণের সময় এরা বিভিন্ন ফুলের মঞ্জুরীতে ব্যাকটেরিয়া স্থানান্তরিত করে রোগ বিস্তার করে থাকে। ভাইরাস রোগ বিস্তারে পতঙ্গের ভূমিকা অপরিসীম। যেসব ভাইরাস যান্ত্রিক উপায়ে স্থানান্তরিত করা যায় না সেসব

ভাইরাস স্থানান্তরে পতঙ্গ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সাধারণত জাবপোকা, লিফহপার, থ্রিপস, শেতাঙ্গ মাছি, বিটল এবং গ্রাসহপার ভাইরাস বিস্তারে সাহায্য করে থাকে।

মানুষ তার প্রয়োজনে বীজ, চারাগাছ, বড়গাছ বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে দূরদ রান্তে বহন করার সময় ঐসবের সঙ্গে নানাবিধ রোগজীবাণ ও স্থানান্তরিত

অনেক পাখি রোগদূষিত পোকা খেয়ে রোগজীবাণু অনেক দূরে নিয়ে যেতে পারে। পাখির পালকে স্কোর আটকিয়েও স্কোর ছড়াতে পারে। খরগোশ, ইঁদুর প্রভৃতি লোমযুক্ত জন্তুর লোমের সঙ্গে রোগজীবাণু বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হয়ে সুস্থ গাছে রোগ সংক্রমণ করতে পারে। অনেক স্থানে নতুন রোগ সৃষ্টির জন্য প্রধাণত মানুষ দায়ী। যাতায়াত ও ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার রোগ ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ তার প্রয়োজনে বীজ, চারাগাছ, বড়গাছ বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে দূরদ রান্তে বহন করার সময় ঐসবের সঙ্গে নানাবিধ রোগজীবাণ ও স্থানান্তরিত করে রোগ বিস্তার করে থাকে। মূলত মানুষ প্রায়ই ভালোর সঙ্গে মন্দ বহন করে আনে।



সারমর্ম ঃ উদ্ভিদ ও রোগ উৎপাদকের মধ্যে অবিরাম মিথস্ক্রিয়ার ফলে উদ্ভিদে বিভিন্ন প্রকারের লক্ষণ প্রকাশের মাধ্যমে রোগ সৃষ্টি হয় এজন্য কিছু কিছু জীবীয় কারণ (যথা- পাইম মোল্ড, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, শৈবাল, পরগাছা, মাইকোপ্লাজমা), কিছু কিছু অজীবীয় কারণ (যথা- মাটি, আবহাওয়া, রাসায়নিক পদার্থ, দূষিত বায়ুমন্ডল) ও ভাইরাস বিশেষভাবে জড়িত। বীজ, মাটি, পানি, বায়ু, পশুপক্ষি, কীটপতঙ্গ, কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্র পাতির মাধ্যমে এসব রোগ উৎপাদক ছড়িয়ে বিভিন্ন স্থানে রোগ বিস্তার করে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। গাছের দেহে ধারাবাহিকভাবে রোগের লক্ষণ দেখা দিতে থাকে কোন্ কারণে?
- ক) গাছের কিছু অংশ কেটে ফেললে
- খ) গাছকে একস্থান থেকে উঠিয়ে অন্যস্থানে লাগালে
- গ) গাছের উপর রোগ উৎপাদক পড়লে
- ঘ) গাছ ও রোগ উৎপাদকের মধ্যে অবিরাম মিথষ্ক্রিয়ার ফলে

২। ছত্রাক বলতে কী বুঝায়?
- ক) এককোষী জলজ উদ্ভিদ
- খ) বহুকোষী উদ্ভিদ
- গ) মূল, কান্ড ও পাতাবিহীন উদ্ভিদ
- ঘ) মূল, কান্ড, পাতা ও সবুজ কণাবিহীন উদ্ভিদ

৩। ভাইরাস বলতে কী বুঝায়?
- ক) রোগ সৃষ্টিকারী এককোষী উদ্ভিদ
- খ) রোগ সৃষ্টিকারী এককোষী সবুজকণাবিহীন উদ্ভিদ
- গ) রোগ সৃষ্টিকারী বহুকোষী সবুজ কণাবিহীন উদ্ভিদ
- ঘ) রোগ সৃষ্টিকারী অতি ক্ষুদ্রতম সংক্রমনাত্তক নিউক্লিওপ্রোটিন

৪। উদ্ভিদ রোগ বিস্তারের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম কোন্টি?
- ক) মাটি
- খ) পানি
- গ) বায়ু
- ঘ) বীজ

৫। ভাইরাস রোগ বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে কোন্টি?
- ক) পতঙ্গ
- খ) পাখি
- গ) মানুষ
- ঘ) পানি

৬। দূরদ রাস্তে রোগ বিস্তারে সাহায্য করে কোন্টি?
- ক) পাখি
- খ) মানুষ
- গ) পতঙ্গ
- ঘ) পানি

পাঠ ১.২ উদ্ভিদ রোগের লক্ষণ



এ পাঠ শেষে আপনি –

- উদ্ভিদ রোগের লক্ষণ বলতে কী বুঝায় তা ব্যাখ্যা করে বলতে পারবেন।
- উদ্ভিদ রোগের লক্ষণকে কতভাগে বিভক্ত করা যায় তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- উদ্ভিদ রোগের বিভিন্ন লক্ষণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।



রোগের লক্ষণ

ফসলের নানাবিধ রোগের লক্ষণ প্রতিদিনই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু রোগের লক্ষণ বলতে আমরা কী বুঝি? সাধারণ অবস্থায় গাছ পূর্ণবিকশিত হওয়ার জন্য দেহাভ্যন্তরে জীবনের স্বাভাবিক কাজগুলো সম্পন্ন হয়। ঐ কাজগুলো সর্বদাই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে চলে। এ সমতায় বিঘ্ন ঘটলেই রোগের সূত্রপাত হয়। একটি গাছের কোনো অংশ রোগাক্রান্ত হলে ঐ অংশের কোষগুলোর স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা লোপ পেতে থাকে এবং গাছে রোগের আনুষাঙ্গিক লক্ষণগুলো ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে থাকে। গাছ ও রোগ উৎপাদকের মধ্যে অবিরাম মিথক্রিয়ার ফলে গাছে যে বিকৃত ধরনের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া চলতে থাকে তার ফলে গাছের দেহে ধারাবাহিকভাবে বিকৃতির চিহ্ন বা লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। আসলে লক্ষণ রোগের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

> গাছ ও রোগ উৎপাদকের মধ্যে অবিরাম মিথক্রিয়ার ফলে গাছে যে বিকৃত ধরনের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া চলতে থাকে তার ফলে গাছের দেহে ধারাবাহিকভাবে বিকৃতির চিহ্ন বা লক্ষণ দেখা

উদ্ভিদ রোগের লক্ষণের শ্রেণিবিভাজন

উদ্ভিদের লক্ষণগুলোকে প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন-

- নেক্রোটিক লক্ষণ (Necrotic Symptom)
- হাইপারপ্লাস্টিক লক্ষণ (Hyperplastic Symptom)
- হাইপোপ্লাস্টিক লক্ষণ (Hypoplastic Symptom)

নেক্রোটিক লক্ষণ

উদ্ভিদ বা কলার মৃত্যুজনিত লক্ষণকে নেক্রোটিক লক্ষণ বলে। গাছে আক্রান্ত অংশের মৃত কলা বা টিস্যু পচে বাদামি রঙ ধারণ করাকে নেক্রোসিস (Necroses) বলে। নেক্রোসিসের দরুন গাছের ত্বকে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং নানা প্রকারের দাগ উৎপন্ন হয়। নেক্রোসিসজনিত কতকগুলো লক্ষণ নিচে বর্ণনা করা হলো।

দাগ (Spot) ঃ নেক্রোসিসের জন্য বিভিন্ন আকৃতি ও রঙের দাগ হয়। কোনো কোনো দাগের চারিদিকে হলুদ রঙের বলয় দ্বারা ঘেরা থাকে (যথা- ধান গাছের বাদামি দাগ রোগ)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাগগুলো সীমিত প্রকৃতির এবং বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার। কখনো কখনো দাগগুলো পরস্পরের সাথে মিশে বড় দাগ সৃষ্টি করতে পারে। দাগ সাধারণত হালকা থেকে গাঢ় বাদামি রঙের ও শুকনো প্রকৃতির হয়। তবে ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগে ভেজা ধরনের দাগও হতে পারে। অনেক সময় দাগের বাহির ও ভিতরের দিকে বিভিন্ন রঙ হয়। কিছু রোগে দাগের ভিতরের অংশ খসে পড়ে ছিদ্রওয়ালা দাগ সৃষ্টি করে থাকে এবং লক্ষণকে 'শট হোল' বলা হয়। যথা- বিট ও পুঁই গাছের *Cercospora* জনিত রোগ। (চিত্র ৫কঃ ১,২,৩ দেখুন)

> পাতা ও কান্ডে লোহার মরিচার মতো লালচে রঙের দাগ হয়। এ দাগকে পস্টিউল (Postule) বলে।

মরিচা (Rust) ঃ পাতা ও কান্ডে লোহার মরিচার মতো লালচে রঙের দাগ হয়। এ দাগকে পস্টিউল (Postule) বলে। (চিত্র ৫কঃ ৯ দেখুন)

ব্লাইট (Blight) ঃ গাছের পাতা, ফুল, কান্ড বা কান্ডের অংশ বিশেষের দ্রুত মৃত্যু হওয়াকে ব্লাইট বা মড়ক বলে। আক্রান্ত অংশ অনেকটা পোড়ার মতো মনে হয়। যথা- ধানের ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট, আপেলের ফায়ার ব্লাইট রোগ। অনেক সময় মৃত অংশ পচে দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে। যথা- আলুর লেইট ব্লাইট রোগ। (চিত্র ৫কঃ ৬ দেখুন)

ক্যাঙ্কার (Canker) ঃ এ রোগে গাছের ছাল বা বাকল নষ্ট হয়ে কান্ডের ভিতরের কাঠ বের হয়ে আসে। সাধারণত ক্ষতের চারপাশে 'ক্যালাস'জাতীয় বিশেষ কলার সৃষ্টি হয়ে কিছুটা উঁচু হয়ে ওঠে। যথা- গোলাপের ক্যাঙ্কার রোগ। (চিত্র ৫খঃ ১০ দেখুন)

ডাইব্যাক বা আগা মরা (Die back) ঃ এ রোগে গাছের শাখা ও উপশাখা আগা থেকে আরম্ভ করে নিচের দিকে শুকিয়ে আসতে থাকে। যথা- লেবু গাছের ডাইব্যাক বলে। (চিত্র ২৮ দেখুন)

এনথ্রাকনোজ (Anthracnose) ঃ গাছের কান্ড, পাতা বা ফলে বসে যাওয়ার মতো দাগ হয় এবং দাগের মধ্যে কালো কাঁটার মতো ছত্রাকের এসারভুলাস (acervulus) দেখা যায়। যথা- *Colletotrichum* আক্রান্ত জনিত পাট, আম, মরিচের দাগ। (চিত্র ২২ দেখুন)

ড্যাম্পিং অফ বা নেতিয়ে পড়া (Damping off) ঃ বীজতলায় চারার কান্ডে মাটিসংলগ্ন স্থানে কোষ নরম হয়ে যায়। ফলে ভার বহন করতে না পেরে চারা মাটিতে নেতিয়ে পড়ে মরে যায়। *Pythium, Rhizoctonia* প্রভৃতির আক্রমণে এ রোগ হয়।

ঢলে পড়া (Wilting) ঃ রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে অনেক সময় গাছের পাতা ও ডালপালা পানির স্বল্পতার দরুন নুয়ে পড়ে। এ রোগে দিনের বেলায় নিচের দিকের কয়েকটি পাতা নেতিয়ে পড়ে এবং সন্ধ্যায় আবার স্বাভাবিক সতেজ অবস্থায় ফিরে আসে। ক্রমশ নেতিয়ে পড়াটা স্থায়ী হয় এবং আরও উপরের দিকের পাতায় এ লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। নেতানো পাতা হলদে হয়ে শুকিয়ে যায় বা ঝরে পড়ে। *Fusarium* ও *Verticillium* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। (চিত্র ৫কঃ ৪ দেখুন)

গামোসিস (Gumosis) ঃ এ রোগে ক্ষতস্থান থেকে আঁঠা নির্গত হয়। এ আঁঠা ক্ষতস্থানের চারপাশে শক্ত হয়ে যায়। যথা- *Phytophthora* জনিত লেবু গাছের আঁঠা ঝরা রোগ।

> আক্রান্ত অংশের কোষ পচে নষ্ট হওয়াকে পচন বলে। পচা অংশ সর্বদা ভেজা ও পিচ্ছিল থাকলে নরম পচা এবং পচা অংশ বাদামি রঙ ধারণ করে শুকিয়ে ঝুরঝুরা হলে শুকনো পচা বলে।

পচন (Rot) ঃ আক্রান্ত অংশের কোষ পচে নষ্ট হওয়াকে পচন বলে। পচা অংশ সর্বদা ভেজা ও পিচ্ছিল থাকলে নরম পচা এবং পচা অংশ বাদামি রঙ ধারণ করে শুকিয়ে ঝুরঝুরা হলে শুকনো পচা বলে (চিত্র ৩৮)। আলুর *Erwinea* ব্যাকটেরিয়া দ্বারা নরম পচা ও *Fusarium* নামক ছত্রাক দ্বারা শুকনো পচা রোগ হয়।

গুড়ি পচা (Foot rot) ঃ এ রোগে গাছের গোড়ার দিকটা জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বাদামি-কালচে রঙের পচা দাগ উৎপন্ন করে। এর ফলে গাছ আস্তে আস্তে শুকিয়ে যেতে থাকে। যথা- ধানের গুড়ি পচা রোগ। (চিত্র ৫খঃ ১৪ দেখুন)

পাউডারী মিলডিউ (Powdery mildew) ঃ এ রোগে পাতার ওপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সাদা দাগের সৃষ্টি হয়। আক্রান্ত অংশ সাদা খড়িমাটির গুড়োর মতো মনে হয়। রোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে সাদা রঙ বাদামি হয়ে আসে। যথা- ধান, কুমড়া ও লাউয়ের পাউডারি মিলডিউ রোগ।

> অস্বাভাবিক কোষ বিভক্তির ফলে কোষের সংখ্যা, আকার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে গাছের বিভিন্ন অংশ ফুলে ওঠাকে হাইপারপ্লাস্টিক লক্ষণ বলে।

হাইপারপ্লাস্টিক লক্ষণ (Hyperplastic symptom)

অস্বাভাবিক কোষ বিভক্তির ফলে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অথবা কোষের আকার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধির ফলে গাছের বিভিন্ন অংশ ফুলে ওঠাকে হাইপারপ্লাস্টিক লক্ষণ বলে। এখানে কয়েকটি হাইপারপ্লাস্টিক লক্ষণের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

স্ক্যাব (Scab)ঃ এ রোগে গাছের ত্বক ফেটে মামড়ি পড়ার মতো হয়ে খসখসে হয়। যথা- *Streptomyces* জনিত আলুর পাউডারী স্ক্যাব রোগ। (চিত্র ৫খঃ ১৩ দেখুন)

চিত্র ৫ ক ঃ উদ্ভিদ রোগের লক্ষণ
১-৩ বিভিন্ন প্রকারের দাগ, ৪- ঢলে পড়া, ৫- শিকড় গিঁট,
৬- ব্লাইট, ৭- পাতা গুটানো, ৮- পাকারিং ও ৯- মরিচা।

গল (Gall) ঃ রোগাক্রান্ত অংশের কোষ দ্রুত বিভক্তির ফলে স্ফীত হয়ে গল সৃষ্টি হয়। যথা- *Agrobacterium* এর আক্রমণে টমেটো গাছে গল হয়। (চিত্র ৫খঃ ১২ দেখুন)

শিকড় গিঁট (Witches broom) ঃ আক্রান্ত অংশ গলের ন্যায় ফুলে ওঠে বা স্ফীত হয়। তবে এখানে কোষের দ্রুত বিভক্তির ফলে ফুলে ওঠে না, আক্রান্ত কোষটিই অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে স্ফীত হয়ে গল সৃষ্টি করে। যথা- *Meloidogyne* নামক কৃমির আক্রমণে অনেক গাছের শিকড়ে এ ধরনের লক্ষণ সৃষ্টি হয়। (চিত্র ৫কঃ ৫ দেখুন)

উইচেস ব্রুম বা ডাইনির ঝাঁটা ঃ এ রোগে কান্ডের আগায় ঘন ঘন উর্দ্ধমুখী শাখা উৎপন্ন হয়ে ঝাঁটার আকার ধারণ করে। এসব শাখার গায়ে ছোট ছোট স্ফীত ধরনের পাতাও থাকতে পারে। আম গাছে এ ধরনের লক্ষণ হতে দেখা যায়।

পাশাপাশি অঙ্গসমূহ একত্রে বৃদ্ধি পেয়ে চ্যাপটা আকার ধারণ করাকে ফ্যাসিয়েশন বলে।

ফ্যাসিয়েশন ঃ পাশাপাশি অঙ্গসমূহ একত্রে বৃদ্ধি পেয়ে চ্যাপটা আকার ধারণ করাকে ফ্যাসিয়েশন বলে। যথা- মাইকোপ্লাজমাজনিত কলাগাছের গুচ্ছ মাথা রোগ।

পাতা গুটানো ঃ অনেক সময় পাতার উপর তলের তুলনায় নিচের তলের বৃদ্ধি বেশি হওয়ায় পাতা কিনারা বরাবর উপরের দিকে গুটিয়ে যায়। পাতার এ ধরনের গুটিয়ে যাওয়া লক্ষণকে লিফরোল বলে। যথা- টমেটো গাছের লিফরোল রোগ। (চিত্র ৫কঃ ৭ ও চিত্র ৩৭ দেখুন) সাধারণত ভাইরাসের আক্রমণে এ রোগ হয়।

কোষ বিনষ্ট বিভাজনের মন্থরতার দরুনে গোটা গাছ বা কোনো অংশের বৃদ্ধির মন্থরতার ফলে

হাইপোপ্লাস্টিক লক্ষণ

কোষ বিনষ্ট হওয়ার ফলে অথবা কোষ বিভাজনের মন্থরতার দরুন গোটা গাছের বা কোনো অংশের বৃদ্ধির মন্থরতার ফলে যে লক্ষণ দেখা দেয় তাকে হাইপোপ্লাস্টিক লক্ষণ বলে। নিচে কয়েকটি হাইপোপ্লাস্টিক লক্ষণের সংজ্ঞা দেয়া হলো।

ক্লোরোসিস ঃ রোগে আংশিকভাবে সবুজ কণা গঠিত না হওয়ার দরুন গাছের বিভিন্ন অংশে স্বাভাবিক সবুজ রঙ না হওয়াকে ক্লোরোসিস বলে। যথা- ভাইরাসের আক্রমণে পাতার স্বাভাবিক সবুজ রঙ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বিবর্ণ হয়ে এ ধরনের লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

পাতায় গাঢ় ও হালকা সবুজ, হলুদ ও সময় সময় সাদা বর্ণের টিস্যু পাশাপাশি থেকে যখন ডিজাইন করার মতো টিস্যু সৃষ্টি হয় তখন তাকে মোজাইক বলে।

মোজাইক ঃ পাতায় গাঢ় ও হালকা সবুজ, হলুদ ও সময় সময় সাদা বর্ণের টিস্যু পাশাপাশি থেকে যখন ডিজাইন করার মতো টিস্যু সৃষ্টি হয় তখন তাকে মোজাইক বলে। তামাক, শশা, কুমড়া প্রভৃতি গাছে ভাইরাসের আক্রমণে এ ধরনের লক্ষণ প্রকাশ পায় (চিত্র ৫খঃ ১১ দেখুন)।

ডশরাস্বচ্ছতা ঃ পাতার শিরা ও উপশিরায় সবুজ রঙ নষ্ট হয়ে গেলে স্বচ্ছ হয়ে এ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ভাইরাসের আক্রমণে এ রোগ হয়। যথা- লেটুসের ‘বিগ ভেইন’ রোগ।

পাতার উপর গাঢ় ও হালকা সবুজ বা হলুদ রঙের ফুটফুট দাগ পড়াকে মটলিং বলে।

মটল বা ছিটে দাগ ঃ পাতার উপর গাঢ় ও হালকা সবুজ বা হলুদ রঙের ফুটফুট দাগ পড়াকে মটলিং বলে। ভাইরাসের আক্রমণে এ ধরনের লক্ষণ সৃষ্টি হয়। যথা- আমের মোজাইক রোগ।

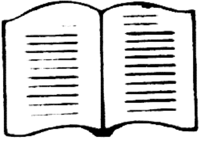
পাকারিং ঃ এ লক্ষণজনিত রোগে পাতার শিরাউপশিরার মধ্যস্থলের টিস্যু স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সে অনুপাতে শিরাউপশিরা গঠিত হয় না। এর ফলে, পাতার গায়ে ঢেউয়ের মতো ভাঁজ সৃষ্টি হয়। ভাইরাসের আক্রমণে টমেটো এবং আরও অনেক গাছে এ লক্ষণ হতে দেখা যায় চিত্র ৫কঃ ৮ দেখুন)।

বামনত্ব ঃ গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে খর্বাকৃতি হয়ে এ লক্ষণ সৃষ্টি করে। ভাইরাসের আক্রমণে এ রোগ হয়।

রোজেটিং ঃ গাছের আগার দিকে পর্বমধ্য স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি না পেয়ে সে স্থানে অনেক পাতা একস্থানে স্বচ্ছাকারে অবস্থান করে এ লক্ষণ সৃষ্টি করে এবং গোলাপ ফুলের পাপড়ির মতো মনে হয়।



চিত্র ৫খ ঃ উদ্ভিদ রোগের লক্ষণ
১০- ক্যাঙ্কার, ১১- মোজাইক, ১২- গল, ১৩- স্ক্যাব,
১৪- গুড়ি পচা ও ১৫- পাউডারি মিলডিউ



সারমর্ম ঃ লক্ষণ রোগের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। রোগের লক্ষণগুলোকে প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা- নেক্রোটিক লক্ষণ, যথা- পাউডারি মিলডিউ, ডাউনি মিলডিউ, ব্লাইট, ক্যাঙ্কার, এনথ্রাকনোজ, বিভিন্ন প্রকারের দাগ পড়া, ঢলে পড়া প্রভৃতি; হাইপারপ্লাস্টিক লক্ষণ, যথা- স্ক্যাব, গল, শিকড় গিট, উইসেচ ব্রুম, ফ্যাসিয়েশান, পাতাগুটানো প্রভৃতি এবং হাইপোপ্লাস্টিক লক্ষণ, যথা- মোজাইক, ক্লোরসিস, পাকারিং, রোজেটিং, বামনত্ব প্রভৃতি।



পাঠোত্তোর মূল্যায়ন ১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। উদ্ভিদ কোষ বা কলার মৃত্যুজনিত লক্ষণ কোন্‌টি?
- ক) ক্যাঙ্কার
- খ) মোজাইক
- গ) গল
- ঘ) পাকারিং

২। গাছের পাতা, ফুল, কান্ড ও কান্ডাংশের দ্রুত মৃত্যু হওয়াকে কী বলে?
- ক) ক্যাঙ্কার
- খ) ডাইব্যাক
- গ) ড্যাম্পিং অফ
- ঘ) ব্লাইট

৩। কোন্‌ রোগে ক্ষতস্থানে কান্ডের কাঠ বের হয়ে আসে?
- ক) এনথ্রাকনোজ
- খ) ব্লাইট
- গ) ক্যাঙ্কার
- ঘ) স্ক্যাব

৪। পাশাপাশি অঙ্গসমূহ একত্রে থেকে বৃদ্ধি পেয়ে চ্যাপ্টা আকার ধারণ করাকে কী বলে?
- ক) রোজেটিং
- খ) উইচেস ব্রুম
- গ) ফ্যাসিয়েশন
- ঘ) পাকারিং

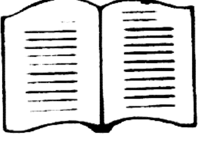
৫। উদ্ভিদ রোগের লক্ষণসমূহকে প্রধানত কত ভাগে বিভক্ত করা যায়?
- ক) দু'ভাগে
- খ) তিন ভাগে
- গ) চার ভাগে
- ঘ) পাঁচ ভাগে

পাঠ ১.৩ উদ্ভিদ রোগের শ্রেণিবিভাগ



এ পাঠ শেষে আপনি –

- উদ্ভিদ প্রকারের ওপর ভিত্তি করে রোগকে কীভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা যায় তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- কারণের ওপর ভিত্তি করে রোগকে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারবেন।
- লক্ষণের ওপর ভিত্তি করে রোগকে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারবেন।
- উৎস, সংঘটন, বিস্তার ও সংক্রমণের প্রকৃতি অনুযায়ী রোগকে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারবেন।



উদ্ভিদ প্রকারভিত্তিক রোগের শ্রেণিবিভাজন

অনেকে গাছের প্রকৃতি অনুযায়ী রোগকে শ্রেণিবিভাগ করেছেন। এ পদ্ধতিতে একই ধরনের শস্যের রোগকে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়। যথা- ফসলের রোগ, শাকশব্জির রোগ, ডালের রোগ, ফল গাছের রোগ, বনবৃক্ষের রোগ, ফুল গাছের রোগ, দারুবৃক্ষের রোগ, শোভা বর্দ্ধক গাছের রোগ, ওষধি গাছের রোগ ও বন্য গাছের রোগ।

উল্লিখিত প্রত্যেক শ্রেণির রোগকে আবারও ভাগ করা যায়। যথা- ফসলের রোগকে দানা শস্যের রোগ, পশু খাদ্য শস্যের (forage) রোগ, আঁশজাতীয় শস্যের রোগ ইত্যাদি। এসব শ্রেণির প্রত্যেকটি রোগকে আবারও ভাগ করা যায়। যথা- দানা শস্যকে ধানের রোগ, গমের রোগ, ভুট্টার রোগ, যবের রোগ, বার্লির রোগ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শস্যের নাম অনুসারে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে।

কখনো কখনো গাছের আক্রান্ত অঙ্গের নাম অনুসারে রোগকে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। যথা- শিকড়ের রোগ, কান্ডের রোগ, পাতার রোগ, ফুলের রোগ, ফলের রোগ ইত্যাদি।

কারণভিত্তিক রোগের শ্রেণিবিভাজন

কারণের ওপর ভিত্তি করে রোগকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা- (১) পরজীবীজনিত রোগ এবং (২) অপরজীবীজনিত রোগ।

> প্রকৃতি অনুযায়ী পরজীবীজনিত রোগসম হকে ৬টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা- ছত্রাকজনিত রোগ, ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ, ভাইরাসজনিত রোগ, মাইকোপ্লাজমাজনিত রোগ, সপুষ্পক উদ্ভিদজনিত রোগ এবং কৃমিজনিত রোগ।

পরজীবীর প্রকৃতি অনুযায়ী পরজীবীজনিত রোগসম হকে ৬টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা- (১) ছত্রাকজনিত রোগ, (২) ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ, (৩) ভাইরাসজনিত রোগ (৪) মাইকোপ্লাজমাজনিত রোগ, (৫) সপুষ্পক উদ্ভিদজনিত রোগ এবং (৬) কৃমিজনিত রোগ।

অপরজীবীজনিত রোগকে কারণভিত্তিক ৭ ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা- (১) পুষ্টির অভাবজনিত রোগ, (২) পানির স্বল্পতা ও আধিক্যতাজনিত রোগ, (৩) বায়ুর প্রতুলতা ও অপ্রতুলতাজনিত রোগ, (৪) প্রতিকূল আবহাওয়াজনিত (উষ্ণতা, আর্দ্রতা, আলো ইত্যাদি) রোগ, (৫) জমির প্রতিকূল পরিবেশজনিত (অম্লতা, ক্ষারতা, খাদ্য উপাদানের ঘাটতি, লবণের প্রাচুর্যতা ইত্যাদি) রোগ, (৬) দূষিত পরিবেশজনিত (ক্ষতিকর গ্যাস ও অন্যান্য পদার্থের উপস্থিতি) রোগ এবং ঝড়, শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাতজনিত রোগ।

> লক্ষণ অনুযায়ী রোগকে ৭ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (১) পাতায় দাগ রোগ, (২) মরিচা রোগ, (৩) নরম পচা রোগ, (৪) ঢলে পড়া রোগ, (৫) পোড়া বা ব্লাইট রোগ, (৬) নেতিয়ে পড়া রোগ এবং (৭) ঝুল রোগ।

লক্ষণভিত্তিক রোগের শ্রেণিবিভাজন

বিভিন্ন গাছে বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয় এবং রোগের বিশিষ্ট লক্ষণ অনুযায়ী রোগকে ৭ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (১) পাতায় দাগ রোগ, (২) মরিচা রোগ, (৩) নরম পচা রোগ, (৪) ঢলে পড়া রোগ, (৫) পোড়া বা ব্লাইট রোগ, (৬) নেতিয়ে পড়া রোগ এবং (৭) ঝুল রোগ।

উৎসভিত্তিক রোগের শ্রেণিবিভাজন

উৎপত্তিস্থলের ওপর ভিত্তি করে রোগকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা- (১) মৃত্তিকা বাহিত রোগ, (২) বায়ু বাহিত রোগ (৩) বীজ বাহিত রোগ এবং ভেক্টর বাহিত রোগ।

রোগ সংঘটন, বিস্তার ও সংক্রমণের প্রকৃতি অনুযায়ী রোগের শ্রেণিবিভাজন
রোগ সংঘটনের সম্বন্ধ অনুযায়ী রোগকে চার ভাগে শ্রেণিবদ্ধ করা যায়। যথা-

(১) এন্ডেমিক বা আঞ্চলিক রোগ (endemic disease)ঃ এ ধরনের রোগ বিশেষ স্থানে প্রায়ই অধ্যুষিত হয়। যথা- গোল আলুর ওয়ার্ট রোগ।

(২) স্পোরাডিক বা বিক্ষিপ্ত রোগ (sporadic disease)ঃ এ রোগ এখানে ওখানে অনিয়মিতভাবে দেখা দেয়। এ রোগে ক্ষতি কম হয় এবং কম অঞ্চলে সংঘটিত হয়। যথা- ধানের ফলস স্মাট রোগ।

(৩) প্যান্ডেমিক রোগ (pendemic disease)ঃ যখন রোগ পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা দেয় এবং প্রচুর ক্ষতিসাধন করে তখন তাকে প্যান্ডেমিক রোগ বলা হয়। যথা- আলুর লেইট ব্লাইট রোগ।

(৪) এপিফাইটোটিক রোগ (epiphytic disease)ঃ রোগ যখন বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অধ্যুষিত হয় কিন্তু মাঝে মাঝে মারাত্তক আকার ধারণ করে তখন তাকে এপিফাইটোটিক রোগ বলা হয়। যথা- ধানের ব্লাস্ট রোগ ও আলুর লেইট ব্লাইট রোগ।



সারমর্ম ঃ উদ্ভিদ রোগসম হকে কীভাবে শ্রেণিবিভাগ করা যায় তা এ পাঠে আলোচনা করা হয়েছে। উদ্ভিদের প্রকার, যথা- শাকশবজি, ফল ও ফুল গাছ, বনবৃক্ষ, দারুবৃক্ষ, ওষধি গাছ ইত্যাদি রোগের কারণ, যথা- ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, মাইকোপ্লাজমা, ভাইরাস, কৃমি প্রভৃতি রোগের লক্ষণ, যথা- পাতার দাগ, মরিচা, ঢলে পড়া, নেতিয়ে পড়া, পচন, ব্লাইট প্রভৃতি রোগের উৎস, যথা- মাটি, বায়ু ও বীজ রোগ সংঘটন, যথা- বিক্ষিপ্ত, আঞ্চলিক, এপিফাইটোটিক, প্যান্ডেমিক ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে উদ্ভিদের রোগকে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে।



পাঠোত্তর মূলায়ন ১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। কারণকে ভিত্তি করে রোগকে কত ভাগে বিভক্ত করা যায়?
- ক) দু ভাগে
- খ) তিন ভাগে
- গ) চার ভাগে
- ঘ) পাঁচ ভাগে

২। পরজীবীর প্রকৃতি অনুযায়ী রোগকে কত ভাগে বিভক্ত করা যায়?
- ক) দু ভাগে
- খ) তিন ভাগে
- গ) চার ভাগে
- ঘ) পাঁচ ভাগে

৩। উৎসের ওপর ভিত্তি করে রোগকে কত ভাগে বিভক্ত করা যায়?
- ক) দু ভাগে
- খ) তিন ভাগে
- গ) চার ভাগে
- ঘ) পাঁচ ভাগে

৪। যখন রোগ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে দেখা দেয় এবং মাঝে মাঝে মারাত্মক আকার ধারণ করে তাকে কোন্ প্রকৃতির রোগ বলে?
- ক) এন্ডেমিক
- খ) স্কোরাডিক
- গ) প্যান্ডেমিক
- ঘ) এপিফাইটোটিক

পাঠ ১.৪ উদ্ভিদ রোগনাশকের শ্রেণিবিভাগ ও প্রয়োগ পদ্ধতি



এ পাঠ শেষে আপনি –

- উদ্ভিদ রোগ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত রোগনাশকের নাম বলতে ও লিখতে পারবেন।
- কয়েকটি রোগনাশক তৈরি করে ব্যবহার করতে পারবেন।
- রোগ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির নাম লিখতে পারবেন।
- রোগনাশকের প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।



রোগনাশকের শ্রেণিবিভাগ

রোগনাশক এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য। রোগ নিয়ন্ত্রণে রাসায়নিক দ্রব্যই সব চেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। রোগনাশককে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। যথা-

ক) কার্যকারিতা অনুযায়ী

(১) ফাঞ্জিসাইড ছত্রাকনাশক বা (Fungicide)ঃ ছত্রাকজনিত রোগ দমনে ব্যবহার করা হয়।

(২) ব্যাকটেরিসাইড ব্যাকটেরিয়ানাশক বা (Bactericide)- ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ নিয়ন্ ণে ব্যবহৃত হয়।

(৩) নেমাটিসাইড কৃমিনাশক বা (Nematicide)ঃ কৃমিজনিত রোগ দমনে ব্যবহৃত হয়।

(৪) উইডিসাইড বা আগাছানাশক (Weedicide)ঃ আগাছা ধ্বংসে ব্যবহৃত হয়।

কিছু কিছু রোগ (যথা- ভাইরাসজনিত রোগ) দমনে কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। অ্যান্টিবায়োটিক নামে আরও এক প্রকারের রাসায়নিক যৌগ আছে যা কোনো জীবাণু থেকে উৎপন্ন হয় এবং অনেক জীবাণুর জন্য ক্ষতিকর।

খ) উৎস অনুযায়ী

(১) রাসায়নিক দ্রব্য

(২) উদ্ভিদ নির্যাস

(৩) অনুজীবঘটিত অ্যান্টিবায়োটিক

রাগনাশক প্রধানত বীজ শোধন, মাটি শোধন ও সিঞ্চনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ভালো রোগনাশকের কিছু কিছু গুণ থাকা প্রয়োজন। যেমন- র) অল্প মাত্রায় প্রয়োগেই রোগ দমনের ক্ষমতা থাকতে হবে, রর) প্রয়োগ সহজতর হতে হবে, ররর) কার্যক্ষমতা স্থিতিশীল হতে হবে, রা) মূল্য সাধারণ কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে হতে হবে এবং া) সর্বোপরি উদ্ভিদ, প্রাণি ও মানুষের তথা পরিবেশের ওপর এদের কোনো ক্ষতিকর প্রভাব থাকবে না। রোগনাশক প্রধানত বীজ শোধন, মাটি শোধন ও সিঞ্চনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

গ) আবার, কার্যকারিতার ওপর ভিত্তি করে রোগনাশককে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা-(১) প্রতিরক্ষামূলক রোগনাশক, (২) নিরাময়কারী রোগনাশক এবং (৩) অ্যান্টিবায়োটিক।

প্রতিরক্ষামূলক (Preventive) রোগনাশক

এগুলো রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে রোগাক্রমণের পূর্বে বা শুরুতে প্রয়োগ করা হয়। প্রতিরক্ষামূলক রোগনাশক অজৈব ও জৈব রাসায়নিক প্রকৃতির হতে পারে।

অজৈব রাসায়নিক রোগনাশক

তামাঘটিত অজৈব রোগনাশক

(ক) বোর্দো মিক্সচারঃ এটি খুবই জনপ্রিয় ও সবচেয়ে পুরাতন ছত্রাকনাশক। এ ওষুধ বিভিন্ন মাত্রায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে সাধারণত শতকরা এক ভাগ ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্দো মিক্সচার গাছে ছিটাঁনো হয়।

উপকরণ

তুঁতে - ৩৫৬ গ্রাম
পাথরে চুন- ৩৫৬ গ্রাম
পানি - ৩৭ লিটার

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে একটি মাটির পাত্রে ২০ লিটার পানি নিয়ে তাতে তুঁতে গলানো হয়। অন্য আর একটি পাত্রে

অল্প অল্প পানি ঢেলে চুনকে ফুটানো হয়। সমস্ত চুন ফুটলে ঠান্ডা করে এতে বাকি পানি ঢেলে চুনকে ভালোভাবে মিশানো হয়। তারপর পাত্রে তুঁতের পানি মিশালেই বোঁর্দো মিক্সচার তৈরি হয়। বোঁর্দো মিক্সচারের আসল রঙ আকাশের মত নীল। ওষুধ ঠিকমত তৈরি হয়েছে কি-না তা পরীক্ষা করার জন্য মিক্সচারের মধ্যে একটি ইস্পাতের ছুরি কয়েক মিনিট ডুবিয়ে দেখতে হবে তার উপর তামার কোনো গুঁড়ো জমেছে কি-না। যদি তামার গুঁড়ো জমে তাহলে তাতে আরো চুন মিশাতে হবে। বোঁর্দো মিক্সচার ঠিকমতো প্রস্তুত না করে ছিটালে গাছের ক্ষতি হয়। এ মিক্সচার তৈরি করার ১-২ ঘন্টার মধ্যেই ব্যবহার করা উচিত। শতকরা ২ ভাগ বোঁর্দো মিক্সচার প্রস্তুতের জন্য দ্বিগুণ পরিমাণ চুন ও তুঁতে ৩৭ লিটার পানিতে মিশাতে হবে।

(খ) বারগান্ডি মিক্সচারঃ আর্দ্র আবহাওয়ার জন্য ভালো চুন না পাওয়া গেলে এ ওষুধ ব্যবহার করা হয়।

উপকরণ

তুঁতে - ৩৫৬ গ্রাম
কাপড়কাঁচা সোডা - ৪৭০ গ্রাম
পানি - ৩৭ লিটার

প্রস্তুত প্রণালী

বোঁর্দো মিক্সচারের মতোই এ ওষুধ প্রস্তুত করতে হয়। এখানে কেবল চুনের পরিবর্তে সোডা ব্যবহার করা হয়।

(গ) চেসান্ট কম্পাউন্ডঃ সাধারণত বীজতলায় চারাগাছের রোগ দমনের জন্য এ ওষুধ ব্যবহার করা হয়।

উপকরণ

তুঁতে - ৫৯ গ্রাম
এমোনিয়াম কার্বোনেট - ৩২৫ গ্রাম

প্রস্তুত প্রণালী

তুঁতে ও অ্যামোনিয়াম কার্বোনেট মিহি করে গুঁড়ো করার পর মিশানো হয়। পরে এটি একটি বোতলে নিয়ে ভালোভাবে ছিপি আটকিয়ে ২৪ ঘন্টার জন্য বন্ধ করে রাখতে হয়। তারপর তা থেকে ৩০ গ্রাম নিয়ে ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে চারা গাছের গোড়ার চারিপাশে ঢেলে মাটি ভিজিয়ে দিতে হয়। মাটিতে ওষুধ ঢালার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এটি সরাসরি গাছের গোড়ায় না লাগে।

(ঘ) চৌবাত্তিয়া মলমঃ সাধারণত লেবু, আপেল, নাশপাতি প্রভৃতি ফল গাছের ডালপালা ছেঁটে কাটা স্থানে এ ওষুধের প্রলেপ দেয়া হয়।

উপকরণ ও প্রস্তুত প্রণালী

এক লিটার তিসির তেলের মধ্যে ৮০০ গ্রাম কপার কার্বনেট এবং ৮০০ গ্রাম লাল সিসা ভালোভাবে মিশিয়ে আঠালো পেস্ট তৈরি করলে চৌবাত্তিয়া মলম হয়।

ঙ) বোর্দো মলমঃ এ মলমটিও চৌবাত্তিয়া মলমের ন্যায় গাছের ক্ষতস্থানে বা ডালপালা ছাটার পর কাটাস্থানে লাগাতে হয়।

উপকরণ ও প্রস্তুত প্রণালী

এক ভাগ তুঁতে ও এক ভাগ চুন ২ ভাগ পানিতে পৃথক পৃথকভাগে গুলে মিশিয়ে বোর্দো মলম তৈরি করতে হয়।

উপরিউক্ত ওষুধগুলোর উপকরণ সামগ্রি বাজার থেকে কিনে স্থানীয়ভাবে তৈরি করা যায় বলে কৃষকরা প্রয়োজনমতো ব্যবহার করতে পারেন। তবে আজকাল তামাঘটিত অজৈব ছত্রাকনাশক বিদেশের ফ্যাক্টরিতে তৈরি করে বিভিন্ন নামে বাজারজাত করা হচ্ছে। এদের মধ্যে কুপ্রাভিট, কপার অক্সিক্লোরাইড, পেরনক্স প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এসব ওষুধ স্প্রে করে গাছে ছিটাতে হয়।

গন্ধকঘটিত অজৈব রোগনাশক

(ক) চুন মিশ্রিত গন্ধক- বোর্দো বা বারগান্ডি মিক্সচার ব্যবহার করলে যদি গাছের গায়ে তুঁতের দাগ পড়ে তখন এ ওষুধ ব্যবহার করতে হয়।

উপকরণ

পাথুরে চুন	- ৫৯০ গ্রাম
গন্ধক	- ৫৯০ গ্রাম
পানি	- ৩০ লিটার

প্রস্তুত প্রণালী

মাটির পাত্রে চুন রেখে তাতে ধীরে ধীরে পানি ঢালতে হয়। চুন পানিতে ডোবার পর যখন ফুটতে আরম্ভ করে তখন তাতে গন্ধক চূর্ণ যোগ করে ভালোভাবে নেড়ে মিশানো হয়। মিশ্রিত পদার্থকে সবসময় কাঁদার মতো নরম রাখার চেষ্টা করতে হয় এবং সেজন্য মাঝে মাঝে তাতে অল্প অল্প পানি মিশিয়ে নাড়তে হয়। চুন সম্পূর্ণরূপে ফুটে গেলে তাতে অবশিষ্ট পানি যোগ করে এ ওষুধ তৈরি করতে হয়।

(খ) গন্ধক চূর্ণঃ সাধারণত মিলডিউ রোগ দমনকল্পে এ ওষুধ গাছে ছিটানো হয়। বিভিন্ন ধরনের গন্ধক (যথা- চূর্ণ গন্ধক, দানাবাধা গন্ধক, সবুজ গন্ধক প্রভৃতি) মিহি করে গুঁড়ো করার পর ভোরের দিকে শিশিরসিক্ত অবস্থায় গাছের উপর ছিটানো হয়।

পারদঘটিত অজৈব রোগনাশক

বীজ শোধনের জন্য প্রথম পারদঘটিত দুটি অবৈজ লবণ (যথা- মারফিউরিক ক্লোরাইড ও মারফিউরাস ক্লোরাইড) ব্যবহার করা হোত। এসব লবণ অত্যন্ত বিষাক্ত হওয়ায় এদের ব্যবহার আমাদের দেশসহ বহুদেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

জৈব রাসায়নিক রোগনাশক

গন্ধকঘটিত জৈব রোগনাশক

তামা, পারদ ও গন্ধকঘটিত অজৈব রোগনাশক ব্যবহারে অনেক রোগ দমনে ভালো ফল পাওয়া গেলেও এদের কিছু কিছু দোষ থাকার জন্য নিরাপদ ওষুধ আবিষ্কারের চেষ্টা চলতে থাকে। তার ফলশ্রুতিতে নিরাপদ ও বহু গুণসম্পন্ন গন্ধকঘটিত থায়োকার্বামেট শ্রেণির অনেক জৈব ওষুধ আবিষ্কৃত হয় যেগুলো বর্তমানে বহুল প্রচলিত রোগনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। থায়োকার্বামিক এসিডে দুটি অক্সিজেন অনু গন্ধকের অনু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে ডাইথায়োকার্বামিক এসিড উৎপন্ন হয়। এ এসিডকে ব্যবহার করে অনেক ধরনের ছত্রাকনাশক (যথা- থাইরাম, জাইরাম, ফারবাম, জায়নেব, ম্যানেব, ন্যাবাম, ম্যানকোজেব ইত্যাদি) তৈরি হয়। ডাইথায়োকার্বমেটের সঙ্গে বিভিন্ন যৌগের

সংমিশ্রণে আরও কিছু কার্যকরী রোগনাশক তৈরি হয়েছে (যথা- ডায়থেন এম ৪৫)। এটি পাতার বহু রোগের বিরূদ্ধে ব্যবহৃত হয়।

পারদঘটিত জৈব রোগনাশক

পারদঘটিত অজৈব রোগনাশক অত্যন্ত বিষাক্ত বলে পরবর্তীকালে পারদের বিভিন্ন জৈব যৌগ (যথা- এগ্রোসান জি এন, এরাটান, সেরেসান ইত্যাদি) প্রস্তুত করা হয় এবং প্রধানত বীজ শোধনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এগুলোতে অজৈব যৌগের তুলনায় পারদের পরিমাণ অনেক কম থাকে। কিন্তু তবুও

ওসব যৌগ স্তন্যপায়ী প্রাণীর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হওয়ায় এগুলোরও ব্যবহার অনেক দেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ফসফরাসঘটিত জৈব রোগনাশক

হিনোসান ও কিটাজিন ফসফরাসঘটিত জৈব রোগনাশক। এগুলো স্প্রে করলে গাছে বিশোষিত হয়ে দেহে প্রবেশ করে বিভিন্ন অংশে কিছুটা ছড়ায়। এজন্য এগুলো অনেকটা সিস্টেমিক প্রকৃতির ওষুধ।

টিনঘটিত জৈব রোগনাশক

ব্রেস্টান, ব্রেস্টানল, ডিউটার টিনঘটিত জৈব রোগনাশক। এগুলো গাছের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে বলে এদের কর্যকারিতা ভালো কিন্তু পাতার ক্ষতি করে বিধায় এদের ব্যবহার কিছুটা সীমিত।

নাইট্রোজেনঘটিত রোগনাশক

ক্যাপটান, ডাইফোলাটান উলে-খযোগ্য নাইট্রোজেনঘটিত রোগনাশক। ক্যাপটান বীজশোধন ও মাটি শোধনে ব্যবহৃত হয় এবং ডাইফোলাটান অনেক রোগের জন্য গাছে ছিটানো হয়।

বেঞ্জিনযুক্ত রোগনাশক

ব্রাসিকল, ক্যারাথেন বা ডাইনোক্যাপ, ডেক্সন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য বেঞ্জিনযুক্ত রোগনাশক। এরা

সুগন্ধিযুক্ত যৌগ। ব্র্যাসিকল বীজ শোধনে ও মাটি ভেজানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। ডেক্সন ড্যাম্পিংঅফ রোগের জীবাণু দমনে মাটিতে এবং ক্যারাথেন পাউডারি মিরডিউ রোগ দমনে পাতায় ব্যবহার করা হয়।

কুইনোনজাতীয় রোগনাশক

স্পারগন, ফাইগন কুইনোনজাতীয় রোগনাশক। স্পারগন এবং ফাইগন বীজ শোধনে স্প্রে করে ব্যবহার করা হয়।

নিরাময়কারী রোগনাশক

উপরে বর্ণিত রোগনাশকগুলো গাছ বিশোষণ করে না এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা করলেও তা সর্বাঙ্গে ছড়ায় না। সাধারণত এগুলো স্থানীয় ভিত্তিতে কাজ করে। এগুলো গাছের রোগের আক্রমণ

কমায় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আক্রান্ত গাছকে রোগমুক্ত করে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারে না। কিছু কিছু রোগনাশক আছে যা গাছে বিশোষিত হয়ে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে এবং গাছের দেহের মধ্যে জীবাণু থাকলে অথবা প্রবেশ করতে চেষ্টা করলে তাকে ধ্বংস করে এবং রোগ নিরাময় করে গাছকে সুস্থ করে। নিরাময়কারী রোগনাশক সিস্টেমিক বা সর্বাঙ্গবাহী। অক্সাথিন, পিরামিডিন ও বেঞ্জিমিডাজোল শ্রেণির যৌগ সিস্টেমিক প্রকৃতির।

অক্সাথীন জাতীয় যৌগঃ ভিটাভ্যাক্স ও প্লান্টভ্যাক্স অক্সাথিন শ্রেণির রোগনাশক। এগুলো দিয়ে গম, যব, ভুট্টার বীজ শোধন করলে তার মধ্যস্থিত ছত্রাক ধ্বংস হয়ে লুজ স্মাট রোগ নিয়ন্তিত হয়। ভিটাভ্যাক্স লোহার (iron) সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করলে তার কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

বেঞ্জিমিডাজোলজাতীয় যৌগঃ বেনোমিল এবং ব্যাভিস্টিন বহুল প্রচলিত বেঞ্জিমিডাজোলজাতীয় রোগনাশক। এসব ওষুধ বীজ শোধন, মাটি শোধন, গাছের গোড়া ও পাতায় ছিটিয়ে ব্যবহার করা যায়। টপসিন নামে আর একটি যৌগ আছে যা বোনোমিলের ন্যায় কার্যকর।

পিরিমিডিনজাতীয় যৌগঃ মিলকার্ব, মিলটেক্স পিরিমিডিন শ্রেণির উল্লেখযোগ্য যৌগ। এগুলো বীজ শোধনে ব্যবহৃত হয়।

অ্যান্টিবায়োটিক রোগনাশক

অ্যান্টিবায়োটিক অণুজীব থেকে উৎপন্ন এক প্রকার দ্রব্য যা অন্যান্য অনুজীবের ক্ষতিকারক। সিস্টেমিক

রোগনাশকের ন্যায় এটিও সর্বাঙ্গীয় প্রকৃতির। তবে এটি অত্যন্ত দ্রুত সর্বাঙ্গে ছড়াতে সক্ষম। মানুষ ও জীবজন্তুর রোগ নিরাময়ে অনেক অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ থাকলেও গাছের রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য এ ধরনের ওষুধ অল্প কয়েকটি আবিষ্কৃত হয়েছে। যথা- স্ট্রেপটোমাইসিন, এগ্রিমাইসিন, এক্টিডাওন, ব্লাস্টিসিডিন, কাসুমিন ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অ্যান্টিবায়োটিক রোগনাশক।

উদ্ভিদ নির্যাস

কিছু কিছু উদ্ভিদের নির্যাসে জীবাণুনাশক ও রোগনাশক দ্রব্যগুণ উচ্চমাত্রায় রয়েছে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন- কাঁচা রসুনের রস ও লবঙ্গের নির্যাস তেল যথাক্রমে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে বিশেষ করে বীজ শোধনে চমৎকার কার্যকর।

বিবিধ রোগনাশক

বর্তমানে আরও অনেক প্রকারের রোগনাশক আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের মধ্যে রিডোমিল, রোভরাল, টিলেক্স বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও বেশ কিছু কীটনাশক (যথা- নেমাগন, ভ্যাপাম, মাইলোন, জিনোফস, ডাউফিউম প্রভৃতি) কৃমিজনিত রোগ দমনে ব্যবহৃত হয়। জীবাণু ধ্বংস করে মাটিকে নির্বিজন বা জীবাণুমুক্ত করার জন্য ক্লোরোপিকরিন, মিথাইল ব্রোমাইড, ইথাইলিন-ডাই-ব্রোমাইড ব্যবহার করা হয়।

রোগনাশক প্রয়োগ পদ্ধতি

রোগের জীবাণু কোথায় থাকে, গাছের কোন্ অংশ আক্রান্ত হয়েছে, রোগ কীভাবে বিস্তারলাভ করে প্রভৃতি বিবেচনা করে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে রোগনাশক ব্যবহার করা হয়। যথা-

বীজ শোধন

অনেক রোগ আছে যাদের জীবাণু বীজ নিজেই বছরের পর বছর বহন করে থাকে। বীজবাহিত রোগজীবাণু ধ্বংস করার জন্য বীজশোধন একটি প্রকৃষ্ট উপায়।

বীজ শোধনের উপকারিতা

- বীজের মাধ্যমে অনেক জীবাণু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে অতি সহজেই বিস্তারলাভ করতে পারে। এসব বীজের উপর ও ভিতরে জীবাণু বেঁচে থেকে রোগ সৃষ্টি করে। বীজ শোধনের জন্য ঐসব জীবাণুর জীবনীশক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে রোগের বিস্তার রোধ করা সহজতর হয়।
- বীজবাহিত জীবাণুর জন্য অনেকক্ষেত্রে বপনের আগে বীজ পচে যায় অথবা অঙ্কুরোদ্গম হলেও পরে মূল বা গোড়া পঁচে নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে বপনকৃত বীজ থেকে চারা নাও হতে পারে অথবা হলেও মরে যায়। বীজ শোধনের ফলে এসব অসুবিধা কাটিয়ে ওঠা যায়।

- অনেক সময় বীজে কোনো রোগজীবাণু না থাকলেও মাটিতে অবস্থিত বিভিন্ন গণের ছত্রাকের (যথা- *Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium* প্রভৃতি) আক্রমণে অঙ্কুরোদ্গামের আগে বা পরে বীজ অথবা চারা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তবে শোধিত বীজ বপন করলে বীজের গায়ে লেগে থাকা ওষুধ বীজের চারপাশের মাটিকে বিষাক্ত করে সেখানকার জীবাণুকে মেরে ফেলে এবং বীজকে একটা স্বাস্থ্যকর জীবাণুমুক্ত অঞ্চলে রাখে। এর ফলে নতুন গজানো অঙ্কুর বেশ নিরাপত্তার সঙ্গে রোগজীবাণু শূন্য পরিবেশের মধ্য দিয়ে মাটির উপর উঠতে থাকে। সুতরাং বীজ শোধনের দ্বারা মাটিস্থিত রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে বীজকে ও অঙ্কুরোদগমউত্তর চারাগাছকে পচন রোগ হতে রক্ষা করা সম্ভব হয়।
- বিশ্ববিখ্যাত বীজ রোগতত্ত্ববিদ Dr. Paul Neergard লিখেছেন যে সমগ্র বিশ্বে এক বছরে বীজ বাহিত রোগের দ্বারা যে ক্ষতি হয় তা দক্ষিণ আমেরিকার এক বছরের উৎপাদিত ফসলের প্রায় সমান এবং বীজ শোধনের দ্বারা এই ব্যাপক ক্ষতির মোকাবেলা করা যায়।

বীজ শোধনের পদ্ধতিসম হকে দুভাগে বিভক্ত করা যায়- (১) ভৌত পদ্ধতি ও (২) রাসায়নিক

বীজশোধনের পদ্ধতি

বীজ শোধনের পদ্ধতিসমূহকে দুভাগে বিভক্ত করা যায়- (১) ভৌত পদ্ধতি ও (২) রাসায়নিক পদ্ধতি। বীজকে শুকনো অবস্থায় ও ভিজিয়ে শোধন করা যায়।

(১) ভৌত (Physical) পদ্ধতি

শুকনো অবস্থায় তাপ প্রয়োগ পদ্ধতিতে বীজকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ইনকিউবেটরে নির্দিষ্ট সময় রেখে তার জীবাণুকে ধ্বংস করা হয়।

ক. শুকনো অবস্থায় তাপ প্রয়োগ- এ পদ্ধতিতে বীজকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ইনকিউবেটরে নির্দিষ্ট সময় রেখে তার জীবাণুকে ধ্বংস করা হয়। যথা- লেটুসের মোজাইক ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত বীজকে ৫৫^{o} সে. তাপমাত্রায় ৮০ থেকে ১২০ দিন এবং টমেটোর এa্গ্ঠ দ্বারা আক্রান্ত বীজকে ৭০^{o} সে. তাপমাত্রায় ১ মাস রেখে বীজস্থ ভাইরাস নষ্ট করা হয়।

বীজের অভ্যন্তরীণ জীবাণু ধ্বংস করতে গরম পানি ব্যবহার করা হয়।

খ. গরম পানি ব্যবহার- বীজের অভ্যন্তরীণ জীবাণু ধ্বংস করতে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। প্রথমে বীজকে সাধারণ তাপমাত্রায় একটি পাত্রে কয়েক ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়। তারপর ঐ বীজকে গরম পানিতে ডুবাতে হয়। কতক্ষণ বীজকে পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে তা জীবাণু ও বীজের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। পানির উষ্ণতা এমন হতে হবে যেন তা কেবল জীবাণুকেই মারতে পারে কিন্তু বীজের সজীবতাকে কোনোমতেই যেন নষ্ট না করে। টমোটোর এনথ্রাকনোজ, অল্টারনেরিয়া ব-াইট ও ব্যাকটেরিয়াল স্পট রোগ; বেগুনের ফোমোপসিস (phomopsis) ব্লাইট রোগ; পালং শাকের ডাউনি মিলডিউ রোগের জন্য ৫০^{o}সে. উষ্ণযুক্ত পানিতে ২৫ মিনিট রেখে বীজকে শোধন করা হয়। গমের আলগা ঝুল (loose smut) রোগের জন্য ঠান্ডা পানিতে ১২ ঘন্টা বীজকে ভিজিয়ে ৫৪^{o} সে. উত্তাপবিশিষ্ট গরম পানিতে ঠিক ১৩ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হয়।

অবাত শোধন পদ্ধতিতে ভিজানো বীজকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একটি পাত্রে মুখ বন্ধ করে রাখতে হয়।

গ. অবাত শোধন- এ পদ্ধতিতে ভিজানো বীজকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একটি পাত্রে মুখ বন্ধ করে রাখতে হয়। গম ও বার্লির আলগা ঝুল রোগ দমনে এ পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। বীজকে ৫-৬ ঘন্টা ভিজিয়ে একটি পাত্রে রেখে তার মুখ শক্তভাবে বন্ধ করে রাখলে অঙ্কুরোদ্গামের সময় বীজ পাত্রমধ্যস্থিত অক্সিজেন গ্রহণ করতে থাকে ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ছাড়তে থাকে। পাত্রমধ্যস্থিত অক্সিজেন শেষ হওয়ার পরও বীজ আকারে বড় হওয়ায় অনেকক্ষণ সজীব থাকতে পারে কিন্তু বীজের মধ্যস্থিত ছত্রাক অতি ক্ষুদ্র হওয়ায় বেশিক্ষণ বাঁচতে পারে না। ফলে বীজ সজীব থাকে ও ছত্রাক তার মধ্যেই মরে যায়। তবে এ পদ্ধতিতে বীজ শোধন করতে হলে সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ছত্রাক মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বীজের জীবনীশক্তি নষ্ট হয়ে না যায়। তাই, এ পদ্ধতির জন্য কত বীজ কত বড় পাত্রে কত ঘন্টা রেখে শোধন করা যায় তা পরীক্ষামূলকভাবে আগে থেকে নির্ধারণ করে নেয়া উচিত।

গমের আলগা ঝুল রোগ দমনে সূর্যতাপ প্রয়োগ পদ্ধতি বেশ কার্যকর।

ঘ. সূর্যতাপ প্রয়োগ- এ পদ্ধতিতে প্রথমে বীজকে ৪-৫ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে নিতে হয়। তারপর ভাদ্র মাসের প্রখর রোদে পাকা ঘরের ছাদে, পাকা রাস্তা বা টিনের ওপর পাতলা করে ছড়িয়ে ২-৩ ঘন্টা ধরে বীজকে শুকাতে হয়। গমের আলগা ঝুল রোগ দমনে এ পদ্ধতি বেশ কার্যকর। আলুর লেই ব্লাইট রোগের ছত্রাক আলুকে আক্রমণ করলে তাকে রোদে পরপর কয়েক দিন কয়েক ঘন্টা করে রাখলে তাপে আলুর মধ্যস্থিত ছত্রাক অনেকাংশে মরে যায়।

ঙ. চলমান বাষ্প প্রয়োগ- বীজকে তারের জালে নিয়ে একটি পাত্রে রাখা হয় এবং পরে পানিকে বাষ্পে পরিণত করে বীজের মধ্য দিয়ে পরিচালিত করা হয়। সুগার বীট ও সরিষা পরিবারের বিভিন্ন ফসলের পাতায় দাগ ধরা রোগ দমনে এ পদ্ধতিতে বীজ শোধন করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

(২) রাসায়নিক (Chemical) পদ্ধতি

শুকনো ও ভিজানো উভয় পদ্ধতিতে রোগনাশক দিয়ে বীজ শোধন করা যায়।

শুকনো পদ্ধতিতে শোধনের নিমিত্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ বীজ একটি পাত্রে নিয়ে তার সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণে ওষুধ মিশাতে হয়।

ক. শুকনো পদ্ধতি- শুকনো পদ্ধতিতে শোধনের নিমিত্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ বীজ একটি পাত্রে নিয়ে তার সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণে ওষুধ মিশাতে হয়। অল্প পরিমাণ বীজ হলে ছোট কৌটায় বা টিনের পাত্রে (চিত্র-৬ ক ঃ ১ দেখুন) এবং বেশি বীজ হলে বড় পাত্রে বা বীজ শোধন যন্ত্রে এ কাজ করা হয়। এর জন্য সাধারণত কাঠ বা লোহার পায়ার ওপর একটি ড্রাম স্থাপন করে রোটারি ড্রাম নামে এক প্রকার বীজ শোধন যন্ত্র তৈরি করা হয় (চিত্র ৬ ক ঃ ২-৩ দেখুন)। ড্রামটি ঘুরানোর জন্য এক দিকে একটি হাতল লাগানো থাকে। বীজের গায়ে ওষুধ লাগনোর সুবিধার্থে ড্রামের মাঝখানে চারদিকে ফ্রেম দ্বারা আঁটকানো ধাতব পদার্থের একটি জাল বসানো থাকে। ড্রামের ২/৩ অংশ বীজ ভর্তি করে তাতে প্রয়োজনমতো গুড়ো ওষুধ যোগ করা হয়। পরে হাতল দিয়ে ড্রামটি কয়েক মিনিট ঘুরালে বীজগুলো ওলটপালট হওয়ার সময় ওষুধের গুড়ো দ্বারা বীজের উপরিভাগ আচ্ছাদিত হয়ে যায়। রোগনাশকের কার্যকারিতা দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য প্রথমে বীজকে মিথোসিল নামক এক প্রকার আঠার সাথে মিশানো হয়। তারপর গুঁড়ো ওষুধ যোগ করে নাড়াচাড়া করা হয়। বীজের গায়ে আঁঠা লেগে থাকার দরুনে ওষুধ বীজের চতুর্দিকে আঁটকে একটি আবরণ তৈরি করে এবং প্রতিটি বীজকে এককেটি বাড়ির মতো দেখায়। এ পদ্ধতিকে 'পিলেটাইজেশন' বলা হয়।

অনেক সময় উদ্বায়ী ও বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টিকারী ওষুধ একটি বায়ুবদ্ধ পাত্রে নিয়ে তাতে কিছু শুকনো বীজ ঢেলে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রেখে শোধন করা হয়।



চিত্র ৬ ক ঃ শুকনো পদ্ধতিতে বীজ শোধন
১- কৌটা (অল্প বীজের জন্য), ২ ও ৩- রোটারি ড্রাম (বেশি বীজের জন্য)

খ. ভিজানো পদ্ধতি- এ পদ্ধতিতে বিভিন্নভাবে বীজকে ওষুধের দ্রবণ দ্বারা ভিজিয়ে শোধন করা হয় (চিত্র ৬ খ দেখুন)। যথা-

সিঞ্চন (ঝঢ়ৎরহশষরহম) পদ্ধতি- প্রথমে অনুমোদিত ওষুধ পরিমাণমতো পানির সঙ্গে মিশিয়ে দ্রবণ অথবা সাসপেনসান তৈরি করা হয়। তারপর অল্প অল্প বীজ ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে অল্প অল্প করে ওষুধের

দ্রবণ বা সাসপেনসান হস্ত চালিত স্প্রেয়ারের সাহায্যে অথবা ঝাঝরির সাহায্যে ছিটাতে হয়। ওষুধ প্রয়োগের পর একটি ভিজা চট দ্বারা কয়েক ঘন্টা বীজকে ঢেকে রাখা হয় এবং পরে শুকিয়ে বীজকে বপন করা যায় বা সংরক্ষণ করা যায়।

ডুবানো (Steeping) পদ্ধতি- এ পদ্ধতিতে বীজকে ওষুধের দ্রবণ বা সাসপেনসানে ১/২ থেকে ২ ঘন্টা ডুবিয়ে রাখা হয়। এর ফলে বীজ পানির সঙ্গে কিছু পরিমাণ ওষুধও শোষণ করে নেয়। পরে বীজগুলো উঠিয়ে শুকিয়ে বপন করা যায় অথবা সংরক্ষণ করা যায়।

পারি (Slurry) পদ্ধতি- সাধারণত অল্প ওষুধে বেশি বীজ শোধনের নিমিত্তে বিদ্যুৎচালিত পারি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে গুঁড়ো ওষুধে সামান্য পরিমাণ (১০-২৫ মিলি লিটার/কেজি বীজ) কোনো তরল পদার্থ যোগ করে সুপ (Soup) -এর ন্যায় পারি তৈরি করা হয়। তারপর ওষুধ ও বীজ



চিত্র ৬ খ ঃ ভিজানো পদ্ধতিতে বীজ শোধন

পারি যন্ে নিয়ে বীজকে শোধন করা হয়।

সারণি ১ ঃ বিভিন্ন ফসলের বীজ শোধনে ব্যবহৃত কিছু ওষুধ ও তাদের পরিমাণ সারণি ১ এ দেয়া হয়েছে।

ফসলের নাম	ওষুধের নাম	পরিমাণ
শুকনো পদ্ধতিতে শোধন ধান, পাট, গম, চীনা বাদাম ইত্যাদি	হেমাসান, সেরেসান, প্যারাসান	ওষুধ এক গ্রাম ও বীজ ৩০০ গ্রাম। পাটের ক্ষেত্রে ওষুধ ১ গ্রাম ও বীজ ৩০ গ্রাম
	ভিটাভ্যাক্স	ওষুধ ২-৪ গ্রাম ও বীজ ১ কেজি
ভিজানো পদ্ধতিতে শোধন ধান, আলু, পাট, ঢেঁড়স, টমেটো ইত্যাদি	এমিসিন, ন্যাগালন, ট্যাফাসন	ওষুধ ১ গ্রাম ও পানি ১ লিটার এবং সমস্ বীজ ভিজে যায় এ পরিমাণ বীজ
আখ, আদা, হলুদ ইত্যাদি	এরাটান ৬	ঐ
গম	ব্যাভিস্টান, বেনলেট, ক্যালিক্সিন, ভিটাভ্যাক্স	ঐ
ডাল ও সিমজাতীয় বীজ	ব্রাসিকল ২০	ওষুধ ২-৪ গ্রাম ও পানি ১ লিটার

৩। বীজ শোধনে সাবধানতা

বীজ শোধনে ব্যবহৃত ওষুধ বিষাক্ত বিধায় এগুলো ব্যবহারের সময় কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। যথা-

- ব্যবহারের সময় ওষুধ যেন চোখে, মুখে, নাকে প্রবেশ না করতে পারে জন্য মুখোশ বা কোনো কাপড় মুখে বেধে নেয়া উচিত।
- দেহে, বিশেষ করে হাতে কোনো ক্ষত থাকলে এ ওষুধ বা শোধিত বীজ নাড়াচাড়া করা উচিত।
- শোধিত বীজ যেসব পাত্রে সংরক্ষণ করা হয় তাতে 'বিষ' এ কথা লিখে রাখা উচিত।

- ওষুধ ও শোধিত বীজ শিশু ও গৃহপালিত পশুপক্ষির নাগালের বাইরে রাখা উচিত।
- ওষুধের পরিমাণ, শোধনের সময় প্রভৃতি যেন মাত্রাতিরিক্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

মাটিকে ভৌত এবং রাসায়নিক পদ্ধতিতে শোধন করা যায়।

২. মাটি শোধন পদ্ধতি

মাটিতে অনেক রোগজীবাণু বেঁচে থাকে। নানাবিধ উপায়ে এসব জীবাণুকে আংশিকভাবে ধ্বংস করা যায়। মাটিকে ভৌত এবং রাসায়নিক পদ্ধতিতে শোধন করা যায়।

১। ভৌত (Physical) পদ্ধতি

উত্তাপ দ্বারা মাটির জীবাণু ধ্বংস করা যায়। উত্তাপ দ্বারা মাটি শোধনের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যথা-

(১) গরম পানি ব্যবহার- প্রথমে জমির মাটি এক ফুট গভীর করে খুঁড়ে ১´ × ১´ × ১´ জমিতে ৫-৬ গ্যালন হারে গরম পানি প্রয়োগ করতে হবে।

(২) আগুন (ভরৎব) ব্যবহার- এ পদ্ধতিতে মাটি শোধনকল্পে শুকনো খড়কুটা, গাছের ঝরা পাতা বা ডালপালা জমিতে ভালো করে বিছিয়ে পোড়াতে হয়। আগুনের তাপে জমির ওপরের ও নিচের কয়েক সেন্টিমিটার মাটি উত্তপ্ত হয়ে সেখানকার জীবাণু মারা যায়।

(৩) অগ্নিশিখা ব্যবহার- যন্ত্রের সাহায্যে অগ্নিশিখা মাটিতে নিক্ষেপ করে মাটিকে শোধন করা যায়। সাধারণত এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু বীজতলা ও চারা তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত ছোট ছোট মাটির পাত্রে অগ্নিশিখা প্রয়োগ করে ভালো ফল পাওয়া যায়। নিক্ষিপ্ত অগ্নিশিখার উত্তাপ ২০০০ সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হয়ে থাকে। এ তাপে মাটি খুব গরম হয়ে তাতে অবস্থিত জীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

(৪) গরম বাষ্প (steam) ব্যবহার- অল্পবিস্তর এলাকার মাটি গরম বাষ্প প্রয়োগ করে জীবাণুমুক্ত করা যায়। এ পদ্ধতিতে মাটির অল্প নিচে ছিদ্রযুক্ত ধাতু নির্গত পাইপ বসিয়ে এর মধ্য দিয়ে গরম বাষ্ প্রয়োগ করা হয়। এ পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হওয়ায় এ দেশে সাধারণত ব্যবহার করা হয় না।

২। রাসায়নিক (chemical) পদ্ধতি- নানাবিধ ওষুধ প্রয়োগ করে মাটি শোধন করা যায়। ওষুধ দ্বারা মাটি শোধন পদ্ধতি গাছের প্রকৃতির ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। গাছ লাগানোর আগে, লাগানোর সময় অথবা পরে গাছ বৃদ্ধির সময় মাটিতে ওষুধ প্রয়োগ করে জীবাণু ধ্বংস করা যায়। মাটির জীবাণু ধ্বংসের জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর উপরে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জমির উপরের কয়েক সেন্টিমিটার মাটির সঙ্গে ওষুধ মিশানো হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইনজেকশন সিরিঞ্জ দ্বারা মাটির মধ্যে ওষুধ প্রবেশ করিয়ে জীবাণু ধ্বংস করা হয়। মাটি শোধনের পদ্ধতি নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

প্রতি এক ঘনফুট মাটির জন্য ১৭০ গ্রাম ফরমালডিহাইড পাউডার প্রয়োগ করা উচিত।

(১) ফরমালিন (formalin) ব্যবহার- এ পদ্ধতিতে প্রথমে জমির মাটি বারে বারে কুপিয়ে ভালোভাবে গুঁড়ো করতে হবে। পরে মাটি শুকালে শতকরা ৪ ভাগ ক্ষমতাসম্পন্ন ফরমালিন দ্রবণ তাতে ঢেলে ভালোভাবে ভিজাতে হবে। সাধারণত ১´ × ১´ জমির জন্য পাঁচ গ্যালন হারে দ্রবণ প্রয়োগ করতে হয়। এ ওষুধ প্রয়োগের পরপরই জমির মাটি ২৪-৪৮ ঘন্টা পুরু চট বা ত্রিপল বা পলিথিন সিট দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। কোনো কারণে উপরোক্ত দ্রব্য না পেলে কলাগাছের পাতা পুরু করেও ঢাকার ব্যবস্থা করা যায়। এ অবস্থায় ৪৮ ঘন্টা রাখার পর ঢাকনি সরিয়ে ১০-১৫ দিন মাটি আলগা অবস্থায় রাখতে হয়। এ সময়ের মধ্যে মাটি দুএকবার ওলটপালট করে দিলে ভালো হয়। পরে মাটিতে যখন ফরমালিনের গন্ধ থাকে না তখন জমিতে বীজ বপন করা হয়। মাটির বা অন্য কোন পাত্রে বীজ বপন করতে হলে ওসব পাত্রের মাটি ফরমালিন দ্বারা শোধন করে নেয়া উচিত। এক্ষেত্রে প্রতি এক ঘনফুট মাটির জন্য ১৭০ গ্রাম ফরমালডিহাইড পাউডার প্রয়োগ করা উচিত। ফরমালিন দ্রবণ ব্যবহার করলে পাত্রস্থ মাটি

ভিজাতে যতটা পরিমাণ দ্রবণ লাগে ততটা ব্যবহার করতে হবে। ওষুধ প্রয়োগ করে পাত্র ৪৮ ঘন্টা ঢেকে রাখতে হবে এবং পরে ঢাকনি সরিয়ে মাটি কয়েকবার আলগা করে শুকোনোর পর বীজ বপন করতে হয়।

নানা প্রকার ফিউমিগ্যান্ট অর্থাৎ গ্যাস বা ধূয়া সৃষ্টিকারী উদ্বায়ী প্রকৃতির ওষুধ দ্বারা মাটি শোধন করা যায়।

(২) উদ্বায়ী প্রকৃতির বা গ্যাস সৃষ্টিকারী ওষুধ (fumigant) ব্যবহার- নানা প্রকার ফিউমিগ্যান্ট অর্থাৎ গ্যাস বা ধূয়া সৃষ্টিকারী উদ্বায়ী প্রকৃতির ওষুধ দ্বারা মাটি শোধন করা যায়। ক্লোরোপিকরিন, মিথাইল ব্রোমাইড, ভ্যাপাম, নেমাগন প্রভৃতি ফিউমিগ্যান্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এসব ওষুধ সম্পূর্ণ জমিতে, গাছ লাগানোর সারিতে অথবা গর্তে ব্যবহার করা যায়।

ক্লোরোপিকরিন একটি উৎকৃষ্ট মাটি শোধক। এর অপর নাম টিয়ার গ্যাস এবং ১৩ বর্গ মিটার স্থানের মাটি শোধনের জন্য ৪৫৪ গ্রাম ওষুধ ব্যবহার করা হয়। সাধারণত ৩৮ সেন্টেমিটার পর পর গর্ত খুড়ে মাটির মধ্যে ১৫ সেন্টিমিটার নিচে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। ওষুধ প্রয়োগের পর পর গর্তগুলো মাটি দিয়ে বন্ধ করে দিতে হয় এবং মাঝে মাঝে পানি ছিটিয়ে দিতে হয়। বড় জমির ক্ষেত্রে ইনজেকটরের সাহায্যে নির্দিষ্ট দূরত্বে ও গভীরতায় ধূয়া সৃষ্টিকারী ওষুধ প্রবিষ্ট করা হয়। ওষুধ প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর যখন মাটি থেকে কোনো গন্ধ পাওয়া না যায় তখন বীজ বপন করতে অথবা চারা লাগাতে হয়। নেমাগন ও জিনোফস কম উদ্বায়ী ওষুধ অর্থাৎ এসব ওষুধ ধীরে ধীরে গ্যাসে পরিণত হয়। এসব ওষুধ প্রয়োগের পর মাটি ঢাকার প্রয়োজন হয় না এবং ফসল থাকা অবস্থায়ও প্রয়োগ করা যায়।

(৩) অনুদ্বায়ী প্রকৃতির ওষুধ- ক্যাপটান, থাইরাম, ব্রাসিকল প্রভৃতি ওষুধ থেকে কোনো গ্যাস সৃষ্টি হয় না। এসব ওষুধ পানিতে গুলে জমিতে ছিটিয়ে অথবা জমি তৈরি করার সময় মাটির সঙ্গে শুকনো গুড়ো মিশিয়ে দেয়া হয়। কেরল (kerol) নামক এক প্রকার ওষুধ আছে যা মৃত্তিকাশ্রয়ী ছত্রাকের সংক্রমণ বন্ধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। সাধারণত এক ভাগ কেরল ও ৫০০ ভাগ পানি মিশিয়ে প্রতি ৯০০ ব. সে. (প্রতি বর্গফুট) জমির জন্য ২ গ্যালন হারে প্রয়োগ করা হয়।

৩. গাছে ওষুধ প্রয়োগ পদ্ধতি

ছত্রাকের বৃদ্ধি প্রতিরোধ ও দমনের জন্য গাছে বিভিন্ন প্রকারের ছত্রাকনাশক (fungicide) ছিটানো হয়।

ছত্রাকের বৃদ্ধি প্রতিরোধ ও দমনের জন্য গাছে বিভিন্ন প্রকারের ছত্রাকনাশক (fungicide) ছিটানো হয়। কিছু কিছু ওষুধ গাছের উপরিভাগে অবস্থিত ছত্রাকের সংস্পর্শে সরাসরি এসে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং কিছু কিছু ওষুধ প্রয়োগে ছত্রাকের সংক্রমণ নিবারিত হয়। প্রথম শ্রেণির ওষুধকে প্রত্যক্ষ (direct) ছত্রাকনাশক এবং দ্বিতীয় শ্রেণির ওষুধকে রক্ষাপ্রদ (protective) ছত্রাকনাশক বলা হয়। ছত্রাকনাশক তরল, গুড়ো এবং প্রলেপ আকারে প্রয়োগ করা হয়।

(১) তরল অবস্থায় সিঞ্চন

রোগনাশক তরল অবস্থায় গাছে ছিটানো পদ্ধতি সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। সাধারণত পানিতে ভিজে এমন গুঁড়ো ওষুধ ছিটানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। ছিটানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ওষুধ, যথা- বোর্দো মিক্সচার, বারগান্ডি মিক্সচার, কুপ্রাভিট, ডায়থেন এম-৪৫, হিনোসান, থাইরাম, জাইরাম, ব্যাভিস্টিন, বেনলেট, কাসুমিন, ডিউটার, কিটাজিন প্রভৃতি ওষুধ ছত্রাক রোগ দমনে ব্যবহার করা হয়। ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ দমনে ফাইটোমাইসিন, এগ্রিমাইসিন, স্ট্রেপটোমাইসিন সালফেট প্রভৃতি ওষুধ ব্যবহার হয়। এসব ওষুধ ছিটানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের স্প্রেয়ার ব্যবহার করা হয়। যথা-

এটোমাইজার ছাট আকারের স্প্রেয়ার এবং সাধারণত গৃস্থালীর কাজে ব্যবহৃত হয়।

এটোমাইজারঃ এটা ছোট আকারের স্প্রেয়ার এবং সাধারণত গৃস্থালীর কাজে ব্যবহৃত হয়। এ স্প্রেয়ারে ওষুধ রাখার জন্য একটি ছোট আধার থাকে। ঐ আধারের উপরের দিকে একটি পাম্পার লাগানো থাকে যা দিয়ে পাম্প করার সাথে সাথে পানিমিশ্রিত ওষুধ ফোয়ারার ন্যায় বের হয়ে আসে। এ স্প্রেয়ারটিতে অল্প পরিমাণ ওষুধ থাকে বলে স্প্রেয়ারটি হাতে রেখে ব্যবহার করা হয়। চিত্র ৭.১ এ এ্যাটোমাইজার দেখানো হয়েছে।

বায়ু সংকোচন যোগ্য স্প্রেয়ার (Compressed air sprayer)ঃ এ স্প্রেয়ারে ৩-৪ গ্যালন ওষুধ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ধাতু নির্মিত একটি আধার থাকে। এর উপরের দিকে একটি পাম্প লাগানো থাকে

এবং আধারে ওষুধ রেখে মুখ আটকানোর পর পাম্প করলে আধারের ভিতরে বায়ুর চাপ সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় বহির্গমন নলের মুখে চাপ মুক্ত হওয়ার ক্লিপ চাপ দেয়ার সাথে সাথে তরল ওষুধ নলের মধ্য দিয়ে নজলের (nozzle) মাধ্যমে সজোরে ফোয়ারার মতো বের হয়ে আসে। বায়ুর চাপ কমে গেলে আবার পাম্প করে নিতে হয়। এ স্প্রেয়ার ঘাড়ে রেখে ওষুধ ছিটানো হয়। এ স্প্রেয়ারের কয়েকটি অসুবিধা আছে। প্রথমত, এর মধ্যে ওষুধ মিশানোর কোনো ব্যবস্থা নেই এবং সেজন্য ওষুধ ছিটানোর সময় আধার বারে বারে ঝাঁকিয়ে পানির সঙ্গে ওষুধকে মিশিয়ে নিতে হয়। দ্বিতীয়ত, চাপ কমে গেলে পাম্প করার জন্য শুকনো স্থানে বা আইলের উপর স্প্রেয়ার এনে পাম্প করতে হয়। চিত্র ৭.২ এ বায়ু সংকোচনযোগ্য স্প্রেয়ার দেখানো হয়েছে।



চিত্র ৭ ঃ বিভিন্ন প্রকারের স্প্রেয়ার
১। এ্যাটোমাইজার, ২। বায়ুসংকোচনযোগ্য স্প্রেয়ার
৩। ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার ও ৪। হস্ত চালিত ডাস্টার

ন্যাপস্যাক (Knapsac) স্প্রেয়ার)ঃ পিঠে বহন করে এ স্প্রেয়ার দ্বারা ওষুধ ছিটাতে হয়। পিঠে ঝুলানোর জন্য স্প্রেয়ারে এক জোড়া বেল্ট পিছনের দিকে লাগানো থাকে। এর পাশে একটি হস্ত চালিত পাম্পের হ্যান্ডেল আছে। হাটার তালে তালে হাতল দিয়ে পাম্প করে ক্ষেতে ওষুধ ছিটাতে হয়। এ স্প্রেয়ারের ভিতর ওষুধ মিশানোর ব্যবস্থা আছে এবং পাম্প করার সময় ওষুধ ও পানি সব সময় মেশার সুযোগ পায়। এর ফলে স্প্রে করার সময় মেশিন বারে বারে নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন হয় না। এ মেশিনের আর একটি সুবিধা হলো যে এর মধ্যে বায়ুর চাপ সমানভাবে থাকে বলে একটানাভাবে স্প্রে করা যায়। চিত্র ৭.৩ এ ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার দেখানো হয়েছে।

বিদ্যুৎ শক্তিচালিত স্প্রেয়ার (Power sprayer)ঃ বিস্তৃত এলাকায় ওষুধ ছিটানোর জন্য এ স্প্রেয়ার ব্যবহার করা হয়। এতে ওষুধ রাখার জন্য একটি বড় আধার বা ট্যাঙ্ক থাকে এবং বৈদ্যুতিক মটরের সাহায্যে এর মধ্যে বায়ুর চাপ সৃষ্টি করে ওষুধ ছিটানো হয়। ট্যাঙ্কের মধ্যে বায়ুর চাপ খুব বেশি থাকে এবং সবসময় এ চাপের পরিমাণ একই রকম থাকে বলে দ্রুত স্প্রে-এর কাজ সম্পন্ন করা যায়।

(২) শুকনো অবস্থায় ওষুধ সিঞ্চন

কিছু কিছু ওষুধের (যথা- গন্ধকচূর্ন, চূন মিশ্রিত গন্ধক চূর্ন প্রভৃতি) শুকনো গুঁড়ো গাছে ছিটানো হয়। এসব ওষুধ ভোরে শিশিরসিক্ত অবস্থায় অথবা সন্ধার আগে ছিটাতে হয়। গুঁড়ো ওষুধ ছিটানোর জন্য ডাস্টার ব্যবহার করা হয়। তরল ওষুধ ছিটানোর স্প্রেয়ারের ন্যায় ডাস্টার ও নানা প্রকারের হয়। যথা-

হস্ত চালিত ডাস্টারঃ অল্প পরিমাণ গুঁড়ো ওষুধ ছড়ানোর জন্য এ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এ যন্ত্রে হস্ত চালিত পাম্পের সাহায্যে ওষুধ ছড়ানো হয়।

ন্যাপস্যাক ডাস্টারঃ এ যন্ত্রটি ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ারের মতো এবং পিঠে রেখে ওষুধ ছড়ানো হয়।

রোটারি ডাস্টারঃ এ ডাস্টার বড় ও ছোট বাগানের জন্য ব্যবহৃত হয়। এ যন্ত্রের মধ্যে চাকার আকারে একটি পাখা আছে। যন্ত্রটি পিঠে আটকিয়ে হাতলের সাহায্যে পাখা ঘুরালে তার মধ্যে বায়ুর চাপ সৃষ্টি হয়ে নির্গমন নল দ্বারা ওষুধ বের হয়ে আসে। চিত্র ৭.৪ এ রোটারি ডাস্টার দেখানো হয়েছে।

শক্তিচালিত ডাস্টারঃ বিস্তৃত এলাকায় ওষুধ ছড়ানোর জন্য এ যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়। ওষুধ ছড়ানোর জন্য ডাস্টারের মধ্যকার পাখা বৈদ্যুতিক মটরের সাহায্যে ঘুরানো হয়।

(৩) প্রলেপ হিসেবে ওষুধের ব্যবহার

বোর্দো পেষ্ট বা মলম অথবা তৈরি অবস্থায় অনেক তামাঘটিত ওষুধ মলম হিসেবে গাছের কান্ড ও শাখার ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিয়ে রোগ দমন করা হয়। ক্ষতস্থানের মধ্য দিয়ে যাতে রোগ সংক্রমণ হতে না পারে সেজন্য মলমের প্রলেপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ওষুধ ছিটানোর নিয়মাবলী

যাতে ওষুধ অপচয় না হয় এবং কার্যকর পদ্ধতিতে ব্যবহার করা যায় সেজন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। যথা-

(১) স্প্রেয়ারে ঢালার আগে ওষুধ ছেকে নিতে হবে।

(২) শুকনো ও শান্ত আবহাওয়া ওষুধ ছিটানোর উপযোগী।

(৩) পাতা শুকনো থাকা অবস্থায় তরল ওষুধ ছিটাতে হয়।

(৪) সকালে পাতায় শিশিরসিক্ত অবস্থায় গুঁড়ো ওষুধ ছিটাতে হয়।

(৫) সর্বদা বাতাসের অনুকূলে স্প্রে করতে হবে।

(৬) ওষুধ এমনভাবে ছিটাতে হবে যেন প্রত্যেকটি পাতা হতে ফোঁটা ফোঁটা ওষুধ ঝরতে থাকে।

(৭) বর্ষাকালে ওষুধ যাতে ধুয়ে না যায় সেজন্য নানা প্রকার আঠাল পদার্থ (যেমন-ঞবিবহ ২০) ব্যবহার করা উচিত।

(৮) গাছের পাতা তেলতেলে হলে বিস্তারক ও ওয়েটিং এজেন্ট ওষুধে মিশিয়ে নিতে হবে।

(৯) গাছে ফুল হওয়ার সময় ওষুধ না ছিটানো ভালো।

(১০) সর্বদা মুখোশ পরে স্প্রে করা উচিত।

(১১) স্প্রে করার পর যন্ত্র ভালোভাবে ধুয়ে ও মুছে তেল মাখিয়ে রাখতে হবে।

(১২) বিষাক্ত ওষুধ কোনো কারণে শরীরে প্রবেশ করলে সঙ্গে সঙ্গে ডিমের সাদা অংশ ও দুধ পান করাতে হবে। পরে লবণের গরম পানি খাওয়াতে হবে। এসব প্রাথমিক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে ডেকে পরামর্শ নিতে হবে।

রোগনাশক প্রয়োগ পদ্ধতির সারসংক্ষেপ

রোগনাশক প্রয়োগ পদ্ধতি

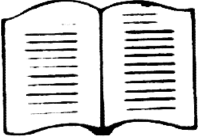
১. বীজ শোধন

১। বীজ শোধনের উপকারিতা
২। বীজ শোধনের পদ্ধতি
(১) ভৌত পদ্ধতি
ক. শুকনো অবস্থায় তাপ প্রয়োগ
খ. গরম পানি ব্যবহার
গ. অবাত শোধন
ঘ. সূর্যতাপ প্রয়োগ
ঙ. চলমান বাষ্প প্রয়োগ
(২) রাসায়নিক পদ্ধতি
ক. শুকনো পদ্ধতি
খ. ভিজানো পদ্ধতি
গ. সিঞ্চন পদ্ধতি
ঘ. ডুবানো পদ্ধতি
ঙ. পারি পদ্ধতি
৩। বীজ শোধনে সাবধানতা

২. মাটি শোধন পদ্ধতি
১। ভৌত পদ্ধতি
(১) গরম পানি ব্যবহার
(২) আগুন ব্যবহার
(৩) অগ্নিশিখা ব্যবহার
(৪) গরম বায়ু ব্যবহার

২। রাসায়নিক পদ্ধতি
(১) ফরমালিন ব্যবহার
(২) উদ্বায়ী বা গ্যাস সৃষ্টিকারী ওষুধ ব্যবহার
(৩) অনুদ্বায়ী প্রকৃতির ওষুধ ব্যবহার

৩. গাছে ওষুধ প্রয়োগ পদ্ধতি
১। তরল অবস্থায় ওষুধ সিঞ্চন
২। শুকনো অবস্থায় ওষুধ সিঞ্চন
৩। প্রলেপ হিসেবে ওষুধ ব্যবহার
৪. রোগনাশক ছিটানোর নিয়মাবলী



সারমর্ম ঃ রোগনাশক এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য যা রোগ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়। রোগ দমনে রোগনাশককে প্রতিরক্ষাম লক, নিরাময়কারী ও অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে বহু রকমের রোগনাশক বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। রোগের জীবাণু কোথায় থাকে, উহারা গাছের কোন্ অংশ আক্রমণ করে, রোগ কীভাবে বিস্তারলাভ করে প্রভৃতি বিবেচনা করে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে রোগনাশক ব্যবহার করা হয়। সাধারণত রোগনাশক বিভিন্নভাবে বীজে মাখিয়ে, গাছে ছিটিয়ে ও মাটিতে প্রয়োগ করে রোগ দমনের চেষ্টা করা হয়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। বীজতলার রোগ দমানার্থে কোন্ ওষুধটি ব্যবহার করা হয়?
- ক) বারগান্ডি মিক্সচার
- খ) বোর্দো মিক্সচার
- গ) চেসান্ড কম্বাউন্ড
- ঘ) কুপ্রাভিট

২। বোর্দো মিক্সচারের উপকরণ সামগ্রী কোন্‌টি?
- ক) তুতে ৩৫০ গ্রাম, চুন ৩৫০ গ্রাম ও পানি ৪০ লিটার
- খ) তুতে ৩৫৬ গ্রাম, চুন ৩৫০ গ্রাম ও পানি ৪০ লিটার
- গ) তুতে ৩৬০ গ্রাম, চুন ৩৫০ গ্রাম ও পানি ৩৭ লিটার
- ঘ) তুতে ৩৫৬ গ্রাম, চুন ৩৫৬ গ্রাম ও পানি ৩৭ লিটার

৩। চৌবাত্তিয়া মলমে কী কী থাকে?
- ক) তিসির তেল, কপার কার্বনেট
- খ) তিসির তেল, কপার কার্বনেট ও লাল সীসা
- গ) তিসির তেল, কপার কার্বনেট ও গন্ধক
- ঘ) তিসির তেল, গন্ধক ও তুতে

৪। কোন্ ওষুধটি বাংলাদেশসহ বহু দেশে ব্যবহার নিষিদ্ধ?
- ক) টিনঘটিত জৈব রোগনাশক
- খ) পারদঘটিত জৈব রোগনাশক
- গ) পারদঘটিত অজৈব রোগনাশক
- ঘ) গন্ধকঘটিত অজৈব রোগনাশক

৫। কোন্ স্প্রেয়ারটি পিঠে বহন করে ওষুধ ছিটানো হয়?
- ক) বায়ু সংকোচনযোগ্য স্প্রেয়ার
- খ) ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার
- গ) এ্যাটোমাইজার
- ঘ) শক্তিচালিত স্প্রেয়ার

৬। কোন্ ওষুধটি মাটি শোধনে ব্যবহৃত হয়?
- ক) ক্লোরোপিকরিন
- খ) ক্যারাথেন
- গ) ডেক্সন
- ঘ) ব্রাসিকল

ব্যবহারিক

পাঠ ১.৫ উদ্ভিদ রোগজীবাণু শণাক্তকরণ



এ পাঠ শেষে আপনি –

- রোগজীবাণু শণাক্তকরণের উদ্দেশ্য বলতে ও লিখতে পারবেন।
- রোগের জন্য দায়ী জীবাণুকে রোগগ্রস্ত গাছ ও মাটি থেকে পৃথক করে শণাক্ত করতে পারবেন।



রোগজীবাণু শণাক্তকরণের উদ্দেশ্য

- বিভিন্ন জীবাণুর আক্রমণে উদ্ভিদে বিভিন্ন প্রকারের রোগ হয়। কিন্তু অনেক সময় কেবল লক্ষণ দেখে রোগকে শণাক্ত করা যায় না। সেজন্য কোনো রোগের সাথে জড়িত কোনো প্রকৃত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ঐ জীবাণুকে রোগগ্রস্ত অংশ থেকে বিশুদ্ধভাবে পৃথক করে শণাক্ত করতে হয়।
- রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে জীবাণুর উর্দ্ধতন ক্ষমতা; জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রসার, রোগ উৎপাদন ক্ষমতা প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এসব বিষয়ে জ্ঞান আহরণে জীবাণু নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা করার প্রয়োজন হয়। এ কারণে জীবাণুকে পৃথক করে শণাক্ত করতে হয়।
- ব্যবহারিক ক্লাশ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুশীলন এবং গবেষণার জন্য জীবাণু শণাক্ত করা হয়।
- ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য বিশুদ্ধ জীবাণু সংরক্ষণ করার আগে তাকে শণাক্ত করতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন জীবাণুর ক্ষেত্রে প্রয়োজনানুসারে অনুসন্ধান প্রণালী কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলো এখানে সংক্ষেপে দেয়া হয়েছে।

১. রোগ উৎপাদক ছত্রাক শণাক্তকরণ

১। সাধারণ পরীক্ষা

উপকরণ ঃ রোগগ্রস্ত অংশ, অনুবীক্ষণ যন্ত্র বা মাইক্রোস্কোপ, কাঁচি, পাইড, গ্লিসারিন (১০%), ফরসেপ, তুলি, কভার গ্লাস, ছত্রাক শণাক্তকরণের বিভিন্ন ম্যানুয়াল ও পুস্তক, খাতা, পেন্সিল ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

- রোগগ্রস্ত অংশ মাইক্রোস্কোপের মঞ্চের ওপর রেখে সর্বাপেক্ষা কম শক্তিসম্পন্ন অবজেকটিভ লেন্স দ্বারা আক্রান্ত অংশে ছত্রাকের অবস্থান লক্ষ্য করুন।
- কোনো স্থানে ছত্রাকের কনিডিওফোর ও স্ফোর দেখা গেলে সেখান থেকে কিছু অংশ নিয়ে শুকনো পাইডে এক ফোঁটা গ্লিসারিনের উপর রাখুন।
- বাম হাতে একটি ফরসেপ নিয়ে অক্রান্ত অংশ চেপে ধরুন এবং ডান হাতে একটি তুলি নিয়ে তার উপর দিয়ে কয়েকবার হালকাভাবে ঝাড়ু দেয়ার মতো টানুন। তুলির ঘর্ষনে ছত্রাকের স্ফোর ও অন্যান্য অংশের কিছু কিছু অংশ আক্রান্ত টিস্যু থেকে গ্লিসারিনের ফোঁটায় স্থানান্তরিত হয়।
- পাইডের গ্লিসারিন থেকে যাবতীয় ময়লা, আক্রান্ত অংশের বড় বড় টুকরো ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় অংশ তুলির সাহায্যে সরিয়ে একটি কভার গ্লাস স্থাপন করুন।

- পাইডটি মাইক্রোস্কোপের লেন্সের নিচে রেখে পর্যবেক্ষণ করুন ও ছত্রাকের বিভিন্ন অঙ্গের বৈশিষ্ট্য খাতায় লিখুন। স্বাচ্ছ প্রকৃতির ছত্রাক স্কোর হলে গ্লিসারিনের স্থলে ল্যাকটোফিনল কটনব্লু ব্যবহার করুন।
- বিভিন্ন ম্যানুয়াল ও পুস্তকের সাহায্য নিয়ে ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে তাকে শণাক্ত করতে চেষ্টা করুন।

২। চোষ কাগজ পদ্ধতি

অনেক সময় রোগাক্রান্ত অংশে ছত্রাকের স্কোর কনিডিওফোর ইত্যাদি দেখা যায় না। এ পরিস্থিতিতে চোষ কাগজ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

উপকরণ ঃ প্রেট্রিডিস, চোষ কাগজ (blotting paper), কাঁচি, পাতিত পানি, রোগগ্রস্ত অংশ, মাইক্রোস্কোপ, পাইড, ল্যাকটোফিনল, তুলি, কভার গ্লাস, ছত্রাক শণাক্তকরণের পুস্তক ও ম্যানুয়েল, ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

- রোগগ্রস্ত অংশ থেকে এক টুকরো অংশ কাঁচি দিয়ে কেটে একটি কাচের পাইডে রাখুন।
- একটি পেট্রিডিসের নিচের ডালায় এক টুকরো চোষ কাগজ পেতে পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিন।
- পেট্রিডিসে অতিরিক্ত পানি থাকলে কাত করে তা ঢেলে ফেলুন ও রোগাক্রান্ত অংশসহ পাইডটি চোষ কাগজের উপর স্থাপন করুন।
- উপরের ঢালাটি নিচের ডালার উপর স্থাপন করুন এবং ২৪ – ৭২ ঘন্টা অনুশীলন কক্ষের টেবিলের উপর রেখে দিন। ভিজা চোষ কাগজ থেকে বাষ্পীভবনের ফলে পেট্রিডিসের ভিতরে প্রায় ১০০ শতাংশ আপেক্ষিক আর্দ্রতা সৃষ্টি হয়ে বিশেষ আর্দ্র পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এ আর্দ্র

  পরিবেশে রোগাক্রান্ত অংশের টুকরোতে ছত্রাক সুপ্ত অবস্থায় থাকলে তা সজীব হয়ে অনেক সময় স্কোর উৎপন্ন করে থাকে।
- স্কোর তুলি দিয়ে উঠিয়ে কাচের পাইডে ল্যাকটোফিনলের ফোটায় স্থাপন করুন ও মাইক্রোস্কোপের নিচে পর্যবেক্ষণ করুন।
- ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য একটি খাতায় লিখুন ও বিভিন্ন ম্যানুয়াল ও পুস্তকের সাহায্যে শণাক্ত করুন।

৩। বিশুদ্ধ চাষ পদ্ধতি

উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে আর্দ্র পরিবেশে স্কোর উৎপন্ন না হলে বিশুদ্ধ চাষের মাধ্যমে রোগ উৎপাদককে পৃথক করে শণাক্ত করা হয়।

উপকরণ ঃ রোগগ্রস্ত অংশ, পিডিএ আবাদমাধ্যম (২০০ গ্রাম খোসা ছাড়ানো গোল আলু, ২০ গ্রাম ডেক্সট্রোজ, ১৭.৫ গ্রাম এগার পাউডার ও ১ লিটার পানি), কনিক্যাল ফ্লাস্ক, তুলো, ব্রাউন পেপার, সুতা, সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড বা ক্লোরক্স (১০%), এলকোহল (৫০%), ০.০১% মারকিউরিক ক্লোরাইড সলিউশন, ফরসেপস, ওয়াচ গ্লাস, পেট্রিডিস, স্প্রিরিট ল্যাম্প, সসপেন, অটোক্লেভ, এক টুকরো পরিষ্কার কাপড়, ল্যাকটিক এসিড (৫০%), পিপেট, পাইড, কভার গ্লাস, গ্লিসারিন (১০%), তুলি, নির্বীজিত পানি, খাতা, ম্যানুয়াল ও বই।

কাজের ধাপ

ক. আবাদমাধ্যম (Culture medium) প্রস্তুত

- প্রথম পিডিএ আবাদমাধ্যম প্রস্তুত করুন। এর জন্য গোল আলু খোসা ছাড়িয়ে ২০০ গ্রাম মেপে নিন এবং টুকরো টুকরো করে কেটে একটি সসপেনে ৫০০ মি.লি. পানিতে সিদ্ধ করুন এবং পাতলা কাপড়ে ছেঁকে পরিষ্কার রসটুকু একটি পাত্রে নিন।
- আরও একটি পাত্রে ৫০০ মি.লি. পানিতে আলাদাভাবে এগার পাউডার মিশিয়ে গরম করে গলান এবং গোল আলুর রসের মধ্যে ঢালুন।
- পরে পাত্রে ২০ গ্রাম ডেক্সট্রোজ যোগ করে অতিরিক্ত পানি ঢেলে এক লিটার করুন এবং নেড়ে ভালো করে মিশান।
- এ আবাদমাধ্যম কাচের ফ্লাস্কে (অর্ধেকের একটু বেশি পরিমাণ) নিয়ে তুলো দিয়ে মুখ বন্ধ করুন।
- ফ্লাস্কের মুখ ব্রাউন পেপার দিয়ে মুড়ে সুতা দিয়ে বাঁধুন ও অটোক্লেভে ১৫ পাউন্ড বাড়তি চাপে ১৫-২০ মিনিট রেখে নির্বীজন (sterilize) করুন।
- এক টুকরো কাপড় ১% ফরমালিনে ভিজিয়ে একটি টেবিলের উপর বিছিয়ে দিন এবং তার ওপর নির্বীজন করা কয়েকটি পেট্রিডিস স্থাপন করুন।
- নির্বীজন করা আবাদমাধ্যম অল্প অল্প গরম থাকতে থাকতে (হাতে ফ্লাস্ক রেখে সহ্য করা যায় এমন গরম) তার মধ্যে নির্বীজন করা পিপেটের সাহায্যে ল্যাকটিক এসিড (১০০০ মি.লি. এর জন্য ১০ মি.লি.) যোগ করে আস্তে আস্তে দুলিয়ে ভালো করে মিশান এবং পেট্রিডিসের ওপরের ডালা একটু উঁচু করে ১৫ মি.লি. করে ডিসপ্রতি ঢালুন।
- আবাদমাধ্যমসহ পেট্রিডিসগুলো কিছুক্ষণ রেখে জমাট বাঁধান এবং একটির উপর আরেকটি সাজিয়ে রাখুন।

খ. রোগগ্রস্ত টিস্যু স্থাপন (চিত্র ৮ দেখুন)

- টেবিলের উপর তিনটি ওয়াচ গ্লাস স্পিরিট দিয়ে মুছে নির্বীজন করে পরপর সাজিয়ে রাখুন। প্রথমটিতে কয়েক মিলি লিটার ০.০১% মারকিউরিক ক্লোরাইড সলিউশন ঢালুন এবং অন্য দুটি ওয়াচ গ্লাসে কিছু নির্বীজন করা পানি রাখুন।
- রোগগ্রস্ত অংশের কিনারা থেকে ছোট ছোট টুকরো কাটুন ও প্রথম ওয়াচ গ্লাসে মারকিউরিক ক্লোরাইড সলিউশনে ডুবান ১-২ মিনিট একটি নির্বীজ ফরসেপ দিয়ে নাড়াচাড়া করে রোগগ্রস্ত টুকরোর উপরিভাগকে জীবাণুমুক্ত করুন।
- মারকিউরিক ক্লোরাইড বিষাক্ত এবং সেজন্য রোগগ্রস্ত টুকরোর উপরিভাগ জীবাণুমুক্ত করার পর মারকিউরিক ক্লোরাইড সলিউশন থেকে উঠিয়ে দ্বিতীয় ওয়াচ গ-াসের নির্বীজ পানিতে স্থাপন করুন। এখানে আবার কয়েকবার নাড়াচাড়া করে নির্বীজ ফরসেপ দ্বারা টুকরোগুলো তৃতীয় ওয়াচ গ্লাসের নির্বীজ পানিতে স্থানান্তর করে আগের ন্যায় নাড়াচাড়া করে টুকরোর উপরিস্থিতি মারকিউরিক ক্লোরাইড ধুয়ে ফেলুন।

  অনেক গাছের উপত্বকে ঘন লোম থাকে। ফলে, মারকিউরিক ক্লোরাইড সলিউশন সহজে গাছের দেহের সংস্পর্শে আসতে পারে না। এজন্য আক্রান্ত অংশের টুকরোগুলোকে এ পদ্ধতিতে ভালো করে নির্বীজন করা যায় না। এসব ক্ষেত্রে মারকিউরিক ক্লোরাইড সলিশনের সঙ্গে সমমাত্রায় ৫০% এলকোহল মিশিয়ে টুকরো নির্বীজন করা হয়। মারকিউরিক ক্লোরাইড সলিউশনে টুকরো নির্বীজন করলে নির্বীজত পানিতে কমপক্ষে দুবার ধুয়ে আবাদ-মাধ্যমে স্থাপন করতে হয়। বারে বারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরের সময় টুকরোতে বাতাসের

জীবাণু আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এসব অসুবিধা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আজকাল ১০% ক্লোরক্স সলিউশনে একটি ওয়াচ গ্লাসে নিয়ে তাতে টুকরো ১ মিনিট ডুবিয়ে সরাসরি আবাদমাধ্যমে স্থাপন করা হয় এবং সেখান থেকে ক্লোরক্সের ক্লোরিন গ্যাস হয়ে উড়ে যায় বিধায় টুকরোতে কোনো বিষাক্ত দ্রব্য থাকে না।

- সবশেষে টুকরোগুলে একটির পর একটি উঠিয়ে পেট্রিডিসে আবাদমাধ্যমের উপর স্থাপন করুন। আবাদমাধ্যমে স্থাপন করার আগে টুকরোর গায়ে লেগে থাকা অতিরিক্ত পানি দূর করুন। এর জন্য টুকরো পেট্রিডিসের নিচের ডালায় ভিতরের দিকে গায়ে স্পর্শ করুন অথবা সামান্য ঝাঁকি দিন এবং প্রতিটি পেট্রিডিসে তিন কোনায় একটি করে মোট তিনটি টুকরো স্থাপন করুন।
- টুকরোসহ পেট্রিডিসগুলো টেবিলের উপর অথবা ইনকিউবেটরে ৩-৪ দিন রাখুন। লক্ষ্য করুন এ সময়ে টুকরো থেকে আবাদমাধ্যমে ছত্রাক সুতার ন্যায় জন্মাতে থাকে এবং স্ফোর উৎপন্ন করতে থাকে।



চিত্র ৮ ঃ টিস্যু স্থাপন পদ্ধতিতে ছত্রাক চাষ

১- রোগগ্রস্ত পাতা, ২- রোগগ্রস্ত অংশ কর্তন পদ্ধতি, ৩- রোগগ্রস্ত অংশের কর্তিত অংশ,
৪- মারকিউরিক ক্লোরাইড সলিউশনে নিমজ্জিত কর্তিত অংশ,
৫ ও ৬- নির্বীজকৃত পানিতে কর্তিত অংশ ধৌতকরণ,
৭- কর্তিত অংশ আবাদমাধ্যমে স্থাপন

- নির্বীজিত নিডিলের সাহায্যে স্কোরসহ কিছু আবাদমাধ্যম তুলে একটি পাইডে এক ফোঁটা গ্লিসারিনে স্থাপন করুন।
- পাইডটির উপর একটি কভার গ্লাস স্থাপন করে মাইক্রোস্কোপের নিচে পর্যবেক্ষণ করুন।
- স্কোর ও অন্যান্য অংশ দেখা গেলে তাদের বৈশিষ্ট্য খাতায় লিখুন ও প্রয়োজনমতো চিত্র আঁকুন।
- বিভিন্ন ম্যানুয়াল, চিত্র ও পুস্তকের বিবরণ মিলিয়ে ছত্রাক শণাক্ত করতে চেষ্টা করুন।

২. রোগ উৎপাদক ব্যাকটেরিয়া শণাক্তকরণ

১। ব্যাকটেরিয়া চাষ

ব্যাকটেরিয়া শণাক্ত করার জন্য প্রথমে রোগগ্রস্ত অংশ থেকে ব্যাকটেরিয়া বিশুদ্ধভাবে চাষ করতে হবে। ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন পদ্ধতিতে চাষ করে বিশুদ্ধ করা হয়। নিচে কয়েকটি পদ্ধতি দেয়া হলো।

(১) টিস্যু স্থাপন পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়া চাষ

ছত্রাকের ন্যায় রোগগ্রস্ত গাছ থেকে ব্যাকটেরিয়াও একই পদ্ধতিতে আবাদমাধ্যমে চাষ করে শণাক্ত করা যায়। তবে এক্ষেত্রে পিডিএ আবাদমাধ্যমের পরিবর্তে নিউট্রিয়েন্ট এগার আবাদমাধ্যম ব্যবহার করা হয়। এ আবাদমাধ্যম তৈরির পদ্ধতি নিচে দেয়া হলো।

উপকরণ ঃ বিফ এক্সট্রাক্ট ৩ গ্রাম, পেপটোন ৫ গ্রাম, এগার এগার পাউডার ১৭.৫ গ্রাম ও পাতিত পানি ১ লিটার, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ১০% ক্ষমতাসম্পন্ন দ্রবণ।

কাজের ধাপ

- এগার এগার পাউডার ও অন্যান্য উপাদান আলাদা আলাদা পাত্রে দ্রবীভূত করে একত্রে মিশান এবং পানি যোগ করে সর্বমোট ১ লিটার করুন।
- আবাদমাধ্যম কনিক্যাল ফ্লাস্কে নিয়ে অটোক্লেভে নির্বীজন করুন এবং গরম থাকা অবস্থায় পরিমাণমতো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সলিউশন পিপেটের সাহায্যে যোগ করে অম্লত্ব (p^H) ৭ এ নিয়ন্ত্রণ করুন।
- পেট্রিডিসে আবাদমাধ্যম ঢালা, মাধ্যমে রোগগ্রস্ত টুকরো স্থাপন ও অন্যান্য ধাপ ছত্রাক চাষের অনুরূপ।

(২) ডায়লুশান পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়া চাষ

এ পদ্ধতিতে আক্রান্ত অঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসা পুঁজের ন্যায় ব্যাকটেরিয়ার অংশকে ব্যবহার করা হয়। চিত্র ৯ এ ডায়লুশন পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়া চাষ দেখানো হয়েছে।

উপকরণ ঃ পুঁজ যুক্ত আক্রান্ত অংশ, নির্বীজিত ৪টি পেট্রিডিস, ৪টি পিপেট, পানি, নিডিল, নিউট্রিয়েন্ট এগার কালচার টিউব (নিউট্রিয়েন্ট এগারসহ টিউব), স্পিরিট ল্যাম্প, এক টুকরো কাপড়।

কাজের ধাপ

- একটি টেষ্ট টিউবে কিছু নির্বীজিত পানি নিন।
- একটি নির্বীজিত নিডিলের সাহায্যে আক্রান্ত অংশ থেকে কিছুটা পুঁজ নিয়ে টিউবের পানিতে স্থানান্তর করুন এবং টিউব ঝাঁকিয়ে ব্যাকটেরিয়ার সাসপেনশন তৈরি করুন।

- একটি টেবিলের উপর এক টুকরো ভিজে কাপড় বিছিয়ে তার উপর ৪টি পেট্রিডিস পাশাপাশি সাজিয়ে রাখুন এবং প্রতি ডিসে পিপেটের সাহায্যে ৯ মিলি লিটার করে নির্বীজিত পানি মাঝখানে রাখুন।
- টিউব থেকে ১ মিলি লিটার ব্যাকটেরিয়াল সাসপেনশন পিপেটে উঠিয়ে পেট্রিডিসের ৯ মিলি লিটার পানির সাথে মিশান।
- প্রথম পেট্রিডিস থেকে ১ মিলি লিটার ব্যাকটেরিয়ামিশ্রিত পানি আর একটি পিপেটের সাহায্যে দ্বিতীয় পেট্রিডিসের ৯ মিলি লিটার পানির সাথে মিশান।
- এভাবে দ্বিতীয় পেট্রিডিস থেকে তৃতীয় পেট্রিডিসে এবং তৃতীয় পেট্রিডিস থেকে চতুর্থ পেট্রিডিসে এক মিলি লিটার ব্যাকটেরিয়ামিশ্রিত পানি স্থানান্তর করে ৯ মিলি লিটার পানির সঙ্গে মিশান এবং ১ঃ১০,০০০ পর্যন্ত ডায়লুশন তৈরি করুন।
- কিছু টেষ্ট টিউবে ১০ মিলি লিটার করে নিউট্রিয়েন্ট আবাদমাধ্যম নিয়ে নির্বীজন করার পর অল্প অল্প গরম থাকা অবস্থায় প্রত্যেক পেট্রিডিসে একটি টিউবের আবাদমাধ্যম ঢেলে ব্যাকটেরিয়া মিশ্রিত পানির সঙ্গে মিশান।



চিত্র ৯ ঃ ডায়লুশন পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়া স্বতন্ত্রীকরণ
ক- টেষ্ট টিউবে ব্যাকটেরিয়ার সাসপেনশন প্রস্তুত
খ- ব্যাকটেরিয়ার বিভিন্ন ডায়লুশন প্রস্তুত
গ- টেষ্ট টিউব থেকে ব্যাকটেরিয়ার সাসপেনশন আবাদমাধ্যমে স্থানান্তরণ

- পেট্রিডিসে আবাদমাধ্যম জমাট বাঁধার পর পেট্রিডিসগুলো ইনকিউবেটরে ২৮° - ৩০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রাখুন।
- ডায়লুশনের ফলে ব্যাকটেরিয়া একে অপর হতে বিচ্ছন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং স্বতন্ত্র ভাবে কলোনী উৎপন্ন করে। যে পেট্রিডিসে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা খুব কম থাকে সেখানে ব্যাকটেরিয়ার কলোনী কম ও দূরে দূরে হয়। এসব স্বতন্ত্র কলোনী থেকে টেষ্ট টিউবের আবাদমাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া স্থানান্তর করে বিশুদ্ধভাবে চাষ করুন।

(৩) আঁচড় পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়া চাষ (চিত্র ১০ দেখুন)

উপকরণ ঃ জমাটবাঁধা নিউট্রিয়েন্ট এগার আবাদমাধ্যম, নিডিল, ইনকিউবেটর, নিউট্রিয়েন্ট এগার টিউব বা প্যান্ট ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

- আক্রান্ত অংশের ছোট ছোট টুকরো একটি টেষ্ট টিউবে কিছু নির্বীজিত পানিতে রাখুন।
- টেষ্ট টিউবটি কয়েক মিনিট পর পর কয়েকবার ঝাঁকান (এর ফলে টুকরো থেকে ব্যাকটেরিয়া বের হয়ে পানির সাথে যুক্ত হয়ে ব্যাকটেরিয়ার সাসপেনশন তৈরি হয়)।
- একটি নির্বীজিত নিডিলের অগ্রভাগ ব্যাকটেরিয়ার সাসপেনশনে ডুবিয়ে একটি পেট্রিডিসে জমাটবাঁধা নিউট্রিয়েন্ট আবাদমাধ্যমের উপর আঁকাবাঁকাভাবে হালকা আঁচড় কাটুন (আঁচড়ের ফলে আবাদমাধ্যমের উপর দাগ সৃষ্টি হয় এবং ব্যাকটেরিয়া নিডিল থেকে আবাদমাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়। আঁচড়ের সময় নিডিলের অগ্রভাগ আবাদমাধ্যমের যেস্থান প্রথম স্পর্শ করে সেস্থানে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা খুব বেশি থাকে ও আঁচড় টানার সাথে সাথে সংখ্যাও কমতে থাকে এবং শেষের দিকে তার সংখ্যা খুবই কম হয়ে যায়)।
- পেট্রিডিস ২৪ ঘন্টা ইনকিউবেটরে রাখুন এবং লক্ষ্য করুন আঁচড়জনিত দাগের প্রথম দিকে অসংখ্য ব্যাকটেরিয়ার সংঘ বা কলোনী মিশ্রিত অবস্থায় থাকে এবং শেষের দিকে অল্প কয়েকটি কলোনী পৃথক পৃথক অবস্থায় থাকে।
- স্বতন্ত্র কোনো একটি কলোনীতে একটি নির্বীজিত নিডিলের অগ্রভাগ স্পর্শ করুন (এর ফলে নিডিলে ব্যাকটেরিয়া আঁঠার ন্যায় লেগে যাবে)।
- নিডিলটি একটি নির্বীজিত পান্টের আবাদমাধ্যমে স্পর্শ করে ব্যাকটেরিয়া স্থানান্তর করুন।
- পান্টটি টেবিলের উপর অথবা ইনকিউবেটরে রেখে ব্যাকটেরিয়াকে বিশুদ্ধ অবস্থায় জন্মাতে দিন।



চিত্র ১০ ঃ আঁচড় পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়া চাষ
১- নিক্রোম তারের নিডিল ল্যাম্পের তাপে নির্বীজকরণ
২- নিডিল দ্বারা ব্যাকটেরিয়া সংগ্রহ ও ৩- নিডিলে সংগৃহীত

ব্যাকটেরিয়া আঁচড় দিয়ে আবাদমাধ্যমে স্থানার্˳াকরণ

২। চাষকৃত ব্যাকটেরিয়া শণাক্তকরণ

ব্যাকটেরিয়া অত্যন্ত ছোট হওয়ায় ছত্রাকের ন্যায় উহাদের বিভিন্ন গণ ও প্রজাতি মাইক্রোস্কোপের নিচে রেখে সহজে শনাক্ত করা যায় না এবং সেজন্য অনেক ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়।

ব্যাকটেরিয়া অত্যন্ত ছোট হওয়ায় ছত্রাকের ন্যায় তাদের বিভিন্ন গণ ও প্রজাতি মাইক্রোস্কোপের নিচে রেখে সহজে শণাক্ত করা যায় না এবং সেজন্য অনেক ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়। তবে গ্রামস স্টেইন (Grams stain) নামক পদ্ধতি অনুসরণ করে গ্রাম পজেটিভ ও গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া পৃথক করা যায় (চিত্র ১১ দেখুন)।

উপকরণ ঃ বিশুদ্ধ ব্যাকটেরিয়া, কাঁচের স্লাইড, লুপযুক্ত নিক্রোম তারের নিডিল, স্পিরিট ল্যাম্প, পানি, গ্রামস ক্রিস্টাল ভায়লেট ও গ্রামস আয়োডিন, গ্রামস স্যাফ্রানিন নামক স্টেইন বা রঞ্জক, গ্রামস এলকোহল, মাইক্রোস্কোপ প্রভৃতি।

কাজের ধাপ

- একটি শুকনো ও পরিষ্কার স্লাইড নিয়ে তার উপর মাঝখানে রঙিন পেন্সিল দিয়ে একটি বৃত্ত আঁকুন।
- স্লাইডকে উল্টিয়ে বৃত্তের মধ্যে একটি নির্বীজকৃত নিক্রোম তারের লুপযুক্ত নিডিল দ্বারা এক ফোঁটা নির্বীজকৃত পানি রাখুন।
- নিক্রোম তারের লুপটি স্পিরিট ল্যাম্পে পুড়িয়ে নির্বীজ করুন এবং তার সাহায্যে ব্যাকটেরিয়ার বিশুদ্ধ কলোনী থেকে সামান্য একটু নিয়ে স্লাইডের উপরিস্থিত পানির ফোঁটায় ভাল করে মিশিয়ে ব্যাকটেরিয়ার একটি খুব পাতলা স্তর তৈরি করুন।
- ব্যাকটেরিয়ার স্তরটি বাতাসে শুকিয়ে স্পিরিট ল্যাম্পের শিখার উপর দিয়ে অতিক্রম করান। গরমে ব্যাকটেরিয়া মরে স্লাইডের গায়ে লেগে যায় (ব্যাকটেরিয়াকে মেরে এভাবে স্লাইডের গায়ে লাগানোর পদ্ধতিকে ফিক্সিং (fixing) বলা হয়)।
- স্লাইডে ফিক্স করা ব্যাকটেরিয়ার উপর গ্রামস ক্রিস্টাল ভায়োলেট রঞ্জক ঢেলে প্লাবিত করুন।
- এক মিনিট পর স্লাইডটি কলের নিচে রেখে পানি ঢেলে স্টেইন বা রঞ্জক যতটা সম্ভব ধুয়ে গ্রামস্ আয়োডিন দ্বারা প্লাবিত করুন।
- এক'দু মিনিট পর আবার কলের পানির সাহায্যে অতিরিক্ত স্টেইন ধুয়ে ফেলুন।
- তারপর স্লাইডের উপর ধীরে ধীরে গ্রামস্ এলকোহল ঢালতে থাকুন যতক্ষণ পর্যন্ত না রঙ ওঠা বন্ধ হয়।
- সবশেষে স্লাইডটি পানিতে ধুয়ে গ্রামস্ স্যাফ্রানিন ঢালুন ও ২০ মিনিট পর আবার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
- স্লাইডটি শুকিয়ে মাইক্রোস্কোপের অয়েল ইমারশন লেন্সের নিচে রেখে পর্যবেক্ষণ করুন। গ্রাম পজেটিভ ব্যাকটেরিয়াকে পীতবর্ণ ও গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াকে লাল বর্ণ দেখাবে।



চিত্র ১১ঃ ব্যাকটেরিয়া স্টেইনিং বা রঞ্জিতকরণ পদ্ধতি
১- নিক্রোম তারের লুপ দ্বারা ব্যাকটেরিয়া সংগ্রহ
২- পাইডের উপর পানির ফোঁটায় ব্যাকটেরিয়া মিশ্রিতকরণ
৩- তাপে ব্যাকটেরিয়াকে ফিক্সকরণ
৪- স্টেইন বা রঞ্জক ঢেলে ব্যাকটেরিয়া রঞ্জিতকরণ

ব্যাকটেরিয়ার বিভিন্ন গণ ও প্রজাতি সহজে শণাক্ত করতে না পারলেও উপরে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে রোগটি ছত্রাকজনিত না ব্যাকটেরিয়াজনিত তা শণাক্ত করা যায়।

ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার ন্যায় কৃমিকে এগার আবাদমাধ্যমে জন্মানো যায় না। তবে যান্ত্রিক উপায়ে এদেরকে পৃথক করে শণাক্ত করা যায়।

৩. রোগ উৎপাদক কৃমি শণাক্তকরণ

ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার ন্যায় কৃমিকে এগার আবাদমাধ্যমে জন্মানো যায় না। তবে যান্ত্রিক উপায়ে এদেরকে পৃথক করে শণাক্ত করা যায়। বেয়ারম্যান ফানেল পদ্ধতি কৃমি পৃথকীকরণের একটি উত্তম পদ্ধতি।

বেয়ারম্যান ফানেল পদ্ধতি (চিত্র ১২ দেখুন)

উপকরণ ঃ গাছের আক্রান্ত শিকড় ও অন্যান্য অংশ, কাঁচের ফানেল বা চুঙ্গি, এক টুকরো রবারের নল, একটি পিন্‌চ ক্লাম্প, একটি স্ট্যান্ড, পানি, এক টুকরো মসলিন কাপড়, কাঁচি, স্টেরিওমাইক্রোস্কোপ, চুঙ্গিধারক ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

- কাঁচের চুঙ্গির নির্গমন নলে একটি রবারের নল লাগান এবং এর শেষের দিকে একটি পিন্‌চ ক্ল্যাম্প লাগান।
- একটি স্ট্যান্ডের উপরের দিকে ধাতব পদার্থের তৈরি একটি চুঙ্গি ধারক আটকিয়ে এর মধ্যে চুঙ্গিটি খাড়াভাবে স্থাপন করুন।
- চুঙ্গির ভিতরের দিকে উপরের কিছু অংশ বাকি রেখে এক খন্ড মসলিন কাপড় স্থাপন করুন।
- চুঙ্গিতে পানি ঢেলে কাপড় সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করুন।
- আক্রান্ত শিকড় খন্ড খন্ড করে কেটে চুঙ্গিতে কাপড়ের ওপরে রাখুন।

- চুঙ্গিটিকে ৪৮ – ৭২ ঘন্টা কোনো রকম নাড়াচাড়া না করে স্থিরভাবে এক স্থানে রেখে দিন। এ সময়ে কৃমি শিকড় থেকে বের হয়ে কাপড়ের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে চুঙ্গির নির্গমন নলের নিচের দিকে জমা হতে থাকে।
- নির্গমন নলের নিচে একটি পেট্রিডিস স্থাপন করুন এবং পিন্‌চ ক্লাম্প আলগা করে কিছু পানির সঙ্গে কৃমি সংগ্রহ করুন।



চিত্র ১২ ঃ বেয়ারম্যান ফানেল পদ্ধতিতে কৃমি পৃথকীকরণ
১- ফানেল, ২- মসলিন কাপড় ও তার উপর স্থাপিত শিকড়ের খন্ডসমূহ
৩- ফানেল হোল্ডার, ৪- পিনচ্ ক্ল্যাম্প, ৫- রবারের নল, ৬- পেট্রিডিস ও ৭- স্ট্যান্ড

- কৃমিসহ পেট্রিডিস স্টেরিওমাইক্রোস্কোপের নিচে স্থাপন করে কৃমির বৈশিষ্ট্য খাতায় লিখুন। সম্ভব হলে কৃমির দেহ ও অন্যান্য অংশ কাগজে আঁকুন।
- কাঁচের পাইডে নেমাটোড রেখে মাইক্রোস্কোপে দেখলে তার বিভিন্ন অংশ ভালো দেখা যায় ও শণাক্ত করতে সুবিধা হয়। এজন্য একটি পরিষ্কার পাইডের উপর এক ফোটা পানি নিন। এখন স্টেরিওমাইক্রোস্কোপের নিচে রক্ষিত পেট্রিডিস থেকে তুলির সাহায্যে কয়েকটি নেমাটোড তুলে পাইডের উপর স্থাপন করুন। তারপর পাইডের পানির ফোঁটার তিন কোনায় তিন টুকরো খুব

  সূক্ষ্ম কাঁচের টুকরো স্থাপন করে তার উপর একটি কভার গ্লাস স্থাপন করুন (কাঁচের টুকরো স্থাপন না করলে কভার গ্লাসের চাপে নেমাটোড নষ্ট হয়ে যায়)। সবশেষে স্পিরিট ল্যাম্পের উপর পাইডটি সামান্য গরম করে (হাতে সহ্য করা যায় এমন গরম) কৃমিকে মেরে মাইক্রোস্কোপে পর্যবেক্ষণ করুন।
- কৃমি শণাক্তকরণের বিভিন্ন বই, চার্টের বিবরণ ও ছবির সঙ্গে আপনার কৃমির বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে শণাক্ত করতে চেষ্টা করুন।

মাটিতে কৃমি অবস্থান করে। সেজন্য আক্রান্ত জমির মাটি থেকেও কৃমিকে বেয়ারম্যান ফানেল পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা যায়।

মাটিতে কৃমি অবস্থান করে। সেজন্য আক্রান্ত জমির মাটি থেকেও কৃমিকে বেয়ারম্যান ফানেল পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা যায়। এক্ষেত্রে আক্রান্ত শিকড়ের খন্ডের পরিবর্তে আক্রান্ত জমির মাটি পাতলা করে চুঙ্গির কাপড়ের উপরে ছড়িয়ে দিন। ৪৮ – ৭২ ঘন্টার পর চুঙ্গির নির্গমন নলের মধ্যে নিচের দিকে কিছু মাটির কণা জমে। এজন্য প্রথমে পিন্‌চ ক্লাম্প আলগা করে ময়লাযুক্ত কয়েক মিলি লিটার পানি ফেলে দিয়ে পেট্রিডিসে পানিসহ কৃমি সংগ্রহ করুন।



সারমর্ম ঃ রোগগ্রস্ত অংশ সরাসরি মাইক্রোস্কোপের নিচে রেখে, চোষ কাগজ ব্যবহার করে, আবাদমাধ্যমে বিশুদ্ধভাবে চাষ করে ছত্রাক শণাক্ত করা হয়। ব্যাকটেরিয়া শণাক্ত করার জন্য টিস্যু স্থাপন, ডায়লুশন ও আঁচড় পদ্ধতি এবং কৃমি পৃথক করার জন্য বেয়ারম্যান ফানেল পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। উদ্ভিদ রোগজীবাণু শণাক্তকরণের প্রধান উদ্দেশ্য কী?
- ক) গাছে রোগ সৃষ্টি করা
- খ) গাছের রোগ দমন করা
- গ) গাছের রোগ নিরূপণ করা
- ঘ) গাছের রোগজনিত ক্ষতি নিরূপণ করা

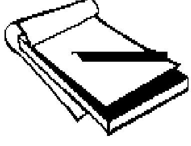
২। ছত্রাক চাষের জন্য কোন্ আবাদমাধ্যমটি সর্বোত্তম?
- ক) নিউট্রিয়েন্ট এগার
- খ) প্লেন এগার
- গ) পিডিএ
- ঘ) রোজ বেঙ্গল এগার

৩। কত পাউন্ড বাড়তি চাপে আবাদমাধ্যম নির্বীজন করা হয়?
- ক) ২০ পাউন্ড
- খ) ১৫ পাউন্ড
- গ) ২০ পাউন্ড
- ঘ) ২৫ পাউন্ড

৪। ব্যাকটেরিয়ার উপযুক্ত আবাদমাধ্যম কোন্টি?
- ক) পিডিএ
- খ) নিউট্রিয়েন্ট এগার
- গ) রিচার্ডস এগার
- ঘ) রোজ বেঙ্গল এগার

৫। সাধারণত ছত্রাকের স্পোর দেখার জন্য কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়?
- ক) টিস্যু স্থাপন পদ্ধতি
- খ) চোষ কাগজ পদ্ধতি
- গ) ডায়লুশন পদ্ধতি
- ঘ) এগার প্লেট পদ্ধতি

৬। কোন্ রোগ উৎপাদক কৃত্রিম আবাদমাধ্যমে সচরাচর চাষ করা যায় না?
- ক) ছত্রাক
- খ) ব্যাকটেরিয়া
- গ) ভাইরাস
- ঘ) মাইকোপ্লাজমা



চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ১

১। উদ্ভিদে কী কী কারণে রোগ হয়।

২। ভাইরাসের সংজ্ঞা লিখুন।

৩। কীভাবে উদ্ভিদ রোগ বিস্তারলাভ করে।

৪। উদ্ভিদ রোগ বলতে কী বুঝায়? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৫। হাইপোপ্লাস্টিক ও হাইপারপ্লাস্টিক লক্ষণের মধ্যকার পার্থক্য উদাহরণ দিয়ে বুঝান।

৬। প্রতিরক্ষামূলক ও নিরাময়কারী রোগনাশক বলতে কী বুঝায়? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৭। বীজ শোধনের উদ্দেশ্য কী?

৮। রোগনাশক ছিটানোর নিয়মাবলী লিখুন।

৯। নেক্রোসিসজনিত ৫টি রোগের বর্ণনা দিন।



উত্তরমালা - ইউনিট ১

পাঠ ১.১

১। ঘ ২। ঘ ৩। ঘ ৪। গ ৫। ক ৬। খ

পাঠ ১.২

১। ক ২। খ ৩। গ ৪। গ ৫। খ

পাঠ ১.৩

১। খ ২। ঘ ৩। খ ৪। ঘ

পাঠ ১.৪

১। গ ২। ঘ ৩। খ ৪। গ ৫। খ ৬। ক

পাঠ ১.৫

১। খ ২। গ ৩। খ ৪। খ ৫। খ ৬। গ

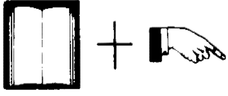
ইউনিট ২
ফসলের প্রধান প্রধান রোগের লক্ষণ ও দমন

ইউনিট ২ ফসলের প্রধান প্রধান রোগের লক্ষণ ও দমন

পৃথিবীতে যে কত প্রজাতির গাছ আছে তার সঠিক বিবরণ এখনও জানা যায়নি। তবে, যতদূর জানা যায় মানুষ এ যাবৎ প্রায় ৩০০০টি প্রজাতির গাছ শুধু খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করছে। এদের মধ্যে রয়েছে দানা শস্য, ডাল শস্য, শাকশবজি, শর্করা উৎপাদক শস্য, তৈলবীজ উৎপাদনকারী শস্য, ফলমূল, মশলা প্রভৃতি। এসব ফসলের নানাবিধ রোগ হয়ে থাকে। কোনো কোনো রোগ বিশেষ পরিস্থিতিতে হঠাৎ করে মহামারী আকারে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ফসল ধ্বংস করে এবং কৃষক অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ কারণে কৃষি কর্মীকে রোগ দমন করতে হয়। রোগ দমন করতে হলে রোগের লক্ষণ, কারণ, রোগ বৃদ্ধির ওপর পরিবেশের প্রভাব, দমন পদ্ধতি প্রভৃতি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

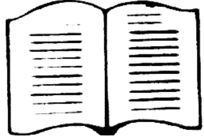
এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে ধানের ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, নেমাটোড ও ভাইরাসঘটিত রোগ এবং পাট, আখ ও তূলার বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ২.১ ধানের ছত্রাক রোগ



এ পাঠ শেষে আপনি –

- ধানের কতিপয় ছত্রাক রোগের জীবাণুর নাম বলতে ও লিখতে পারবেন।
- রোগসমূহের বৈশিষ্ট্যমূলক লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রোগ দমনার্থে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা বলতে ও লিখতে পারবেন।



ব্লাস্ট (Blast)

কারণ ঃ *Pyricularia oryzae* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়।



চিত্র ১৩ ঃ ধানের ব্লাস্ট রোগ, ক- পাতায় চক্ষু আকৃতি দাগ, খ- আক্রান্ত কান্ডের কালচে গিট, গ- সম্পূর্ণ চিটাযুক্ত শিষ

ব্লাস্ট রোগের দরুন পাতায় দাগ হয়, শিষের গোড়া ভেঙ্গে পড়ে ও শিষের ধান চিটে হয়ে যায়।

লক্ষণ ঃ যে কোনো বয়সের গাছে এ রোগ হতে পারে। এ রোগের দরুন পাতায় দাগ হয়, শিষের গোড়া ভেঙ্গে পড়ে ও শিষের ধান চিটে হয়ে যায়। প্রথমে পাতায় ছোট ছোট ঈষৎ সবুজ রঙের দাগ দেখা দেয়। ক্রমে দাগ বড় হয়ে চোখের আকৃতি ধারণ করে। দাগের কিনারা বাদামি এবং মাঝখানকার অংশ ছত্রাকের অবস্থানের জন্য ধূসর বর্ণ দেখায়। অনেক স্থানে একাধিক দাগ পরস্পরের সঙ্গে মিশে পাতার অনেক অংশ মরে শুকিয়ে যায়। এ রোগ কান্ডের গিটে কালচে রঙের দাগ সৃষ্টি করতে পারে এবং ঐ স্থানে গাছ ভেঙ্গে পড়ে। এ রোগ শিষের গোড়ার দিকে হলে আক্রান্ত অংশ কালচে হয়ে ভেঙ্গে যেতে পারে। শিষ বের হওয়ার সময় গোড়া আক্রান্ত হলে সম্পূর্ণ শিষটি চিটা হয়ে যায়। চিত্র ১৩ এ ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত ধান গাছের পাতা, কান্ড ও শিষ দেখানো হয়েছে।

দমন ঃ রোগমুক্ত এলাকা থেকে বীজ সংগ্রহ করে ৫৪^{o} সে. তাপযুক্ত পানিতে ১৫ মিনিট ডুবিয়ে অথবা হোমাই নামক ছত্রাকনাশকে (৩ ঃ ১০০০ দ্রবণে) একরাত ভিজিয়ে বীজ বপন করতে হবে। ইউরিয়া সার অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহার করা যাবে না। জমি সব সময় ভিজা রাখার চেষ্টা করা উচিত। শিষ বের হওয়ার সময় কসুমিন, হিনোসান প্রভৃতি ওষুধ স্প্রে করতে হবে পাজাম, নাইজারশাইল, ধারিয়াল প্রভৃতি আক্রমণ কাতর ধানের চাষ না করে রোগ প্রতিরোধী জাতের ধান (যথা- বিপ্লব, আশা, মুক্তা) লাগাতে হবে।

খোল পচা (Sheath blight)

Rhizoctonia solani নামক ছত্রাকের আক্রমণে ধানের খোল পচা রোগ হয়।

কারণ ঃ *Rhizoctonia solani* নামক ছত্রাকের আক্রমণে ধানের খোল পচা রোগ হয়।

লক্ষণ ঃ গাছে গোছা বের হওয়ার সময় পানির ঠিক উপরে খোলের গায়ে সবুজ-ধূসর বর্ণের সাপের গায়ের ন্যায় ছোপ ছোপ ডিম্বাকৃতি দাগ পড়ে। ক্রমে উহার দুপাশে বাদামি রঙের রেখার আবির্ভাব হয়। দাগের মধ্যে অনেক সময় প্রথমে সাদা, পরে বাদামি রঙের ছত্রাক গুটি বা স্কে-রোশিয়া হতে দেখা যায়। সাধারণত ফুল ধরা থেকে ধান পাকা পর্যন্ত এ রোগের লক্ষণ স্পষ্টভাবে দেখা দেয়। আর্দ্র আবহাওয়ায় আক্রান্ত স্থানে কান্ড সংলগ্ন পাতাগুলোও আক্রান্ত হতে পারে। রোগ বেশি হলে পাতা দুমড়ে শুকিয়ে যায় এবং ধান চিটে হয়ে যায়। চিত্র ১৪ এ খোল পচা রোগে আক্রান্ত ধান গাছ দেখানো হয়েছে।

জমি শুকানোর পর লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে নাড়া জমিতে পুড়িয়ে মাটিস্থ ছত্রাকের স্কে-রোশিয়া নষ্ট করতে

দমন ঃ জমি শুকানোর পর লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে নাড়া জমিতে পুড়িয়ে মাটিস্থ ছত্রাকের স্কে-রোশিয়া নষ্ট করতে হবে। চারা ২৫ × ২০ সে.মি. দূরে দূরে লাগাতে হবে। ছত্রাকটি অনেক আগাছাকে আক্রমণ করে বেঁচে থাকে বিধায় ক্ষেত যথাসম্ভব পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। অতিরিক্ত সারে রোগ বেশি হয় এবং সেজন্য প্রয়োজন অনুসারে সার প্রয়োগ করতে হবে।



কান্ড পচা (Stem rot)

Sclerotium oryzae নামক ছত্রাক দ্বারা কান্ড পচা রোগ হয়।

কারণ ঃ *Sclerotium oryzae* নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়।

লক্ষণ ঃ সাধারণত বয়স্ক গাছে এ রোগ হয়। প্রাথমিক অবস্থায় পানির সমতলস্থিত স্থানে কান্ডের বাহিরের খোলে অনিয়মিত ছোট ছোট কালচে দাগ হয়। রোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে দাগ বড় হতে থাকে এবং ছত্রাক

চিত্র ১৪ ঃ ধানের খোল পচা রোগ খোলে ছোপ ছোপ দাগ ও স্কে-রোশিয়া লক্ষণীয়

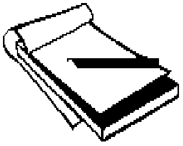
ভেতরের পত্রাবরণ আক্রমণ করে উহার মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং সেখানকার টিস্যু পচিয়ে ফেলে। এর ফলে গাছ হেলে ভেঙ্গে পড়ে। এ রকম গাছের কান্ড লম্বালম্বিভাবে চিরলে ভেতরে খুব ছোট ছোট গোলাকার অসংখ্য কালচে রঙের স্কে-রোশিয়া দেখতে পাওয়া যায়। চিত্র ১৫ এ কান্ড পচা রোগে আক্রান্ত ধান গাছ দেখানো হয়েছে।

গাছের কান্ড লম্বালম্বিভাবে চিরলে ভেতরে খুব ছোট ছোট গোলাকার অসংখ্য কালচে রঙের স্কে-রোশিয়া দেখতে পাওয়া যায়।

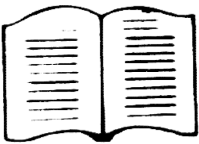
দমন ঃ ছত্রাক স্কে-রোশিয়াম অবস্থায় নাড়া ও মাটিতে বেঁচে থাকে এবং পরবর্তী বছরে রোগ সংক্রমণ করে। এ কারণে জমি শুকিয়ে ভালো করে নাড়া পুড়িয়ে ফেলতে হবে। মাঝে মাঝে রোপা জমি থেকে পানি সরিয়ে জমি শুকাতে হয়। ঘন করে চারা লাগানো উচিত নয়। জমিতে নাইট্রোজেন সার কম ও পটাশিয়াম সার বেশি প্রয়োগ করতে হয়। কিছুটা সহনশীল জাতের ধান (যথা- বিপ্লব, আশা, ব্রিশাইল ইত্যাদি) চাষ করতে হবে। হেক্টর প্রতি ২.২৫ কি. গ্রাম হোমাই ওষুধ ৫০০ লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছের গোড়ার দিকে কান্ডে ছিটিয়ে দিতে হবে।



চিত্র ১৫ ঃ ধানগাছের কান্ড পচা রোগ
ক- কান্ডে (পানির সমতল স্থানে) কালচে অনিয়মিত দাগ
খ- কান্ডের ভেতরে খুব ছোট ছোট কালচে স্কে-রোশিয়া



***অনুশীলন (Activity)ঃ** ধানে খোল পচা ও কান্ড পচা রোগের মধ্যে কী কী পার্থক্য রয়েছে লিখুন।*



সারমর্ম ঃ ব্লাস্ট, খোল পচা ও কান্ড পচা ধানের কয়েকটি ক্ষতিকর রোগ। ব্লাস্ট রোগে পাতায় চক্ষু আকৃতির দাগ, কালচে গিট ও চিটাযুক্ত শিষ হয়। খোল পচা রোগে খোলের উপর সাপের গায়ের মতো ডোরাকাটা দাগ হয়, কান্ড পচা রোগে কান্ডে পানির সমতলে কালচে দাগ পড়ে ও ঐ স্থানে গাছ ভেঙ্গে হেলে পড়ে। ফসলের পরিত্যক্ত অংশসমূহ ধ্বংস করে, সুষম সার ব্যবহার করে, রোগনাশক ছিটিয়ে এসব রোগ দমন করতে হয়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। ব্লাষ্ট রোগে পাতায় কী ধরনের দাগ উৎপন্ন হয়?
- ক) গোলাকৃতি
- খ) নলাকৃতি
- গ) ডিম্বাকৃতি
- ঘ) চক্ষু আকৃতি

২। ব্লাষ্ট রোগপ্রতিরোধক জাতের ধান কোন্‌টি?
- ক) পাজাম
- খ) নাইজারশাইল
- গ) বিপ্লব
- ঘ) আই. আর-৮

৩। খোল পচা রোগ হলে খোলে কী ধরনের দাগ হয়?
- ক) সবুজ বর্ণের লম্বাটে দাগ
- খ) বাদামি বর্ণের লম্বাটে দাগ
- গ) কালো বর্ণের ডিম্বাকৃতি দাগ
- ঘ) সবুজ-ধূসর বর্ণের ডিম্বাকৃতি ছোপ ছোপ দাগ

৪। কান্ড পচা রোগের সঠিক লক্ষণ কোন্‌টি?
- ক) সম্পূর্ণ খোল কালো হয়ে পচে যায়
- খ) খোল ভালো থাকে কিন্তু কান্ড কালো হয়ে পচে যায়
- গ) খোল ও কান্ড উভয়ই কালো হয়ে পচে যায়
- ঘ) খোল ও কান্ডে পানির সমতলে অনিয়মিত কালচে দাগ পড়ে এবং ঐ স্থানে কান্ড পচে ভেঙ্গে পড়ে

পাঠ ২.২ ধানের ব্যাকটেরিয়াল রোগ



এ পাঠ শেষে আপনি –

- ধান গাছের দুটো ব্যাকটেরিয়াল রোগের কারণ বলতে ও লিখতে পারবেন।
- রোগ দুটির লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রোগের দমন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলতে ও লিখতে পারবেন।



ব্যাকটেরিয়াল লিফ ব্লাইট (Bacterial leafblight)

Xanthomonas campestris pv. *oryzae* এর আক্রমণে ব্যাকটেরিয়াল লিফ ব্লাইট রোগ হয়।

কারণ ঃ *Xanthomonas campestris* pv. *oryzae* - এর আক্রমণে এ রোগ হয়।

লক্ষণ ঃ সাধারণত চারা লাগানোর ৫-৬ সপ্তাহ পরে ধানে ব্যাকটেরিয়াল লিফ ব্লাইট রোগ দেখা দেয়। প্রাথমিক অবস্থায় পাতার কিনারায় পানিভেজার মতো দাগের আবির্ভাব হয়। ক্রমে উহা হলদে থেকে সাদা রঙের জলছাপের মতো দাগ সৃষ্টি করে। আক্রান্ত অংশ ঢেউ খেলানোর মতো দেখায় ও কয়েক দিনের মধ্যে ঝলসে শুকিয়ে খড়ের রং ধারণ করে। দাগ এক প্রান্ত বা উভয় প্রান্ত অথবা ক্ষত পাতার যে কোনো স্থান থেকে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে পাতার সমস্ত অংশে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রমণকাতর জাতের ধানে দাগ পাতার খোলসের নিচ পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। ভোরের দিকে সদ্য আক্রান্ত অংশে দুধ বর্ণের আঠালো ফোঁটা জমতে দেখা যায়। পরে এগুলো শুকিয়ে কমলা রঙের ছোট ছোট পুতির দানার



চিত্র ১৬ ঃ ধানের ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট রোগ

বামে- আক্রান্ত গাছ (পাতার ধার সাদা বর্ণ ধারণ)

ডানে- আক্রান্ত পাতায় হলদে থেকে সাদা জলছাপের মতো দাগ

আকার ধারণ করে। এ সকল দানা অসংখ্য ব্যাকটেরিয়ার সমন্বেয়ে গঠিত। চিত্র ১৬ এ ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট রোগে আক্রান্ত ধান গাছ দেখানো হয়েছে।

দমন ঃ নাড়া জমিতে শুকিয়ে পুড়িয়ে ফেলুন। অপ্রয়োজনে পানি না রেখে ক্ষেত শুকিয়ে ফেলতে হবে। মালা, বিপ্লব, আশা, সুফলা প্রভৃতি রোগসহনশীল জাতের ধান চাষ করতে হবে।

ব্যাকটেরিয়াল লিফ স্ট্রিক (Bacterial leafstreak)

Xanthomonas campestris pv. *oryzicola* নামক ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে ব্যাকটেরিয়াল লিফ স্ট্রিক রোগ হয়।

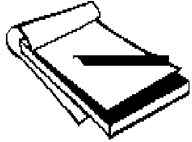
কারণ ঃ *Xanthomonas campestris* pv. *oryzicola* নামক ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়।



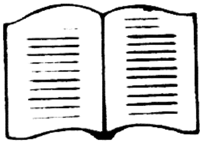
লক্ষণ ঃ প্রাথামিক অবস্থায় পাতার উপর শিরা বরাবর লম্বালম্বিভাবে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট সরু আঁচড়ের রেখার মতো পানিভেজা দাগের আবির্ভাব হয়। এ অবস্থায় পাতা সূর্যের দিকে ধরে উল্টো দিক থেকে দেখলে দাগগুলোকে স্বচ্ছ দেখায়। ক্রমে দাগ লম্বায় বাড়ে এবং প্রথমে হলুদ ও পরে লালচে-বাদামি রঙ ধারণ করে। এ অবস্থায় আক্রান্ত ক্ষেত দুর হতে লালচে দেখায়। ভোরের দিকে দাগের উপর সারিবদ্ধভাবে হলুদ বর্ণের ব্যাকটেরিয়াচূর্ণ পানি বিন্দু জমতে দেখা যায় যা বেলা বাড়ার সাথে সাথে শুকিয়ে কমলা রঙের পুতির মালার দানার মতো হয়। চিত্র ১৭ এ ব্যাকটেরিয়াল লিফ স্ট্রিক রোগে আক্রান্ত ধান গাছ দেখানো হয়েছে।

চিত্র ১৭ ঃ ধানের ব্যাকটেরিয়াল লিফ স্ট্রিক রোগ
(সরু আঁচড়ের মতো লালচে-বাদামি রঙের দাগযুক্ত পাতা)

দমন ঃ বীজ ৫০^{o} সে. তাপমাত্রায় পানিতে ১৫ মিনিটকাল ভিজিয়ে অথবা পানিমিশ্রিত হোমাই নামক ছত্রাকনাশকে একরাত ভিজিয়ে বপন করতে হয়। ক্ষেতের পরিত্যক্ত সমস্ত নাড়া পুড়িয়ে ফেলতে হবে। বিপ্লব, আশা, মুক্তা, প্রগতি প্রভৃতি রোগসহনশীল জাতের ধান চাষ করতে হবে।



অনুশীলন (Activity) : ব্যাকটেরিয়াল লিফ ব্লাইট এবং লিফস্ট্রিকের মধ্যে তুলনা করুন।



সারমর্ম ঃ ব্যাকটেরিয়াল লিফ ব্লাইট ও ব্যাকটেরিয়াল লিফস্ট্রিক ধান গাছের দুটি প্রধান ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। ব্লাইট রোগে পাতায় হলদে থেকে সাদাটে জলছাপের মতো দাগ পড়ে শুকিয়ে খড়ের রঙ ধারণ করে। স্ট্রিক রোগে পাতায় সরু আঁচড়ের মতো লালচে-বাদামি দাগ হয়। নাড়া পুড়িয়ে, বীজ শোধন করে ও রোগসহনশীল জাতের ধান চাষ করে এসব রোগ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

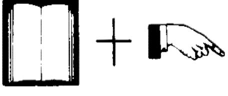
১। সাধারণত গাছের কোন্ পর্যায়ে ব্যাকটেরিয়াল লিফ ব্লাইট রোগ দেখা দেয়?
- ক) চারা লাগানোর ১ সপ্তাহ পর থেকে
- খ) চারা লাগানোর ২-৩ সপ্তাহ পর থেকে
- গ) চারা লাগানোর ৫-৬ সপ্তাহ পর থেকে
- ঘ) ছড়া বের হওয়ার পর থেকে

২। ব্যাকটেরিয়াল লিফ ব্লাইটের প্রাথমিক লক্ষণ কোন্‌টি?
- ক) পাতার কিনারায় বাদামি ডিম্বাকৃতির দাগ হয়
- খ) পাতার কিনারায় আঁকাবাঁকা পানিভেজা দাগ হয়
- গ) পাতার কিনারায় পানিভেজা ঘোলাটে লম্বা দাগ হয়
- ঘ) পাতার কিনারায় সরু কমলা রঙের দাগ হয়

৩। প্রাথমিক অবস্থায় ব্যাকটেরিয়াল লিফ স্ট্রিক রোগে পাতায় কী ধরনের দাগ হয়?
- ক) সরু রেখার মতো পানিভেজা দাগ
- খ) সরু রেখার মতো লালচে দাগ
- গ) সরু রেখার মতো কমলা রঙের দাগ
- ঘ) সরু রেখার মতো হলুদ রঙের দাগ

৪। ব্যাকটেরিয়াল লিফ স্ট্রিক রোগ দমনে বীজ কোন্ ওষুধে শোধন করতে হবে?
- ক) ভিটাভ্যাক্স
- খ) প্লান্টভ্যাক্স
- গ) হোমাই
- ঘ) হিনোসান

পাঠ ২.৩ ধানের নেমাটোড ও ভাইরাস রোগ



এ পাঠ শেষে আপনি –

- ধান গাছের দুটি নেমাটোড ও টুংরো রোগের কারণ বলতে ও লিখতে পারবেন।
- এসব রোগের লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রোগসমূহ দমনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলতে ও লিখতে পারবেন।



উফরা রোগ (Ufra)

কারণ ঃ *Ditylenchus angustus* নামক কৃমির আক্রমণে এ রোগ হয়।

Ditylenchus angustus নামক কৃমির আক্রমণে উফরা রোগ হয়।

লক্ষণ ঃ সাধারণত শিষ বের হওয়ার আগে গাছে এ রোগ ধরা পড়ে। সবেমাত্র যে পাতা বের হচ্ছে তাতে প্রথমে সাদা ছিটকা দাগ পড়ে। ধীরে ধীরে কচি পাতাটি ভেঙ্গে পড়ে। পাতা বের হওয়ার সময় মুচড়ে যায়। অনেক সময় পাতার নিম্নাংশ দ্বারা থোড় আবদ্ধ থাকে। এর ফলে শিষ ভালোভাবে বের হতে পারে না এবং থোড়ের মধ্যে থেকে মুচড়িয়ে বিকৃত হয়ে ফুলে ওঠে এবং ধান চিটা হয়ে যায়। কোনো কোনো সময় শিষ বের হয়ে আসলেও মাথায় গোটাকয়েক স্বাভাবিক ধান হয় এবং নিচের সব ধানই চিটা অথবা কিছু পুষ্ট ও কিছু অর্ধপুষ্ট অবস্থায় থাকে। চিত্র ১৮ এ উফরা রোগে আক্রান্ত ধান গাছ দেখানো হয়েছে।



দমন ঃ মৌসুম শেষে চাষ করে জমি ও নাড়া শুকাবেন। পরে নাড়া পুড়িয়ে মাটিস্থিত কৃমি ধ্বংস করতে হবে। জলী আমন ধান বিলম্বে বুনলে এ রোগ কম হয়। সম্ভব হলে শস্য পর্যায়ে ধান বাদ দিয়ে অন্য ফসল, যেমন পাট চাষ করা উচিত। প্রাথমিক অবস্থায় রোগ ধরতে পারলে গাছের আগা ছেটে দিতে হয়। প্রতি বিঘা জমিতে ৪-৫ কেজি ফুরাডান ছিটালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

চিত্র ১৮ ঃ ধানের উফরা রোগ
উপরে- সাদা ছিটকা দাগযুক্ত কচি পাতা
নিচে- ভাঙ্গা পাতা ও চিটাযুক্ত শিষ

২. শিকড় গিট (Root knot)

শিকড় গিট রোগ *Meloidogyne graminicola* নামক কৃমির আক্রমণে হয়।

কারণ ঃ এ রোগ *Meloidogyne graminicola* নামক কৃমির আক্রমণে হয়।

লক্ষণ ঃ প্রথমে শুকনো মাটিতে গাছের গোড়া কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত গাছের পাতা কমলা-হলদে রঙ ধারণ করে শুকিয়ে যেতে থাকে ফলে ক্ষেতে মাঝে মাঝে হলুদ মনে হয়। মাটির নিচে শিকড়ে অনেক গিট হতে দেখা যায়। আক্রান্ত গাছে কুশি কম হয়।

দমন ঃ শস্য আহরণের পর জমির মাটি শুকিয়ে রোদ খাওয়াতে হবে ও গাছের গোড়া সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। রোগগ্রস্ত বীজতলা বা জমিতে হেক্টর প্রতি ৩০ কেজি ফুরাডার- ৩জি দানাদার ছিটিয়ে ৫-৬ দিন পানি আটকে রাখতে হবে।

টুংরো রোগ ভাইরাস দ্বারা সংঘটিত একটি মারাত্তক রোগ।

টুংরো রোগ

কারণ ঃ এটি ভাইরাস দ্বারা সংঘটিত একটি মারাত্তক রোগ।

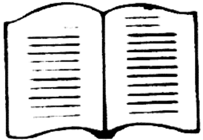
লক্ষণ ঃ প্রথমে গাছের গোড়ার দিকের বয়স্ক পাতাগুলোর আগা হলদে হয়ে আসতে থাকে। ক্রমে এ লক্ষণ অন্যান্য পাতায়ও প্রকাশ পেতে থাকে। হলুদ রঙ সব সময় পাতার গোড়া পর্যন্ত বিস্তারলাভ নাও করতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ রঙ আগার দিকেই সীমাবদ্ধ থাকে। ধীরে ধীরে আক্রান্ত গাছের পাতা হলুদ থেকে কমলা রঙ ধারণ করে। আরও পরে ওসব পাতার ডগার দিকে মরচে রঙের ছোট ছোট দাগ হতে থাকে। সুস্থ গাছের তুলনায় আক্রান্ত গাছ সামান্য বেঁটে হয় কিন্তু কুশির সংখ্যা স্বাভাবিক থাকে। আক্রান্ত গাছের শিষ সম্পূর্ণ বের হয় না। দানা ছোট হয় এবং পুষ্ট হয় না। চিত্র ১৯ এ টুংরো রোগে আক্রান্ত ধান গাছের পাতা ও ধানক্ষেত দেখানো হয়েছে।



টুংরো রোগ দমনের জন্য ব্রিশাইল, লতিশাইল, মোহিনী প্রভৃতি রোগসহনশীল জাতের ধান চাষ করতে হবে।

দমন ঃ এ রোগ দমনের জন্য ব্রিশাইল, লতিশাইল, মোহিনী প্রভৃতি রোগসহনশীল জাতের ধান চাষ করতে হবে। পাতা ফড়িং এ রোগ ছড়ায় বিধায় নগস কীটনাশক ছিটিয়ে এসব বাহক পোকা ধ্বংস করতে হবে। বুনো ঘাসে ভাইরাস সক্রিয় অবস্থায় থাকে এবং বাহক পোকা যাতে এসব গাছ থেকে ধান গাছে ভাইরাস ছড়াতে না পারে সেজন্য বুনো ঘাস উঠিয়ে ফেলতে হবে।

চিত্র ১৯ ঃ ধানের টুংরো রোগ
উপরে- পাতার আগার দিক হলদে হওয়া লক্ষ্যনীয়
নিচে- আক্রান্ত ক্ষেতের সাধারণ দৃশ্য



সারমর্ম ঃ উফরা রোগে কচি কচি পাতায় সাদা ছিটকা দাগ পড়ে, থোড় অনেক ক্ষেত্রে বের হতে পারে না এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বের হলেও অধিকাংশ ধান চিটা হয়ে যায়। শিকড় গিট রোগে শিকড়ে অনেক গিট হয় এবং গাছের পাতা কমলা-হলদে রঙ ধারণ করে। সমস্ত নাড়া পুড়িয়ে, শস্য পর্যায়ে অন্য ফসল লাগিয়ে, ক্ষেতে ফুরাডান ছিটিয়ে এ রোগ দমন করতে হয়। টুংরো রোগে পাতা আগার

দিক থেকে হলুদ হয়ে আসে। এ রোগ দমনে কীটনাশক স্প্রে করতে হবে ও রোগপ্রতিরোধী জাতের ধান চাষ করতে হবে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। উফরা রোগ কোন্ জীবাণু দ্বারা হয়?
- ক) মাইকোপ্লাজমা
- খ) নেমাটোড
- গ) ব্যাকটেরিয়া
- ঘ) ছত্রাক

২। উফরা রোগের বৈশিষ্ট্য কোন্টি?
- ক) কচি পাতায় সাদা ছিটকা দাগ পড়া
- খ) কচি পাতায় কালো কালো দাগ পড়া
- গ) কচি পাতায় হলুদ রঙের দাগ পড়া
- ঘ) কচিপাতায় বাদামি রঙের দাগ পড়া

৩। উফরা রোগ দমনার্থে কোন্ ওষুধটি ব্যবহার করা হয়?
- ক) ফুরাডান
- খ) সেভিন
- গ) কুপ্রাভিট
- ঘ) নগস

৪। শিকড় গিট রোগের লক্ষণ কোন্টি?
- ক) কুশি কম হয় ও পাতা কমলা-হলদে হয়
- খ) কুশি কম হয় ও পাতা হালকা হলদে হয়
- গ) কুশি বেশি হয় ও পাতা কমলা-হলদে হয়
- ঘ) কুশি বেশি হয় ও পাতা সবুজ থাকে

৫। টুংরো রোগে গাছের বৃদ্ধি কেমন হয়?
- ক) স্বাভাবিকের তুলনায় কিছুটা বেঁটে হয়
- খ) স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক লম্বা হয়
- গ) স্বাভাবিকভাবে বাড়তে থাকে
- ঘ) ঘাসের ন্যায় খর্বাকৃতি হয়

৬। টুংরো রোগ কোন্ পতঙ্গ দ্বারা ছড়ায়?
- ক) এফিড
- খ) মাইট
- গ) পাতা ফড়িং
- ঘ) গান্ধী পোকা

পাঠ ২.৪ পাটের রোগ



এ পাঠ শেষে আপনি –

- পাটের কতিপয় রোগের কারণ কী তা বলতে পারবেন ও লিখতে পারবেন।
- রোগ সম হের লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রোগগুলো কীভাবে দমন করতে হয় তা বলতে ও লিখতে পারবেন।



কান্ড পচা (Stem rot)

*Macrophomina phaseolin*ধ নামক ছত্রাকের আক্রমণে কান্ড পচা রোগ হয়।

কারণ ঃ *Macrophomina phaseolina* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়।

লক্ষণ ঃ গাছের সব অঙ্গেই এ রোগ হতে পারে এবং সব মিলে চার প্রকারের লক্ষণ সৃষ্টি করে যথা-

চারা ধ্বসা ঃ বীজ অঙ্কুরোদ্গমের সময় বীজপত্রের উপর কালো দাগ পড়ে এবং ক্রমে উহা শুকিয়ে যায়। বড় চারাগাছে প্রথমে পাতার ফলকে এবং পরে সেখান থেকে রোগ বোঁটায় ছড়িয়ে পড়ে।

আক্রান্ পাতার ফলক অনেক সময় দুর্বল হয়ে ঢলে কান্ডের গায়ে লেগে থাকতে দেখা যায়। এর ফলে পাতা থেকে ছত্রাক কান্ডে ছড়িয়ে পড়ে।

শিকড় পচা

শিকড় আক্রান্ত হলে উহাতে প্রথমে বাদামি ও পরে কালো দাগ হয়ে পচে যায়। অপেক্ষাকৃত মোটা শিকড়ে স্থানে স্থানে বাকল পচে গোটা গাছটাই শুকিয়ে যায়।

কান্ড পচা

কান্ডে প্রথমে হালকা বাদামি, পরে গাঢ় বাদামি দাগের সৃষ্টি হয়। ক্রমশ ঐ দাগ কান্ডের বাকলে চারিদিক থেকে বেড়ে উহাকে পচিয়ে ফেলে। বাকল পচার ফলে গাছ মরে যেতে পারে। বড় গাছে বাকল ফেটে ভেতর থেকে আঁশ বের হয়ে আসে। কান্ডের ওপর আক্রান্ত অংশে গামাচির ন্যায় অসংখ্য ক্ষুদ্র ছত্রাকের স্পোর ধারক পিকনিডিয়া কিছুটা ডুবা অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। এজন্য কান্ডের উপরটা কিছুটা খসখসে মনে হয়। চিত্র ২০ এ কান্ড পচা রোগে আক্রান্ত পাট গাছ দেখানো হয়েছে।



ফল পচা

আক্রান্ত ফল কালো হয়ে যায়। অনেক সময় ভেতকার বীজও বিবর্ণ হয়ে যায়।

রোগমুক্ত এলাকা থেকে বীজ সংগ্রহ করে শোধনের পর বপন করবেন

দমন ঃ রোগমুক্ত এলাকা থেকে বীজ সংগ্রহ করে শোধনের পর বপন করবেন (প্রতি কেজি বীজে ৫ গ্রাম পারদঘটিত ওষুধ), অম্ল জমি চুন দ্বারা (০.৭-১.৫ টন/হেকটর) শোধন করে নিতে হয়। রোগসহনশীলতা বৃদ্ধির জন্য জমিতে পটাশ সার বেশি করে প্রয়োগ করা উচিত। বীজের জন্য নির্ধারিত ক্ষেতের গাছে ফল ধরার সময় থেকে কয়েকবার ছত্রাকনাশক ছিটাতে হয়। ফসল তোলার পর পরিত্যক্ত অংশসমূহ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলা উচিত।

চিত্র ২০ ঃ পাটের কান্ড পচা রোগ

বামে- আক্রান্ত কান্ডের অংশ বিশেষে গামাছির ন্যায় অসংখ্য পিকনিডিয়া
ডানে- হাত লেন্স দ্বারা পিকনিয়াকে বড় করে দেখানো হয়েছে।

কালো পট্টি (Black band)

Diplodia corchori নামক ছত্রাক দ্বারা পাটে কালো পট্টি রোগ হয়।

কারণ ঃ *Diplodia corchori* নামক ছত্রাক দ্বারা পাটে কালো পট্টি রোগ হয়।



লক্ষণ ঃ সাধারণত পূর্ণবয়স্ক গাছে এ রোগ বেশি হয়। প্রথমে গাছের গোড়ার দিকে মাটির কিছু উপরে বিক্ষিপ্তভাবে বাদামি রঙের দাগ উৎপন্ন হয়। ক্রমে দাগ কালচে হয়ে অনেক স্থানে কান্ডের চারিদিক দিয়ে ঘিরে কালো পট্টির ন্যায় দাগ সৃষ্টি করে। একাধিক দাগ মিশে অনেক সময় সমস্ত কান্ডকেই কালো করে ফেলে। আক্রান্ত কান্ডে অসংখ্য কালো কালো বিন্দু আকৃতির পিকনিডিয়া হতে দেখা যায়। এ কান্ড হাতে ঘষলে কালো স্ফোর লেগে হাত কালো হয়ে যায়। বেশি রোগগ্রস্ত গাছের পাতা ঝরে পড়ে এবং দূর হতে পত্রবিহীন কালো কান্ডকে স্পষ্ট চেনা যায়। চিত্র ২১ এ কালো পট্টি রোগে আক্রান্ত পাট গাছ দেখানো হয়েছে।

দমন ঃ এ রোগের দমন পদ্ধতি কান্ড পচা রোগ দমনের অনুরূপ।

চিত্র ২১ ঃ পাটের কালো পট্টি রোগ
কান্ডাংশে কালো পট্টির ন্যায় দাগ

এনথ্রাকনোজ (Anthracnose)

Colletotrichum corchorum নামক ছত্রাকের আক্রমণে এনথ্রাকনোজ রোগ হয়।

কারণ ঃ *Colletotrichum corchorum* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়।



লক্ষণ ঃ চারাগাছের কান্ড ও পাতায় বাদামি রঙের দাগ উৎপন্ন হয়। বড় গাছের কান্ডে ছোট ছোট কালো ক্ষতের সৃষ্টি হয়। একাধিক দাগযুক্ত হয়ে বড় ক্ষতের সৃষ্টি করতে পারে। অনেক সময় আক্রান্ত স্থানের ছাল ফেটে ভেতর থেকে অনেকগুলো আঁশ একত্রে ছোবড়ার মতো বের হয়ে আসে। কোনো কোনো স্থানে ফাটলের মধ্য দিয়ে পাটকাঠি দেখতে পাওয়া যায়। ক্ষতস্থান শুকিয়ে শক্ত গিটের ন্যায় হয় এবং এটি পানিতে পচতে পারে না বিধায় আঁশ ছাড়ানোর সময় ঐ স্থানে আঁশ ছিড়ে যায়।

চিত্র ২২ এ এনথ্রাকনোজ রোগে আক্রান্ত পাট গাছ দেখানো হয়েছে।

দমন ঃ তোষা পাটে এ রোগ হয় না। সেজন্য যে সব অঞ্চলে এ রোগ হয় সেখানে তোষা পাঠ চাষ করতে হয়। রোগ দমনের অন্যান্য ব্যবস্থা কান্ড পচা রোগ দমনের অনুরূপ।

চিত্র ২২ ঃ পাটের এনথ্রাকনোজ রোগ
(কান্ডস্থিত ক্ষতযুক্ত দাগ)

গোড়া পচা (Foot rot)

Sclerotium rolfsii নামক ছত্রাক দ্বারা গোড়া পচা রোগ হয়।

কারণ ঃ *Sclerotium rolfsii* নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়।

লক্ষণ ঃ গাছের গোড়ায় মাটির ঠিক ওপরে সাদা তূলার মতো জন্মাতে থাকে এবং কান্ড বাদামি রঙ ধারণ করে পচতে শুরু করে। ফলে, গাছ গোড়া থেকে ভেঙ্গে মাটিতে পড়ে যায়। আক্রান্ত অংশে প্রথমে সাদা, পরে বাদামি রঙের সরিষার দানার মতো স্কে-রোশিয়াম উৎপন্ন হয়।

দমন ঃ ফসল আহরণের পর পরিত্যক্ত অংশসমূহ (গোড়া ও শিকড়) সতর্কতার সঙ্গে কুড়িয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। অল্প সংখ্যক গাছে রোগ হলে গাছ উঠিয়ে ফেলতে হবে অথবা গোড়ার চারিদিকে ছত্রাকনাশক ছিটাতে হবে।

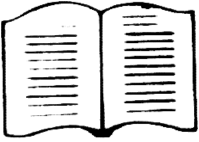
মোজাইক (Mosaic)

তিতা পাটে মোজাইক রোগ বেশি হয়। আক্রান্ত গাছের পাতায় ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত সবুজ ও হলুদ রঙের ছোট ছোট দাগ হয়। পাতা কিছুটা কুঁকড়ে যায় এবং অপেক্ষাকৃত ভঙ্গুর হয়ে

কারণ ঃ মোজাইক এক প্রকার ভাইরাসজনিত রোগ।

লক্ষণ ঃ তিতা পাটে মোজাইক রোগ বেশি হয়। আক্রান্ত গাছের পাতায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সবুজ ও হলুদ রঙের ছোট ছোট দাগ হয়। পাতা কিছুটা কুঁকড়ে যায় এবং অপেক্ষাকৃত ভঙ্গুর হয়ে ওঠে। রোগ বেশি হলে গাছ বেঁটে ও পাতা ফ্যাকাসে হয়ে যায়।

দমন ঃ বীজের মারফত এ রোগ বিস্তারলাভ করে এবং সাদা শোষক পোকা ভাইরাসের বাহক হিসেবে কাজ করে। এ কারণে বীজের জন্য রক্ষিত ক্ষেতের আক্রান্ত গাছগুলো দেখামাত্র উঠিয়ে ধ্বংস করতে হবে এবং কীটনাশক স্প্রে করে বাহক পোকা মেরে ফেলতে হবে।



সারমর্ম ঃ পাটের কান্ড পচা, কালো পট্টি, এনথ্রাকনোজ, গোড়া পচা ও মোজাইক রোগসম হের কারণ, রোগ শণাক্তকরণ এবং দমন পদ্ধতি এ পাঠে বর্ণনা করা হয়েছে। কান্ড পচা রোগে কান্ডে বাদামি দাগ পড়ে ও তার ওপরে গামাচির ন্যায় অসংখ্য পিকনিডিয়া হয়। কালোপট্টি রোগে কান্ডে কালোপট্টির ন্যায় দাগ পড়ে ও গাছের পাতা ঝরে পড়ে। এনথ্রাকনোজ রোগে কান্ডে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এসব রোগ দমনে বীজ শোধন করে নিতে হবে, ক্ষেতের আবর্জনা পোড়াতে হবে ও ছত্রাকনাশক ছিটাতে হবে। মোজাইক রোগে পাতায় হলুদ ও সবুজের ছিটা দাগ পড়ে। রোগমুক্ত এলাকার বীজ বপন করে ও কীটনাশক ছিটিয়ে এ রোগ দমননের চেষ্টা করা হয়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। কান্ড পচা রোগের লক্ষণ কোন্‌টি?
- ক) কান্ড স্থানে স্থানে বাদামি হয় এবং বাকল ফেটে আঁশ বের হয়ে আসে
- খ) কান্ডে কালো ব্যান্ডের ন্যায় দাগ পড়ে এবং বাকল ফেটে আঁশ বের হয়ে আসে
- গ) কান্ডে কালো দাগ হয় এবং বাকল ফেটে ছোবড়ার ন্যায় আঁশ বের হয়ে আসে
- ঘ) কান্ড সম্পূর্ণ কালো হয়ে ভেঙ্গে পড়ে

২। কালো পট্টি রোগ গাছে কখন হয়?
- ক) বীজ অঙ্কুরোদ্গমের সময়
- খ) দু'তিন সপ্তাহ বয়সের গাছে
- গ) পাঁচ ছয় সপ্তাহ বয়সের গাছে
- ঘ) পূর্ণ বয়স্ক গাছে

৩। কালো পট্টি রোগের বৈশিষ্ট্যমূলক লক্ষণ কোন্‌টি?
- ক) কান্ডে কালো কালো ব্যান্ডের আকারে দাগ পড়ে
- খ) কান্ডে হালকা আঁকা বাঁকা বাদামি দাগ পড়ে
- গ) কান্ডে কালো লম্বাকৃতি দাগ পড়ে
- ঘ) কান্ডে স্থানে স্থানে কালো ক্ষতের সৃষ্টি হয়

৪। এনথ্রাকনোজ রোগের লক্ষণ কোন্‌টি?
- ক) কান্ড স্থানে স্থানে কালো হয়ে যায়
- খ) কান্ড স্থানে স্থানে কালো হয়ে ছাল ফেটে যায়
- গ) কান্ডের ছাল ফেটে আঁশ বের হয়ে আসে
- ঘ) কান্ডে কালো ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে ছোবড়ার মতো গুচ্ছাকারে আঁশ বের হয়ে আসে

৫। এনথ্রাকনোজ রোগ দমনকল্পে কী করা উচিত?
- ক) আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে ফেলতে হবে
- খ) সাদা পাট চাষ করতে হবে
- গ) তোষা পাট চাষ করতে হবে
- ঘ) নাইট্রোজেন সার বেশি ব্যবহার করতে হবে

৬। মোজাইক রোগের পাতা কেমন দেখায়?
- ক) পাতার শিরা স্বচ্ছ হয়ে যায়
- খ) পাতা হলদে হয়ে কুঁকড়ে যায়
- গ) পাতায় হলুদ ও সবুজ রঙের ছোপ ছোপ দাগ হয়
- ঘ) পাতায় মরিচা রঙের দাগ পড়ে

পাঠ ২.৫ আখের রোগ



এ পাঠ শেষে আপনি –

- আখের কয়েকটি রোগের জীবাণুর নাম বলতে ও লিখতে পারবেন।
- আখের রোগসমূহের লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রোগের দমন ব্যবস্থা বর্ণনা করতে ও লিখতে পারবেন।



লাল পচা (Red rot)

কারণ ঃ *Colletotrichum falcatum* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়।

লক্ষণ ঃ আক্রান্ত গাছের কচি পাতা প্রথমে ফ্যাকাশে হয়ে আসে। পাতার ধার ও ডগা শুকিয়ে ঢলে পড়ে। কয়েক দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ মাথাটাই শুকিয়ে গাছ মরে যায়। আখ লম্বালম্বিভাবে চিরলে তার মধ্যে সাদা টিস্যুর মাঝে মাঝে লাল দাগ দেখতে পাওয়া যায়। রোগ পুরানো হলে লাল দাগ বাদামি হয়ে যায় এবং সাদা টিস্যু তত স্পষ্ট বোঝা যায় না। রোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে গোটা কান্ডটাই পচে যায় এবং দু গিটের মধ্যবর্তী স্থান কুঁচকে ও ফাঁপা হয়ে যায়। অনেক সময় ফাঁপা স্থানে সাদা সাদা ছত্রাক জন্মাতে দেখা যায় এবং গিটের কাছাকাছি স্থানে ছত্রাকের কালো রঙের এসারভুলাস দেখতে পাওয়া যায়। পাতার মধ্যশিরায় কালচে ধারযুক্ত লম্বা লম্বা লালচে দাগ হয়। চিত্র ২৩ এ আখের লাল পচা রোগে আক্রান্ত আখ গাছ ও এর অংশসমূহ দেখানো হয়েছে।



আখের মধ্যে কোনো লাল দাগ দেখলে তা বীচন হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। বীচন এরোটান-৬ নামক ওষুধে ডুবিয়ে শোধন করে লাগাতে হবে।

চিত্র ২৩ ঃ আখের লালপচা রোগ

বামে- আক্রান্ত গাছ
মাঝে- কান্ড মধ্যস্থিত লাল ও সাদা টিস্যু বিদ্যমান (রোগের প্রাথমিক পর্যায়)
ডানে- লাল টিস্যু বাদামি হয়েছে ও ভেতরে ফাঁপা হয়ে সাদা সাদা ছত্রাক জন্মাতে দেখা যাচ্ছে (রোগের শেষের দিকের পর্যায়)

দমন ঃ আখের মধ্যে কোনো লাল দাগ দেখলে তা বীচন হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। বীচন এরোটান-৬ নামক ওষুধে ডুবিয়ে শোধন করে লাগাতে হবে। আখ কাঁটার পর আক্রান্ত গাছের সমস্ত অংশ সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলতে হবে। ক্ষেতে মাজরা পোকার উপদ্রব হলে ওষুধ ছিটিয়ে দমন করতে হবে। মুড়ি আখ বীচনের জন্য কখনো ব্যবহার করা উচিত নয়। রোগ সহনশীল জাতের আখ (যথা- *ISD*-২/৫৪, *ISD*-৯/৫৭) এবং ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্রের সুপারিশকৃত জাত লাগাতে হবে।

স্মাট (Smut)

কারণ ঃ *Ustilago scitaminea* নামক ছত্রাকের আক্রমণে স্মাট রোগ হয়।



লক্ষণ ঃ আক্রান্ত গাছ বেটে হয় এবং আগার দিক থেকে লম্বা কালো ছড়ির মতো একটি উপাঙ্গ বের হয়ে আসে। প্রথমে উপাঙ্গটি পাতলা, রূপালি-সাদা আবরণ দ্বারা ঢাকা থাকে এবং কয়েক দিনের মধ্যে ফেটে তলা থেকে কালো ধুলোর মতো স্পোর বের হয়ে আসে। এ রকম ছড়ি প্রত্যেকটি মুকুল থেকেও বের হতে পারে। চিত্র ২৪ এ স্মাট রোগে আক্রান্ত আখ গাছ দেখানো হয়েছে।

দমন ঃ ছড়ির আবরণ ফেটে যাওয়ার আগেই গাছ সমূলে তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। আক্রান্ত ক্ষেতে মুড়ি আখের চাষ কখনোই করা উচিত নয়। বীচন আখ এরাটান-৬ দ্বারা শোধন করে লাগাতে হবে।

চিত্র ২৪ ঃ আখের স্মাট রোগ (আগার অংশ কালো চাবুকের মতো)

আখের সাদাপাতা (Sugarcane whiteleaf)

রোগের কারণ ঃ আখের সাদাপাতা নামক রোগটি মাইকোপ্লাজমার আক্রমণে হয়।

রোগের লক্ষণ ঃ আখ গজানোর কিছুদিনের মধ্যে গাছের পাতা সাদাটে হয়ে যায়। চারা গাছ আক্রান্ত হলে বেশিদিন বাঁচে না। গাছের বয়স ৩-৪ মাস হওয়ার পর কুশিগুলো সাদা হয়ে বের হয়। এ সময় অনেক কুশি হয় এবং ঝাড়গুলো ধান গাছের ন্যায় গুচ্ছাকার হয়। এসব গাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ আখ খুব কমই হয়। কুশি বেশি পরিমাণে হলে এবং পাতা খুব সাদা হলে কয়েক মাসের মধ্যেই আখের ঝাড় মরে যায়। অনেক সময় ৬-৭ মাস বয়সের গাছের গোড়া থেকে কিছু কিছু কুশি বের হয় এবং তার পাতা আংশিকভাবে সাদা হয়ে যায়। অনেক সময় পূর্ণাঙ্গ আখের মাথা থেকেও সাদা পাতা বের হতে দেখা যায়। চিত্র ২৫ এ সাদাপাতা রোগে আক্রান্ত আখ দেখানো হয়েছে।

চিত্র ২৫ ঃ আখের সাদাপাতা রোগ

আখের সাদাপাতা আক্রান্ত বীজের মাধ্যমে এ রোগ বিস্তারলাভ করে বিধায় রোগমুক্ত এলাকা থেকে সুস্থ্য সবল প্রত্যায়িত বীজ ব্যবহার করতে হবে।

দমন ঃ আক্রান্ত বীজের মাধ্যমে এ রোগ বিস্তারলাভ করে বিধায় রোগমুক্ত এলাকা থেকে সুস্থ্য সবল প্রত্যায়িত বীজ ব্যবহার করতে হবে। আর্দ্র গরম বাতাসে (৫৪° সে. তাপমাত্রায়) ৪ ঘন্টাকাল বীজকে



রেখে শোধন করে লাগালে রোগ দমন হয়। রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে ঝাড়ের সব গাছ শিকড়সহ তুলে পুড়িয়ে অথবা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। ক্ষেতে পোকা দেখা দিলে ওষুধ ছিটিয়ে দমন করতে হবে।

অনুশীলন (Activity): *আখের কোন্ রোগটি সবচেয়ে মারাত্তক বলে আপনি মনে করেন। কারণসহ রোগটি দমনের উপায়সমূহ লিখুন।*



সারমর্ম ঃ আখের লালপচা, স্মাট ও সাদাপাতা রোগসম হের কারণ, লক্ষণ ও দমন ব্যবস্থা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। লালপচা রোগে কান্ডে সাদা টিস্যুর মধ্যে বৈশিষ্ট্যমূলক লাল রঙের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছোপ ছোপ দাগ পড়ে। স্মাট রোগে গাছের আগার দিক কালো ছড়ির আকার ধারণ করে। সাদাপাতা রোগে কুশি সাদা হয়ে বের হয়ে আসে। রোগ দমনে রোগমুক্ত এলাকার বীচন আখ শোধন করে লাগাতে হবে, মুড়ি আখ কখনো লাগানো যাবে না এবং কীটনাশক স্প্রে করে মাজরা পোকা ধ্বংস করতে হবে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। লালপচা রোগ কোন্ জীবাণু দ্বারা হয়?
- ক) *Colletotrichum falcatum*
- খ) *Colletotrichum corchorum*
- গ) *Colletotrichum capsici*
- ঘ) *Colletotrichum dematium*

২। লালপচা রোগের প্রাথমিক লক্ষণ কোন্টি?
- ক) কচি পাতা লালচে হয়ে যায়
- খ) কচি পাতা ঈষৎ হলদে হয়ে যায়
- গ) কচি পাতার শিরা বাদামি হয়ে যায়
- ঘ) কচি পাতা ফ্যাকাশে হয়ে যায়

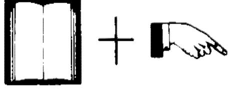
৩। রোগাক্রান্ত আখের ভিতরটা কেমন দেখায়?
- ক) ফ্যাকাশে দেখায়
- খ) কালো দেখায়
- গ) বাদামি দেখায়
- ঘ) সাদা টিস্যুর মধ্যে লাল রঙের ছোপ ছোপ দাগ দেখায়

৪। লালপচা রোগ দমনার্থে কোন্ ওষুধ দিয়ে বীচন শোধন করতে হয়?
- ক) কুপ্রাভিট
- খ) ডায়থেন এম-৪৫
- গ) রোভরাল
- ঘ) এরাটান-৬

৫। স্মাট রোগের বৈশিষ্ট্য কোন্টি?
- ক) গাছের অগ্রভাগ দিয়ে কালো ছড়ির আকারে একটি উপাঙ্গ বের হয়
- খ) গাছের অগ্রভাগে অনেক পাতা গুচ্ছাকারে হয়
- গ) গাছের অগ্রভাগের পাতা ঢলে পড়ে
- ঘ) গাছের অগ্রভাগের পাতায় মরিচা রঙের দাগ পড়ে

৬। স্মাট রোগ দমনার্থে কী করতে হবে?
- ক) ক্ষেতের মাটি পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে
- খ) ক্ষেতে বেশি পরিমাণে সার প্রয়োগ করতে হবে
- গ) কালে ছড়ির মতো উপাঙ্গটি ফেটে যাওয়ার আগেই কেটে নষ্ট করে ফেলতে হবে
- ঘ) রোগ দেখা দিলে কীটনাশক স্প্রে করতে হবে

পাঠ ২.৬ তুলার রোগ



এ পাঠ শেষে আপনি –

- তূলা গাছের দুটি রোগের কারণ বলতে ও লিখতে পারবেন।
- রোগ দুটির লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রোগের দমনের কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে তা বলতে ও লিখতে পারবেন।



ঢলে পড়া (Wilt)

কারণ ঃ *Fusarium oxysporum* f. sp. *vasinfectum* নামক ছত্রাকের দ্বারা তূলার ঢলে পড়া রোগ হয়। এটি একটি মারাত্তক রোগ।

Fusarium oxysporum f. sp. *vasinfectum* নামক ছত্রাকের দ্বারা তূলার ঢলে পড়া রোগ হয়।



লক্ষণ ঃ চারা ও বড় উভয় গাছেই এ রোগ হতে পারে। চারা গাছে প্রথমে পাতার শিরাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরে শিরার মধ্যস্থিত অঞ্চলে পচন দেখা দেয় এবং শস্ক পত্র হলুদ বা বাদামি হয়ে শুকিয়ে যেতে থাকে। পাতার বোঁটার চারদিকে কালো আংটির মতো দাগ পড়ে। আক্রান্ত চারা অবশেষে মরে যায়। বড় গাছের ছোট ছোট ডাল ঢলে পড়ে, পাতা খসে পড়ে এবং ক্ষেতে পাতাবিহীন কান্ডটি দাঁড়িয়ে থাকে। কান্ডের শিকড়ের দিকটা অনেক ক্ষেত্রে কালো হয়ে যায়। গাছ বেঁটে হয়। কান্ড ও শিকড়ের রসসঞ্চালন নালিতে বাদামি রঙের আঁচড় কাঁটার মতো দাগ পড়ে। রসসঞ্চালন নালিতে দাগ হওয়া এ রোগের বৈশিষ্ট্য। পাতা ঝরে পড়লে এ দাগ বেশ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। রস সঞ্চালন নালি টাইলোসিস দ্বারা আংশিকভাবে বন্ধ থাকতে দেখা যায়। এছাড়া নালির মধ্যে এক প্রকার আঁঠালো পদার্থ জমে। নালি এসবের দ্বারা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পানি চলাচলে ব্যাঘাৎ ঘটে।

চিত্র ২৬ ঃ তূলা গাছের ঢলে পড়া রোগ
বামে- গাছের পাতা ও ডাল ঢলে পড়ার প্রাথমিক পর্যায়
ডানে- কান্ডের রসসঞ্চালন নালির বাদামি রঙ ধারণ

ফলে পানির অভাবে পাতা ও গাছ ঢলে পড়ে। চিত্র ২৬ এ ঢলে পড়া রোগে আক্রান্ত তূলা গাছ দেখানো হয়েছে।

ঢলে পড়া রোগ দমনের জন্য ফসলের পরিত্যক্ত অংশসমূহ সমূলে ধ্বংস করতে হবে।

দমন ঃ ফসলের পরিত্যক্ত অংশসমূহ সমূলে ধ্বংস করতে হবে। রোগসহনশীল জাতের তূলার (যথা- উর্বান-৫৬) চাষ করতে হবে। এছাড়া বাংলাদেশ তূলা উন্নয়ন বোর্ডের সুপারিশকৃত জাতের তূলার চাষ করা উচিত। জমিতে কৃমি থাকলে এ রোগ বেশি হয় বিধায় গাছ লাগানোর আগে কৃমিনাশক ব্যবহার করে কৃমি দমনের ব্যবস্থা করতে হয়।

গোড়া পচা (Foot rot)

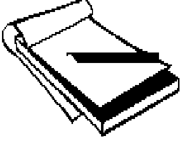
কারণ ঃ *Rhizoctonia solani* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়।



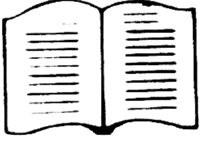
লক্ষণ ঃ চারা ও বড় উভয় গাছে এ রোগ হতে পারে। আক্রান্ত কান্ডকে মাটি থেকে উপরে ওঠানোর পর মরিচার মতো লালচে দেখায়। রোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে রঙ গাঢ় হয়ে উপর ও নিচের দিকে বেশ কয়েক সেন্টিমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। কান্ড দাগ দিয়ে ঘিরে গেলে চারা মরে যায়। বড় গাছের মোটা শিকড়ে স্থানে স্থানে ছাল পচে যায়। সরু সরু শিকড় সম্পূর্ণরূপে পচে যায়। পচা স্থানের কিছু উপরের দিক থেকে এক প্রকার হলদে পদার্থ বের হতে দেখা যায়। কান্ডের রসসঞ্চালন নালিকে বাদামি মনে হয়। রোগটি শণাক্তকরণের জন্য এটি একটি আদর্শ লক্ষণ। চিত্র ২৭ এ গোড়া পচা রোগে আক্রান্ত তুলার চারা গাছ দেখানো হয়েছে।

দমন ঃ মাটির উষ্ণতা ৩৫$^{\circ}$ সেন্টিগ্রেডের বেশি হলে ও বেলে মাটিতে এ রোগ বেশি হয়। এজন্য তূলা চাষ করতে হয়। তূলার সঙ্গে মথ বীন চাষ করে এ রোগ কমানো হয়।

চিত্র ২৭ ঃ তূলার চারা গাছের গোড়া পচা রোগ (গাছের গোড়ার দিকে মরিচা রঙের দাগ সৃষ্টি)



***অনুশীলন (Activity)ঃ** তূলার ঢলে পড়া ও গোড়া পচা রোগের মধ্যকার পার্থক্য লিখুন।*



সারমর্ম ঃ এ পাঠে তূলা গাছের ঢলে পড়া ও গোড়া পচা রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ঢলে পড়া রোগে গাছের ডালপালা ঢলে পড়ে ও কান্ডের রসসঞ্চালন নালির বাদামি রঙ ধারণ করে। গোড়াপচা রোগে গাছের গোড়ার দিকে মরিচা রঙের দাগ উৎপন্ন হয়। ক্ষেতের আবর্জনা পুড়িয়ে ও রোগ প্রতিরোধী জাতের তুলার চাষ করে ঢলে পড়া রোগ দমন করতে হয়। গোড়াপচা রোগ দমনে চাষের সময় এগিয়ে অথবা পিছিয়ে ও তূলার সঙ্গে মথ বীন চাষ করে ক্ষতির পরিমাণ কমানোর চেষ্টা করা হয়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। ঢলে পড়া রোগের বৈশিষ্ট্য কোন্‌টি?
- ক) রসসঞ্চালন নালিতে কালো দাগ পড়ে
- খ) রসসঞ্চালন নালিতে হলুদ দাগ পড়ে
- গ) রসসঞ্চালন নালিতে বেগুনি দাগ পড়ে
- ঘ) রসসঞ্চালন নালিতে বাদামি আঁচড় কাঁটার মতো দাগ হয়

২। ঢলে পড়া রোগ দমনের ব্যবস্থা কোন্‌টি?
- ক) রোগসহনশীল জাতের চাষ করতে হবে
- খ) ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে
- গ) জমিতে অধিক পরিমাণে NPK সার প্রয়োগ করতে হবে
- ঘ) ঘন ঘন পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে

৩। গোড়া পচা রোগে আক্রান্ত স্থানের উপর থেকে কী রঙের পদার্থ বের হতে দেখা যায়?
- ক) হলদে রঙের
- খ) কালচে রঙের
- গ) বাদামি রঙের
- ঘ) লালচে রঙের

৪। গোড়া পচা রোগের দরুন রসসঞ্চালন নালি কেমন দেখায়?
- ক) কালো
- খ) বাদামি
- গ) হলুদ
- ঘ) লাল

৫। গোড়া পচা রোগের জীবাণু কোন্‌টি?
- ক) *Macrophomina phaseolina*
- খ) *Sclerotium rolfsii*
- গ) *Pythium debaryanum*
- ঘ) *Rhizoctonia solani*

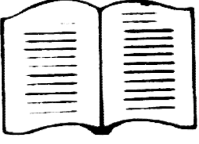
ব্যবহারিক

পাঠ ২.৭ ধান, পাট, আখের নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ



এ পাঠ শেষে আপনি –

- গাছের নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্য কী তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- ধান, পাট ও আখের রোগাক্রান্ত নমুনা সংগ্রহ করতে পারবেন।
- সংগৃহীত নমুনা কীভাবে শুকাতে হয় তা বলতে ও দেখাতে পারবেন।
- রোগাক্রান্ত নমুনা ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করতে পারবেন।



নমুনা সংগ্রহের উদ্দেশ্য

- সংরক্ষিত নমুনা ভবিষ্যতে পর্যবেক্ষণ করে রোগ শণাক্ত করা সহজতর হয়।
- ব্যবহারিক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের জন্য সংরক্ষিত নমুনা অত্যন্ত কাজে লাগে। এ কারণে বিশ্বের বহুদেশে গাছগাছড়া ও রোগাক্রান্ত গাছের নমুনার যাদুঘর (Plant and Disease Herbarium Museum) প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি

উপরকরণ ঃ মাটি খোড়ার যন্ত্র , একটি ছোট করাত, একটি ডাল ছাঁটার কাচি, নমুনা সংগ্রহের আধার বা ভাসকুলাম, পলিথিন ব্যাগ, বহনযোগ্য হালকা ফিল্ড প্রেস, খাতা, পেন্সিল, লেবেল, সুতা ইত্যদি।

কাজের ধাপ

- নমুনা সংগ্রহ সর্বদা আদর্শ লক্ষণযুক্ত নমুনা বাছাই করুন। আদর্শ নমুনাতে নির্দিষ্ট রোগের লক্ষণ ছাড়া অন্য কোনো রোগের কোনো লক্ষণ থাকবে না ও পোকামাকড় আক্রমণ জনিত কোনো ক্ষত থাকবে না। সংগ্রহের সময় একাধিক নমুনা সংগ্রহ করুন। সর্বদা সদ্য আক্রান্ত আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত গাছ বা গাছের অংশ থেকে নমুনা সংগ্রহ করুন। সম্ভব হলে রোগ দেখা দেয়ার পর হতে গাছ মরা পর্যন্ত উহাতে যে বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায় তা বুঝানোর জন্য রোগের বিভিন্ন পর্যায়ের নমুনা সংগ্রহ করুন। নমুনা ছোট হলে সম্পূর্ণ গাছ (যথা- ধান গাছ) এবং বড় হলে গাছের অংশ বিশেষ (যথা- পাট ও আখের ক্ষেত্রে) সংগ্রহ করুন। সম্পর্ণরূপে মরা গাছ বা মরা অংশ নমুনার জন্য কখনো সংগ্রহ করবেন না। সম্ভব হলে আক্রান্ত গাছের শিকড়, কান্ড, পাতা, ফুল, ফল ও বীজ সংগ্রহ করুন। সুস্থ গাছের সঙ্গে রোগাক্রান্ত গাছের তুলনা করার জন্য আক্রান্ত গাছের সঙ্গে সব সময় সুস্থ গাছেরও একটি নমুনা সংগ্রহ করুন।
- নমুনা সংগ্রহের সময় গাছের প্রকৃতি, রঙ, প্রচলিত নাম, সংগ্রহের তারিখ, স্থান প্রভৃতির বিস্তারিত বিবরণ নোট খাতায় লিখুন।
- সংগ্রহের পর নমুনা পলিথিন ব্যাগ, ভাসকুলাম বা হলকা প্রেসের মধ্যে রেখে গবেষণাগারে নিয়ে আসুন।

নমুনা সংরক্ষণ পদ্ধতি

(১) শুকনো অবস্থায় নমুনা সংরক্ষণ

উপকরণ ঃ একটি ভারি ও মজবুত প্রেস, চোষ কাগজ বা খবরের কাগজ, হারবেরিয়াম শিট বা নমুনা স্থাপন কাগজ, কাগজের ছোট বাক্স, আঁঠা, গাম টেপ, তুঁতে বা মারকিউরিক ক্লোরাইড, লেবেল, কলম, সুতা ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

- প্রথমে একটি চোষ কাগজে একটি নমুনা রাখুন এবং তার উপর আর একটি কাগজ স্থাপন করুন। এ কাগজের ওপর আবার একটি নমুনা রাখুন ও আগের মতো তার উপরে আর একটি কাগজ স্থাপন করুন। এভাবে একটি নমুনা ও তার উপরে একটি করে কাগজ স্থাপন করে নমুনার একটি গাদা (stack) তৈরি করুন। তারপর নমুনার গাদাটিকে একটি ভারি প্রেসের দুডালার মধ্যে রেখে যথাসম্ভব জোরে চাপ দিয়ে প্রেসের ফিতা টেনে অথবা স্ক্রু ঘুরিয়ে আটকান। প্রেস না থাকলে বিছানার তোষকের নিচে সমান স্থানে একেকটি নমুনা একেকটি খবরের কাগজের দুভাজের মধ্যে ফাঁক ফাঁক করে স্থাপন করে রাখতে পারেন।
- প্রেসের মধ্যে ২৪ ঘন্টা রাখার পর নমুনাগুলো বের করে স্থান পরিবর্তন করে অথবা নতুন কাগজে রেখে আগের মতো একটির পর একটি সাজিয়ে রাখুন। বিছানার নিচের নমুনাকেও নতুন কাগজে অথবা আগের কাগজে স্থান বদলিয়ে স্থাপন করে রাখুন। প্রেসে অথবা বিছানার নিচে ২৪ ঘন্টা নমুনা থাকলে চোষ কাগজ নমুনা থেকে কিছু রস চুষে নেয়। ফলে নমুনার বিভিন্ন অংশ মোলায়েম হয়ে যায়। ভালো নমুনা করার জন্য এ সময়ই নমুনার বিভিন্ন অংশ সুবিধামতো বাকিয়ে নতুন কাগজে স্থাপন করা হয়।
- নতুন কাগজে স্থাপনের পর নমুনাগুলোকে আগের মতো সাজিয়ে প্রেসের ডালা আবার সজোরে এঁটে শুকনো বাতাসে ২৪-৩৬ ঘন্টা রাখুন। এ সময় নমুনার বিভিন্ন অংশ স্থাপনের মধ্যে কোনো ত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করুন। এভাবে কয়েকবার কাগজ বদলিয়ে নমুনা ভালোভাবে শুকিয়ে ফেলুন।
- বর্ষাকালে নমুনার গাদায় চোষ কাগজের মাঝে মাঝে ঢেউ খেলানো কাগজের খন্ড (Corrugated sheet) স্থাপন করে নমুনার গাদাটি রোদে অথবা কৃত্রিম গরম বাতাসে রাখুন (ঢেউ খেলানো কাগজ ব্যবহার করলে ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে বাতাস সহজে চলাচল করতে পারে এবং তাতে নমুনা শুকানোর কাজ ত্বরান্বিত হয়)।
- শুকানোর পর নমুনা হারবেরিয়াম শিটে স্থাপন করুন অথবা কাগজের তৈরি ছোট ছোট বাক্সের মধ্যে রাখুন।
- নমুনা স্থাপনের জন্য ২৯ × ৪২ সে.মি. সাইজের হারবেরিয়াম শিট ব্যবহার করুন। শিটে নমুনা আটকানোর জন্য আঁঠা, গাম টেপ, সুতা প্রভৃতি ব্যবহার করুন। আঁঠা লাগানোর জন্য প্রথম একটি গ্লাস শিটের উপর পাতলা করে আঁঠা লাগান এবং তার উপর নমুনাকে কিছু উপর থেকে হালকাভাবে ফেলুন। এর ফলে নমুনার নিচের দিকে আঁঠা লেগে যাবে ও পরে হারবেরিয়াম শিটে রাখলে আটকে যাবে। আঁঠা লাগানো অবস্থায় সিটে স্থাপন করার পর নমুনা কখনো নাড়াচাড়া করবেন না। কারণ, তাতে নমুনার নিচের আঁঠা শিটের বিভিন্ন স্থানে লেগে শিটকে নষ্ট করে ফেলবে।
- নমুনা সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় তথ্য সকলের অবগতির জন্য তার পাশে শিটের এক কোনায় নমুনার সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ একটি লেবেল লাগান। লেবেল এভাবে লিখতে পারেন –

প্রতিষ্ঠান- সংগ্রহ নম্বর-
রোগের নাম-
পোষকের নাম-
পরজীবী-
প্রাপ্তিস্থান-

স্থানীয় অবস্থা-
অনুসন্ধানকারী-
তারিখ-

প্রায়ই কীট ও মাইট হারবেরিয়ামের নমুনা নষ্ট করে ফেলে। এদের আক্রমণ থেকে নমুনাকে রক্ষা করার জন্য আঁঠাতে তুঁতে বা মারকিউরিক ক্লোরাইড (১ঃ১০০০) মিশিয়ে নেবেন।

- প্রায়ই কীট ও মাইট হারবেরিয়ামের নমুনা নষ্ট করে ফেলে। এদের আক্রমণ থেকে নমুনা রক্ষা করার জন্য আঁঠাতে তুঁতে বা মারকিউরিক ক্লোরাইড (১ঃ১০০০) মিশিয়ে নেবেন। এছাড়া ছোট ছোট কাপড়ের থলেতে কীট বিতাড়ক প্যারাডাইক্লোরো বেনজিন নিয়ে নমুনার বাক্সে রাখতে পারেন।
- অনেক সময় নমুনা হারবেরিয়াম শিটে ও বাক্সে না রেখে ফরমালিন ও এলকোহলের দ্রবণে ভিজা

  অবস্থায় রাখা হয়। এর জন্য এক গ্রাম জিলেটিন, ৭ গ্রাম গি-াসারিন, ৬ মি.লি. পানি এবং ০.১৪ গ্রাম ফিনল মিশিয়ে গ্লিসারিনজেলি প্রস্তুত করুন। প্রথম জিলেটিনকে কয়েক ঘন্টা ভিজিয়ে গরম করে গলিয়ে ফেলুন এবং তার মধ্যে গ্লিসারিন, ফিনল ও পানি মিশান। পরে একটি কাঁচের শিটে গরম গ্লিসারিনজেলি পাতলা করে লাগান ও তার উপর নমুনা রেখে একটু চাপ দিন। কাঁচের শিট সহ নমুনা কাঁচের আধারে ফরমালিনে ডুবিয়ে রাখুন। গ্লিসারিনজেলি ফরমালিনে রাখলে শক্ত হয়ে কাঁচের শিটে নমুনাকে আটকে রাখে।

  ফরমালিননের পরিবর্তে এলকোহল ব্যবহার করলে প্রথমে গ্লু ও টারপেন্টাইন মিশিয়ে সিমেন্টের ন্যায় এক প্রকার আঁঠা তৈরি করুন। প্রথম ১১৫ গ্রাম শক্ত গ্লুকে টুকরো টুকরো করুন ও একরাত ভিজিয়ে রাখুন। পরে গ্লকে গরম করে গলিয়ে তার মধ্যে এক চামচ টারপেন্টাইন যোগ করুন

  এবং গরম করে নাড়তে থাকুন যতক্ষণ পর্যন্ত সাদা আঁঠা তৈরি না হয়। একটি শুকনো কাঁচের শিটে এ আঁঠা লাগান ও তার উপর নমুনা রেখে চাপ দিন। সবশেষে নমুনাসহ কাঁচের শিটটি নমুনা সংরক্ষণের আঁধারে এলকোহলে (৭০%) ডুবিয়ে রাখুন। এলকোহলে ডুবানোর সাথে সাথেই আঁঠা খুব শক্ত হয়ে নমুনাকে কাঁচের শিটে আটকিয়ে ফেলে।
- নমুনা রেখে আঁধারের মুখের ঢাকনি আঁঠা দিয়ে আটকে দিন। এ আঁঠা তৈরির জন্য ৩০ গ্রাম জিলেটিন কয়েক ঘন্টা ভিজানোর পর গরম করে গলিয়ে ফেলুন এবং এর মধ্যে আনুমানিক ৭ গ্রাম টুকরো টুকরো মোম যোগ করুন ও নেড়ে জিলেটিনের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলুন। তারপর গরম মোমমিশ্রিত জিলেটিন আঁধারের মুখে লাগিয়ে ঢাকনিটি চাপ দিয়ে বসিয়ে দিন। ঢাকনির কোথাও ফাঁক দেখলে সেখানে গরম মোমমিশ্রিত জিলেটিনের প্রলেপ দিয়ে দিন।
- সবশেষে নমুনার প্রয়োজনীয় বিবরণসহ একটি লেবেল আঁধারের গায়ে আঁঠা দিয়ে লাগিয়ে দিন।

(২) ভিজে অবস্থার নমুনা সংরক্ষণ

উপকরণ ঃ নমুনা, কাঁচের আধার, ফরমালিন (৪০%), এলকোহল (৭০%), মাপন যন্ত্র , জিলেটিন, মোম, লেবেল, আঁঠা, সুতা, কলম ইত্যাদি।

ক. সাধারণ পদ্ধতি

কাজের ধাপ

- নমুনা সংগ্রহের পর পানি দিয়ে উহার উপরের ময়লা ভালো করে পরিষ্কার করুন।
- ফরমালিন পানিতে মিশিয়ে ৪% দ্রবণ তৈরি করুন অথবা এলকোহল ও ফরমালিন যথাক্রমে ১০০ঃ৬ অনুপাতে মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি করুন।
- একটি নমুনা সংরক্ষণের কাঁচের আধারে প্রয়োজনমতো দ্রবণ নিয়ে তার মধ্যে নমুনা ডুবিয়ে রাখুন।
- পরে আঁধারের মুখে ঢাকনি রেখে আঁঠা দিয়ে আটকিয়ে দিন। এর জন্য প্রথমে একটি পাত্রে ৩০ গ্রাম জিলেটিন কয়েক ঘন্টা ভিজান। পরে অতিরিক্ত পানি ঢেলে ফেলে গরম করে জিলেটিনকে

গলিয়ে ফেলুন। গলিত জিলেটিনের মধ্যে আনুমানিক ৭ গ্রাম মোম টুকরো টুকরো করে যোগ করুন এবং গরম করার সাথে সাথে নেড়ে জিলেটিনের সাথে মিশিয়ে ফেলুন।

- মোমমিশ্রিত জিলেটিন গরম থাকা অবস্থায় কাঁচের আঁধারের মুখে চতুপার্শ্ব দিয়ে লাগান এবং সাথে সাথে ঢাকনিটি উহার উপর একটু চাপ দিয়ে আটকিয়ে দিন।
- ঢাকনির কোনো স্থানে কিছু ফাঁক থাকলে সেখানে গরম মোমমিশ্রিত জিলেটিনের একটা প্রলেপ দিয়ে দিন।
- সবশেষে একটি লেবেলে নমুনার স্থানীয় নাম, বৈজ্ঞানিক নাম, সংগ্রহকারীর নাম, রোগ অনুন্ধানকারীর নাম, রোগ ও উহার জীবাণুর নাম, সংগ্রহের তারিখ ইত্যাদি লিখে আঁঠা মাখিয়ে পাত্রের গায়ে লাগিয়ে দিন।

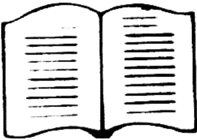
খ. সবুজ রঙ স্থায়িকরণ পদ্ধতি

ফরমালিন ও এলকোহলে নমুনা রাখলে ধীরে ধীরে উহার রঙ বিলীন হয়ে যায়। এজন্য ধান, পাট ও আখ গাছের পাতার সবুজ রঙ ধরে রাখার জন্য বিশেষ দ্রবণ ব্যবহার করা হয়।

উপকরণ ঃ নমুনা, কপার অ্যাসিটেট, অ্যাসিটিক এসিড (৫০%), ফরমালিন (৪০%), বিকার, নমুনা সংরক্ষণের কাঁচের আধার, জিলেটিন, মোম, লেবেল, আঁঠা, কলম ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

- আদর্শ নমুনা পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতিতে সংগ্রহ করুন।
- একটি বিকারে অ্যাসিটিক এসিড নিয়ে তার মধ্যে ধীরে ধীরে কপার অ্যাসিটেট যোগ করতে থাকুন এবং নেড়ে দ্রবীভূত করে অতি সম্পৃক্ত দ্রবণ প্রস্তুত করুন।
- দ্রবণের কিছুটা একটি বিকারে নিয়ে এর সঙ্গে ৩-৪ গুণ পানি মিশান ও খোলামেলা স্থানে গরম করুন।
- দ্রবণ ফুটতে আরম্ভ করলে তার মধ্যে নমুনা ডুবিয়ে দিন এবং লক্ষ্য করুন যে, কিছুক্ষণের মধ্যে নমুনা তার সবুজ রঙ হারিয়ে সাদা হয়ে গেছে। আরও কয়েক মিনিট পরে দেখবেন যে, নমুনা পুণরায় সবুজ রঙ ফিরে পেয়েছে।
- দ্রবণে নমুনা আধা ঘন্টা রেখে পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলুন।
- নমুনা সংরক্ষণের আঁধারে ৪% ফরমালিন দ্রবণ নিয়ে তার মধ্যে নমুনাটি ডুবিয়ে রাখুন।
- পরে সাধারণ পদ্ধতির ন্যায় জিলেটিন ও মোম দ্বারা তৈরি আঁঠা দিয়ে আধারের ঢাকনি লাগিয়ে দিন ও প্রয়োজনীয় তথ্যসহ পাত্রের গায়ে লেবেল লাগান।



সারমর্ম ঃ সংরক্ষণের জন্য রোগাক্রান্ত গাছের নমুনা কেমন হওয়া উচিত, কখন এটি সংগ্রহ করতে হবে, কীভাবে শুকাতে হবে, কীভাবে নমুনাকে শিটে আটকাতে হবে, নমুনার সবুজর রঙ কীভাবে স্থায়ী করতে হবে ইত্যাদির বিবরণ অনুশীলনের জন্য দেয়া হয়েছে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৭

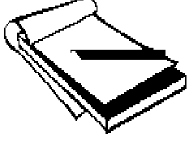
সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। সংরক্ষণের জন্য রোগাক্রান্ত গাছের নমুনা কখন সংগ্রহ করা উচিত?
- ক) রোগ শুরু হওয়ার সময়
- খ) রোগের চরম অবস্থায়
- গ) গাছ মরার পরপর
- ঘ) রোগের বিভিন্ন অবস্থায়

২। শুকনো অবস্থায় সংরক্ষণের নমুনা কীভাবে শুকাতে হয়?
- ক) বাহিরে রোদে ছড়িয়ে রেখে
- খ) ঘরে টেবিলের উপর ঠান্ডায় ছড়িয়ে রেখে
- গ) চোষ কাগজে বা খবরের কাগজের মধ্যে চাপ দিয়ে রেখে
- ঘ) গরম বাতাসে ছড়িয়ে রেখে

৩। কীট ও মাইটের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য হারবেরিয়ামের নমুনাকে আটকানোর আঁঠাতে কী ব্যবহার করা হয়?
- ক) তুঁতে বা মারকিউরিক ক্লোরাইড
- খ) জিঙ্ক ক্লোরাইড
- গ) সোডিয়াম ক্লোরাইড
- ঘ) পটাশিয়াম ক্লোরাইড

৪। নমুনার সবুজ রঙ স্থায়িকরণের জন্য তাকে কোন্ দ্রবণে সংরক্ষণ করা হয়?
- ক) হেসলারস দ্রবণে
- খ) কপার অ্যাসিটেট ও অ্যাসিটিক এসিডের অতি সম্পৃক্ত দ্রবণে
- গ) মারকিউরিক ক্লোরাইড দ্রবণে
- ঘ) ফরমালিনের দ্রবণে



চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ২

১। ধানের ব্লাস্ট রোগের লক্ষণ বর্ণনা করুন।
২। ধানের দুটি ছত্রাক, একটি ব্যাকটেরিয়া ও একটি নেমাটোডজনিত রোগের জীবাণু ও কৃমির নাম লিখুন।
৩। পাটের এনথ্রাকনোজ রোগের বৈশিষ্ট্য লিখুন।
৪। আখের লাল পচা রোগের লক্ষণ বর্ণনা করুন।
৫। ধানের টুংরো রোগের কারণ কী ও এর দমন পদ্ধতি উল্লেখ করুন।
৬। তূলার ঢলে পড়া রোগের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
৭। ধানের ব্যাকটেরিয়াল লিফ ব্লাইট ও লিফ স্ট্রিক রোগের মধ্যে পার্থক্যসমূহ বর্ণনা করুন।
৮। আখের লালপচা রোগের দমন পদ্ধতি লিখুন।



উত্তরমালা - ইউনিট ২

পাঠ ২.১
১। ঘ ২। গ ৩। ঘ ৪। ঘ

পাঠ ২.২
১। গ ২। গ ৩। ক ৪। গ

পাঠ ২.৩
১। খ ২। ক ৩। ক ৪। ক ৫। ক ৬। গ

পাঠ ২.৪
১। ক ২। ঘ ৩। ক ৪। ঘ ৫। গ ৬। গ

পাঠ ২.৫
১। ক ২। ঘ ৩। ঘ ৪। ঘ ৫। ক ৬। গ

পাঠ ২.৬
১। ঘ ২। ক ৩। ক ৪। খ ৫। ঘ

পাঠ ২.৭
১। ঘ ২। গ ৩। ক ৪। খ

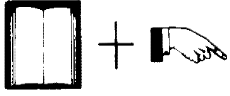
ইউনিট ৩
তৈল ও ডাল ফসলের
রোগ ও প্রতিকার

ইউনিট ৩ তৈল ও ডাল ফসলের রোগ ও প্রতিকার

ভোজ্য তেল ও ডালের জন্য আমাদের দেশে বিভিন্ন ফসলের চাষ হয়। তেলের জন্য সরিষা, বাদাম, সয়াবিন প্রভৃতি অন্যতম। ডাল ফসলের মধ্যে মসুর, মুগ, ছোলা, মাসকলাই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে ভোজ্য তেলের ব্যবহার অনেক বেড়ে যাওয়ার ফলে কৃষকদের মধ্যে তেল উৎপাদনকারী ফসলের প্রতি উৎসাহ বেড়েছে। ডাল প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য হওয়ায় মানুষের খাদ্যতালিকায় এদেরও গুরুত্ব বেড়েছে। কিন্তু এ ফসলগুলো বেশকিছু রোগে আক্রান্ত হয়ে ফলন কমিয়ে দেয়। স্বভাবতই রোগের প্রকোপ কমিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা উচিত।

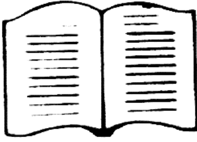
এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে সরিষা, বাদাম, তিল, সূর্যমুখী, সয়াবিন ও ডাল ফসলের বিভিন্ন রোগ বিস্তারিতভাবে তাত্ত্বিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৩.১ সরিষার রোগ



এ পাঠ শেষে আপনি –

- সরিষার কয়েকটি রোগের জীবাণুর নাম বলতে ও লিখতে পারবেন।
- রোগের লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রোগের দমন পদ্ধতি বলতে ও লিখতে পারবেন।



অলটারনেরিয়া ব্লাইট (Alternaria blight)

কারণ ঃ *Alternaria brassicicola* এবং *Alternaria brassicae* নামক দুটি ছত্রাকের আক্রমণে অলটারনেরিয়া ব্লাইট রোগ হয়।

পাতায় কালচে চক্রাকার দাগ হওয়া অলটারনেরিয়া ব্লাইটের একটি বৈশিষ্ট্যমূলক লক্ষণ।

লক্ষণ ঃ *A. brassicicola* পাতায় ছোট ছোট গোলাকার (১ সি.মি. ব্যাসযুক্ত) ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কালচে দাগ উৎপন্ন করে। সাধারণত নিচের বয়স্ক পাতায় এ দাগ প্রথম দেখা দেয়। ক্রমে অন্যান্য পাতায় এ



চিত্র ২৮ ঃ সরিষার অলটারনেরিয়া ব্লাইট রোগ

বামে- আক্রান্ত পাতা

ডানে- আক্রান্ত ফল

রোগ দেখা দিতে থাকে। আর্দ্র আবহাওয়ায় এক কেন্দ্রযুক্ত বৃত্তাকার কালো পাউডারযুক্ত দাগ উৎপন্ন হয়। চক্রাকার দাগ হওয়া এ রোগের একটি বৈশিষ্ট্য। *Alternaria brassicae* দ্বারা উৎপন্ন দাগ হালকা রঙের ও লম্বাটে ধরনের হয়। একাধিক দাগ একত্রে মিশে পাতার অনেক অংশ নষ্ট করে ফেলতে পারে। এ অবস্থায় পাতা হলদে হয়ে মাটিতে ঝরে পড়ে। সরিষার ফলেও ছোট ছোট বৃত্তাকার কালচে দাগ উৎপন্ন হয়। চিত্র ২৮ এ সরিষার অলটারনেরিয়া ব্লাইট রোগে আক্রান্ত গাছে পাতা ও ফল দেখানো হয়েছে।

দমন ঃ অলটারনেরিয়া ব্লাইট রোগটি বীজবাহিত। সেজন্য যথাসম্ভব রোগমুক্ত এলাকা থেকে বীজ সংগ্রহ করে বপনের পূর্বে ৫০° সে. তাপযুক্ত গরম পানিতে ৩০ মিনিট ডুবিয়ে নিতে হয়। ভিজানো বীজ তারের জালের উপর শুকিয়ে বপন করতে হয়। শুকানোর আগে বীজের সঙ্গে হোমাই বা ক্যাপ্টান নামক বীজশোধক ওষুধ (চা চামচের এক চামচের সঙ্গে ৪৫ গ্রাম বীজ) মিশিয়ে নিলে ভালো ফল পাওয়া যায়। মাঠে রোগ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে ডায়থেন এম-৪৫ (৯৫ গ্রাম ওষুধ ও ৪৬ লিটার পানি) গাছে ৮-১০ দিন পর পর কয়েকবার ছিটাতে হয়।

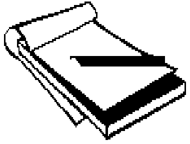
ডাউনি মিলডিউ (Downy mildew)

কারণ ঃ *Peronospora parasitica* এবং *P. brassicae* ছত্রাকদ্বয়ের আক্রমণে এ রোগ হয়।

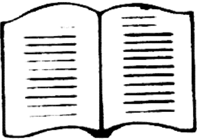
ডাইনি মিলডিউ রোগে পাতার উপরে বিভিন্ন আকৃতির হলদে রঙের দাগ হয়।

লক্ষণ ঃ এ রোগ সাধারণত চারাগাছে হয়। পাতার উপরে বিভিন্ন আকৃতির হলদে রঙের দাগের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে রোগের সূচনা হয়। পরে পাতার উল্টা দিকে দাগের নিচে বেগুনি রঙের ছত্রাক জন্মাতে দেখা যায়। ক্রমশঃ দাগ সংখ্যা ও আকারে বাড়তে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত পাতা মরে যায়। পাতা থেকে কান্ডে রোগ ছড়ালে ফুলের কাছে কান্ড চ্যাপ্টা হয়ে বেঁকে যায়। আক্রান্ত ফুলের বৃতি, দলমন্ডল ও পুংকেশর কুঁচকে যায়।

দমন ঃ ফসলের পরিত্যক্ত অংশ গভীর চাষ দিয়ে ধ্বংস করতে হবে। সরিষাজাতীয় আগাছাও নষ্ট করতে হবে। অলটানেরিয়া ব্লাইট রোগের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতিতে বীজ শোধন করে বপন করতে হয়। গাঢ় কুয়াশা ও গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির সময় ছত্রাকনাশক ছিটানো একান্ত দরকার।



***অনুশীলন (Activity):** চিহ্নিত চিত্রসহ অলটারনেরিয়া ব্লাইট রোগের লক্ষণ ও ফসলের জমিতে এ রোগ দেখা দিলে কীভাবে তা দমন করা হয় লিখুন।*



সারমর্ম ঃ সরিষার অলটারনেরিয়া ব্লাইট ও ডাউনি মিলডিউ রোগের বর্ণনা এখানে দেয়া হয়েছে। পাতায় কালচে চক্রাকার দাগ হওয়া অলটারনেরিয়া ব্লাইটের একটি বৈশিষ্ট্যমূলক লক্ষণ। ডাউনি মিলডিউ রোগে পাতার উপরে হলদে রঙের দাগ হয় ও ঐ দাগের নিচের দিকে বেগুনি রঙের ছত্রাক জন্মাতে দেখা যায়। এসব রোগ দমনে রোগমুক্ত এলাকার বীজ সংগ্রহ করে শোধনের পর বপন করতে হবে ও মাঠে রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে রোগনাশক ছিটাতে হবে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। *Alternaria brassicicola* সরিষা পাতায় কী ধরনের দাগ উৎপন্ন করে?
- ক) ছোট ছোট গোলাকার
- খ) ছোট ছোট লম্বাটে
- গ) ছোট ছোট ডিম্বাকৃতি
- ঘ) আঁকাবাঁকা বড় আকৃতির

২। *Alternaria brassicae* সরিষা গাছের পাতায় কী ধরনের দাগ উৎপন্ন করে?
- ক) ধূসর ও গোলাকার
- খ) গাঢ় বাদামি ও লম্বাটে
- গ) হালকা বাদামি ও লম্বাটে
- ঘ) কালচে ও গোলাকার

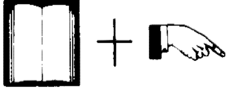
৩। অলটারনেরিয়া ব্লাইট রোগের উৎস কোন্‌টি?
- ক) মাটি
- খ) বীজ ও মাটি
- গ) বীজ
- ঘ) বায়ু

৪। অলটারনেরিয়া ব্লাইট রোগ দমনার্থে বপনের পূর্বে বীজকে কত তাপযুক্ত পানিতে কতক্ষণ রাখতে হয়?
- ক) ৫০° সেন্টিগ্রেডে ৩০ মিনিট
- খ) ৫০° সেন্টিগ্রেডে ৫০ মিনিট
- গ) ৫০° সেন্টিগ্রেডে ২০ মিনিট
- ঘ) ৫০° সেন্টিগ্রেডে ১০ মিনিট

৫। সরিষার ডাউনি মিলডিউ রোগের সূচনাতে কী ধরনের লক্ষণ দেখা দেয়?
- ক) পাতার নিচের দিকে বাদামি রঙের দাগ দেখা দেয়
- খ) পাতার উপরের দিকে বেগুনি রঙের দাগ দেখা দেয়
- গ) পাতার উপরের দিকে হলুদ রঙের দাগ দেখা দেয়
- ঘ) পাতার উপরের দিকে লালচে রঙের দাগ দেখা দেয়

৬। কোন্‌ আবহাওয়ায় ডাউনি মিলডিউ রোগ দমনার্থে ওষুধ স্প্রে করতে হয় ?
- ক) গাঢ় কুয়াশা ও গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির সময়
- খ) হালকা কুয়াশা ও মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায়
- গ) হালকা বৃষ্টির পর
- ঘ) মুসলধারে বৃষ্টির পর

পাঠ ৩.২ বাদামের রোগ



এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাদামের কয়েকটি ক্ষতিকর রোগের জীবাণুর নাম বলতে ও লিখতে পারবেন।
- রোগসমূহের লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রোগসমূহের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলতে ও লিখতে পারবেন।



টিক্কা (Tikka)

কারণ ঃ *Cercospora arachidicola* এবং *Cercosporidium personatum* নামক ছত্রাকদ্বয়ের আক্রমণে এ রোগ হয়।

লক্ষণ ঃ গাছের গোড়ার দিকের পাতায় প্রথমে চক্চকে হলুদ রঙের বলয় দ্বারা ঘেরা নানা আকারের ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত বাদামি রঙের দাগের আবির্ভাব হয়। মাঝে মাঝে একাধিক দাগ মিলে বড় দাগের সৃষ্টি হতে পারে। দাগে কালো ভেলভেটের মতো ছত্রাককে জন্মাতে দেখা যায়। আক্রান্ত পাতা ক্রমে মলিন হয়ে ঝরে পড়ে। পাতা ঝরে পড়া এ রোগের একটি বৈশিষ্ট্য। টিক্কা রোগে দু'প্রকার দাগ সৃষ্টি হয়। চিত্র ২৯ এ বাদামে টিক্কা রোগে আক্রান্ত পাতায় আগতি ও বিলম্বিত দাগ দেখানো হয়েছে।



চিত্র ২৯ ঃ বাদামের টিক্কা রোগ
বামে- আগতি দাগ (হলুদ বলয় ঘেরা অনিয়মিত ও বাদামি)
ডানে- বিলম্বিত দাগ (হলুদ বলয়বিহীন গোলাকার ও কালো)

আগতি দাগ ঃ ২-৩ মাস বয়সের গাছে এ দাগ হয়। পাতার উপরে প্রথম থেকেই চক্চকে হলুদ বলয় দ্বারা ঘেরা অনিয়মিত গোলাকার বাদামি দাগের আবির্ভাব হয়। এ দাগে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পাতার উপরের দিকে ছত্রাকের বৃদ্ধি দেখাতে পাওয়া যায়। *Cercospora arachidicola* -এর আক্রমণে এ দাগ সৃষ্টি হয়।

বিলম্বিত দাগ ঃ মৌসুমের শেষের দিকে এ দাগ দেখা দেয়। এ দাগে তেমন কোনো হলুদ বলয় দেখা যায় না। দাগ গোলাকার ও স্পষ্ট কিনারাযুক্ত। আগতি দাগের তুলনায় এরা ছোট, গোলাকার ও অনেক বেশি সংখ্যক হয়। *Cercosporidium personatum* -এর আক্রমণে এ দাগ হয়।

> ফসল আহরণের পর পরিত্যক্ত অংশসমূহ ধ্বংস করে টিক্কা রোগের উৎস নষ্ট করতে হবে।

দমন ঃ ফসল আহরণের পর পরিত্যক্ত অংশসমূহ ধ্বংস করে টিক্কা রোগের উৎস নষ্ট করতে হবে। রোগ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে ডায়থেন এম-৪৫ কয়েকবার ১০-১৫ দিন অন্তর অন্তর ছিটাতে হবে।

রাস্ট (Rust)

কারণ ঃ রাস্ট রোগ *Puccinia arachidis* নামক ছত্রাকের আক্রমণে হয়।

রাস্ট রোগে পাতার উভয় পৃষ্ঠে মরিচা রঙের ফোস্কার মতো দাগ হয়।



লক্ষণ ঃ পাতার উভয় পৃষ্ঠে মরিচা রঙের ফোস্কার মতো দাগ হয়। সাধারণত নিচের দিকেই দাগের সংখ্যা বেশি হয়। দাগ আকারে ছোট ও গোলাকার। আক্রান্ত পাতা কালক্রমে শুকিয়ে ঝরে পড়ে এবং গাছ মরে যায়। মাঠে বিভিন্ন স্থানে আক্রান্ত গাছগুলোকে দূর হতে মরিচা রঙের মতো মনে হয়। চিত্র ৩০ এ রাস্ট রোগে আক্রান্ত বাদাম গাছ দেখানো হয়েছে।

দমন ঃ রোগটি বীজবাহিত হওয়ায় বীজকে শোধন করে বপন করতে হয়। ফসলের পরিত্যক্ত অংশ নষ্ট করতে হবে এবং রোগ দেখা দিলে রোগনাশক ছিটাতে হবে।

কান্ড পচা (Stem rot)

Sclerotium rolfsii নামের ছত্রাক দ্বারা কান্ড পচা রোগ হয়।

কারণ ঃ *Sclerotium rolfsii* নামের ছত্রাক দ্বারা কান্ড পচা রোগ হয়।

লক্ষণ ঃ কান্ডে মাটি সংলগ্ন স্থানে প্রথম এ রোগের আক্রমণ হয়। আক্রান্ত স্থান প্রথম সাদা রেশমি সুতার মতো ছত্রাক বৃদ্ধি (মাইসেলিয়াম) দ্বারা আবৃত হয়ে পড়ে। ক্রমে ঐ স্থান বাদামি রঙ ধারণ করে নরম হয়ে পচে যায়। রোগের বৃদ্ধির সাথে সাথে গাছের ঝাড়ের একেকটি ডাল শুকিয়ে যেতে থাকে। মূল শিকড় আক্রান্ত হলে সম্পূর্ণ গাছটাই ঢলে পড়ে। আর্দ্র আবহাওয়ায় গাছের পচা অংশে, এমনকি আশেপাশের ফসলের পরিত্যক্ত অংশে ছত্রাক গুলোর মতো জন্মাতে থাকে এবং এর মধ্যে প্রথমে সাদা ও পরে বাদামি রঙের সরিষা দানার মতো এসক্লেরোশিয়াম হয়। চিত্র ৩১ এ কান্ড পচা রোগে আক্রান্ত বাদাম গাছ

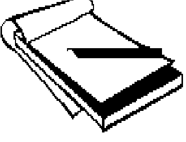
চিত্র ৩০ ঃ বাদামের রাস্ট রোগ
উপরে- পাতাস্থিত মরিচা রঙের ক্ষুদ্রকার পস্টিউল
মাঝে- আক্রান্ত পাতার কিছু অংশের পস্টিউলকে বড়
করে দেখানো হয়েছে
নিচে- মাঠে আক্রান্ত গাছের দৃশ্য



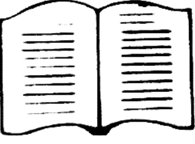
চিত্র ৩১ ঃ বাদাম গাছের কান্ড পচা রোগ; বামে- সাদা রঙের ছত্রাক বৃদ্ধি (প্রাথমিক পর্যায়)
ডানে- আক্রান্ত স্থানে গোলাকার বাদামি রঙের এসক্লেরোশিয়া (শেষ পর্যায়)

দেখানো হয়েছে।

দমন ঃ এসক্লোরোশিয়াম মাটিতে অনেক বছর সজীব থাকতে পারে এবং সেজন্য এ রোগ দমনের তেমন কোনো ভালো ব্যবস্থা নেই। তবে, গভীরভাবে চাষ করে জমিস্থিত জীবাণুর পরিমাণ কমিয়ে এবং ফসলের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে রোগ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। এছাড়া শস্য পর্যায়ে ধান ও গমের চাষ করে জমিকে জীবাণুমুক্ত করার চেষ্টা করতে হয়।



অনুশীলন (Activity) : *বাদাম গাছে টিক্কা রোগ হয়েছে কি-না তা কী করে বুঝবেন? এ রোগ প্রতিরোধর জন্য কী কী ব্যবস্থা নেবেন?*



সারমর্ম ঃ বাদাম গাছে টিক্কা রোগের দুরকম দাগ হয়। আগতি দাগ অনিয়মিত ও বাদামি রঙের এবং হলুদ বলয় দ্বারা ঘেরা থাকে। বিলম্বিত দাগ হলুদ বলয়বিহীন গোলাকার ও কালো। রাস্ট রোগে পাতার উভয় পিঠে মরিচা রঙের ফোস্কার মতো দাগ হয় এবং কান্ড পচা রোগে মাটি সংলগ্ন স্থানে কান্ড বাদামি হয়ে পচে যায়। বাদামি দাগ ও রাস্ট রোগ দমনে ক্ষেতের পরিত্যক্ত অংশসমূহ পোড়াতে হবে ও রোগনাশক ছিটাতে হবে। কান্ড পচা রোগ দমনে শস্য পর্যায়ে ধান ও গমের চাষ করতে হয়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। বাদামের আগতি টিক্কা রোগে পাতায় কী ধরনের দাগ হয়?
- ক) হলুদ বলয়যুক্ত অনিয়মিত গোলাকার বাদামি
- খ) হলুদ বলয়যুক্ত নিয়মিত গোলাকার বাদামি
- গ) বলয়বিহীন নিয়মিত গোলাকার বাদামি
- ঘ) বলয়বিহীন অনিয়মিত গোলাকার বাদামি

২। বাদামের বিলম্বিত টিক্কা রোগের দাগ কী ধরনের হয়?
- ক) কালচে, গোলাকার বলয়বিহীন
- খ) হালকা বাদামি, গোলাকার বলয়বিহীন
- গ) হালকা বাদামি, গোলাকার হলুদ বলয়যুক্ত
- ঘ) কালচে, গোলাকার হলুদ বলয়যুক্ত

৩। রাস্ট রোগজনিত দাগ দেখতে কেমন?
- ক) মরিচা রঙের, গোলাকার ফোস্কার মতো
- খ) কমলা-লাল চক্ষু আকৃতির ফোস্কার মতো
- গ) হলুদ, গোলাকার ফোস্কার মতো
- ঘ) কালো, গোলাকার ফোস্কার মতো

৪। বাদামের কান্ড পচা রোগের বৈশিষ্ট্য কোন্টি?
- ক) মাটিসংলগ্ন স্থানে কান্ডে কমলা রঙের দাগ পড়ে ও পচে যায়
- খ) মাটিসংলগ্ন স্থানে কান্ডে বাদামি দাগ পড়ে ও ফেটে রস বের হয়
- গ) মাটিসংলগ্ন স্থানে কান্ডে বাদামি দাগ পড়ে ও পচে যায়
- ঘ) মাটির কিছু উপরে কান্ডে কালো দাগ পড়ে ও পচে যায়

পাঠ ৩.৩ তিল ও সূর্যমুখীর রোগ



এ পাঠ শেষে আপনি –

- তিল ও সূর্যমুখীর কয়েকটি রোগের কারণ বলতে ও লিখতে পারবেন।
- রোগসমূহের লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রোগসমূহের দমন পদ্ধতি সম্বন্ধে বলতে ও লিখতে পারবেন।



তিলের গোড়া পচা (Foot rot of sesame)

গোড়া পচা রোগের আক্রমণে তিল গাছের গোড়ার দিক বিবর্ণ হয়ে পচে যায় এবং গাছ শুকিয়ে

কারণ ঃ *Phytophthora parasitica* var. *sesami* -নামের ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়।

লক্ষণ ঃ রোগের আক্রমণে তিল গাছের গোড়ার দিক বিবর্ণ হয়ে পচে যায় এবং গাছ শুকিয়ে যায়। এ রোগের জীবাণু গাছের পাতা ও ডালকেও আক্রমণ করতে পারে। পাতায় প্রথমে ছোট ও পরে বড় বাদামি দাগ উৎপন্ন করতে পারে। দাগগুলো বড় হয়ে গোটা পাতাকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। ডালে প্রথমে পানিভেজা, পরে বাদামি ও কালো দাগ উৎপন্ন করে। আক্রান্ত গাছের শুঁটি পুষ্ট হয় না এবং বীজ বাদামি বর্ণ হয়ে কুঁচকে যায়।

রোগ দমন ঃ রোগমুক্ত এলাকা থেকে বীজ সংগ্রহ করে ব্রাসিকল দিয়ে শোধন করার পর (১ কেজি বীজে ৩ গ্রাম ব্রাসিকল) বপন করতে হবে। জমি চাষ করার সময় ৩-৪ কেজি (একরপ্রতি) ব্রাসিকল মাটিতে ছড়িয়ে দিতে হবে। রোগাক্রান্ত গাছ দেখামাত্রই সমূলে তুলে মাঠের বাইরে নিয়ে নষ্ট করতে হবে। অনেকগুলো গাছে একসাথে রোগ দেখা দিলে ডায়থেন এম-৪৫ (এক কেজি ৩৫০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ছিটাতে হবে।

তিলের পাতায় দাগ ধরা (Leaf spot of sesame)

Cercospora sesami নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়।

কারণ ঃ *Cercospora sesami* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়।

লক্ষণ ঃ পাতায় প্রথমে খুব ছোট ছোট পানিভেজা কিছুটা ডুবা ধরনের দাগ পড়ে। ক্রমে দাগ বড় হয়ে গোলাকার বা অনিয়মিত আকারের হয়। পাতার উভয় পৃষ্ঠাতেই এ দাগ হয়ে থাকে। দাগ প্রথমে হালকা বাদামি থেকে সাদা রঙের হয় এবং পরবর্তীতে ধূসর বর্ণ ধারণ করে। দাগ বড় হয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিশে পাতায় ধ্বসা (blight) লক্ষণ সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় অনেক পাতা ঝরে পড়ে। পাতার বৃন্ত , কান্ড ও শুঁটির উপরও দাগ দেখা দেয়। এ দাগগুলো দেখতে লম্বাটে, কালো রঙের ও গভীর ক্ষতের মতো।

দমন ঃ বপনের আগে ব্রাসিকল দিয়ে বীজকে শোধন করে নিতে হবে (প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ১৫ গ্রাম ওষুধ)। গাছের পাতায় দাগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে ডায়থেন এম-৪৫ দু সপ্তাহ পর পর স্প্রে করতে হবে।

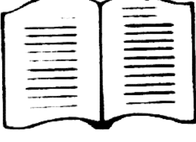
গূর্যমুখীর অলটারনেরিয়া ব্লাইট (Alternaria blight of sunflower)

গূর্যমুখী গাছের বিভিন্ন পর্যায়ে সারা মৌসুম ধরে অলটারনেরিয়া রোগ হয়ে থাকে।

কারণ ঃ *Alternaria helianthi* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়।

লক্ষণ ঃ সূর্যমুখী গাছের বিভিন্ন পর্যায়ে সারা মৌসুম ধরে অলটারনেরিয়া রোগ হয়ে থাকে। প্রথমে পাতায় গোলাকৃতি বা ডিম্বাকৃতি গাঢ় বাদামি রঙের দাগ দেখা দেয়। ক্রমে দাগগুলো বড় হয়ে পাতায় অনেকখানি স্থান জুড়ে ফেলে এবং পাতায় ঝলসানো লক্ষণের সৃষ্টি হয়। এ রোগে ৭০% পর্যন্ত ফলন কমে যেতে পারে।

দমন ঃ শস্য আহরণের পর যাবতীয় পরিত্যক্ত অংশসমূহ সতর্কতার সঙ্গে সংগ্রহ করে নষ্ট করতে হবে। গাছে রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ডায়থেন এম-৪৫ বা অন্য কোনো ছত্রাকনাশক ১৫ দিন পর পর কয়েকবার স্প্রে করতে হবে।



সারমর্ম ঃ তিলের গোড়া পচা রোগে গাছের গোড়ার দিকে পচে শুকিয়ে যায়। পাতায় দাগ ধরা রোগে পাতায়, কান্ডে ও শুঁটিতে বাদামি রঙের দাগ উৎপন্ন করে। সূর্যমুখীর অলটারনেরিয়া ব্লাইট রোগে পাতায় বাদামি দাগ হয়ে ঝলসে যায়। এসব রোগ দমনের জন্য রোগমুক্ত এলাকার বীজ শোধন করে বপন করতে হবে। কান্ড পচা রোগ দমনে পরিত্যক্ত অংশ নষ্ট করতে হবে ও প্রয়োজন মতো ওষুধ ছিটাতে হবে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। তিলের গোড়াপচা রোগের লক্ষণ কোন্‌টি?
- ক) গাছের গোড়ায় ধূসর বর্ণের দাগ পড়ে
- খ) গাছের গোড়ায় হলুদ বর্ণের দাগ পড়ে
- গ) গাছের গোড়ায় মরিচা রঙের দাগ পড়ে
- ঘ) গাছের গোড়ায় কালো রঙের দাগ পড়ে

২। তিলের *Cercospora sesami* জনিত রোগের বৈশিষ্ট্য কোন্‌টি?
- ক) পাতার কেবল উপরের পৃষ্ঠাতে ধূসর বর্ণের ডুবা দাগ হয়
- খ) পাতার কেবল নিচের পৃষ্ঠাতে ধূসর বর্ণের ডুবা দাগ হয়
- গ) পাতার উভয় পৃষ্ঠাতে ধূসর বর্ণের ডুবা দাগ হয়
- ঘ) পাতার উভয় পৃষ্ঠাতে হলুদ বলয় ঘেরা বাদামি দাগ হয়

৩। তিলের গোড়াপচা রোগের জীবাণু কোন্‌টি?
- ক) *Cercospora sesami*
- খ) *Alternaria solani*
- গ) *Phytophthora parasitica*
- ঘ) *Phytophthora infestans*

৪। সূর্যমুখীর অলটারনেরিয়া ব্লাইট রোগ গাছে কখন হয়?
- ক) চারা গাছে
- খ) বয়স্ক গাছে
- গ) ফুল ধরার সময়
- ঘ) বিভিন্ন পর্যায়ের গাছে সারা মৌসুমে

৫। তিলের পাতায় দাগ ধরা রোগ দমনার্থে বীজকে কোন্ ওষুধ দিয়ে শোধন করতে হবে?
- ক) টিলেট
- খ) ব্রাসিকল
- গ) হোমাই
- ঘ) ডায়থেন এম-৪৫

৬) সূর্যমুখীর ব্লাইট রোগে প্রাথমিক অবস্থায় কী ধরনের দাগ সৃষ্টি হয়?
- ক) ত্রিভুজাকৃতি গাঢ় বাদামি রঙের
- খ) গোলাকার ডিম্বাকৃতি গাঢ় বাদামি রঙের
- গ) অনিয়মিত আকারের গাঢ় বাদামি রঙের
- ঘ) গোলাকার গাঢ় বাদামি রঙের হলুদ বলয়বিশিষ্ট

পাঠ ৩.৪ সয়াবিনের রোগ



এ পাঠ শেষে আপনি –

- সয়াবিনের কয়েকটি রোগের জীবাণুর নাম বলতে ও লিখতে পারবেন।
- রোগসমূহের লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বর্ণিত রোগসমূহের দমন পদ্ধতি আলোচনা করতে পারবেন।



বাদামি দাগ (Brown spot)

কারণ ঃ *Septoria glycines* নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়।



লক্ষণ ঃ পাতার উভয় পৃষ্ঠায় ত্রিভুজাকৃতির হলুদ বলয় দ্বারা ঘেরা দাগ পড়ে। আক্রান্ত পাতা অকালে হলদে হয়ে ঝরে পড়ে। একাধিক দাগ পরস্পর যুক্ত হয়ে বড় দাগের সৃষ্টি করতে পারে। কান্ডে, পাতার বৃন্তে ও ফলের উপর বাদামি রঙের আঁকাবাঁকা দাগ পড়ে। দাগে ছত্রাকের পিকনিডিয়াম হতে দেখা যায়। চিত্র ৩২ এ বাদামি দাগ রোগে আক্রান্ত সয়াবিন গাছ দেখানো হয়েছে।

দমন ঃ ক্ষেতের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে নষ্ট করতে হবে। বাদামি দাগ রোগের প্রাথমিক উৎস বীজ। সেজন্য রোগমুক্ত এলাকা থেকে বীজ সংগ্রহ করে এবং ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধন করে লাগাতে হবে।

চিত্র ৩২ ঃ সয়াবিনের বাদামি দাগ রোগ
(হলুদ বলয় ঘেরা বাদামি দাগ)

এনথ্রাকনোজ (Anthracnose)

কারণ ঃ *Colletotrichum dematium* var. *truncata* এবং *Glomerella glycines* ছত্রাক দ্বারা সয়াবিনের এনথ্রাকলোজ রোগ হয়।

> কান্ড ও ফলে অনির্দিষ্ট আকারের গাঢ় বাদামি রঙের দাগ পড়ে। রোগাক্রমণের শেষের দিকে আক্রান্ত অংশে ছত্রাক অসংখ্য কালো সিটাসহ এসারভুলাস উৎপন্ন করে।

লক্ষণ ঃ সব বয়সের গাছেই সয়াবিনের এ রোগ হয়। কান্ড ও ফলে অনির্দিষ্ট আকারের গাঢ় বাদামি রঙের দাগ পড়ে। রোগাক্রমণের শেষের দিকে আক্রান্ত অংশে ছত্রাক অসংখ্য কালো সিটাসহ এসারভুলাস উৎপন্ন করে। আক্রান্ত বীজ বপন করলে অঙ্কুরোদ্গমের পূর্বে এবং পরেও ধ্বসা রোগ (damping-off) হতে পারে। অঙ্কুরোদ্গমের পর চারাগাছের বীজপত্রে প্রায়ই গাঢ় বাদামি রঙের ডুবা ধরনের (Sunken) ক্ষত বা ক্যাঙ্কার দাগ সৃষ্টি হয়। এ দাগ ক্রমান্বয়ে উপর ও নিচের দিকে বাড়তে থাকে। এনথ্রাকনোজ ছত্রাক বীজপত্র থেকে কান্ডে ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেক ছোট ছোট গর্তের মতো ক্ষত সৃষ্টি করে। এর ফলে অল্প বয়সেই গাছ মরে যায়। বড় গাছেও এ রোগ হতে পারে। তবে, বৃষ্টির সময় ছাড়া অন্য সময় তেমন ক্ষতি করতে পারে না। কচি কচি ফল (pod) আক্রান্ত হলে শুকিয়ে মরে যায়। ফল ধরার সময় গাছ আক্রান্ত হলে বীজ হয় না এবং হলেও অল্প সংখ্যক ছোট আকারের হয়। এসব ফলের ভিতরকার ফাঁকা অংশ ছত্রাকের মাইসেলিয়াম দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। চিত্র ৩৩ এ এনথ্রাকনোজ রোগে আক্রান্ত সয়াবিন গাছ দেখানো হয়েছে।

দমন ঃ রোগমুক্ত এলাকা থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে এবং ওষুধে শোধন করে বপন করতে হবে। ফসল সংগ্রহের পর যাবতীয় পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং চাষ করে মাটিকে ভালোভাবে ওলটপালট করতে হবে। রোগ দেখা দিলে ওষুধ ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে।



চিত্র ৩৩ ঃ সয়াবিনের এনথ্রাকনোজ রোগ; উপরে (বামে)- কান্ডস্থিত অনির্দিষ্ট আকারের গাঢ় বাদামি দাগ উপরে (ডানে)- ফলের উপরিস্থিত দাগ ও নিচে- কালো কালো সিটাসহ এসারভুলাস

মোজাইক (Mosaic)

কারণ ঃ সয়াবিন মোজাইক ভাইরাস (SoyMV) দ্বারা মোজাইক রোগ হয়।

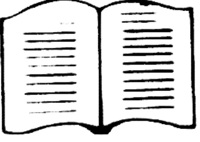
মোজাইক রোগে আক্রান্ত বীজের নাভি থেকে বীজত্বকের উপর গাঢ় বেগুনি অথবা বাদামি রঙ চুইয়ে পড়ার মতো দাগ দেখা যায়।

লক্ষণ ঃ সয়াবিন মোজাইক ভাইরাস একটি বীজ বাহিত ভাইরাস। আক্রান্ত বীজ অঙ্কুরিত হয় না এবং কোনো ক্ষেত্রে হলেও চারায় রোগ হয়। আক্রান্ত বীজে লক্ষণ প্রকাশিত হয়। বীজের নাভি থেকে বীজত্বকের উপর গাঢ় বেগুনি অথবা বাদামি রঙ চুইয়ে পড়ার মতো দাগ দেখা গেলে বুঝতে হবে বীজগুলো ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত। আক্রান্ত চারাগাছের পাতা লাটিমের মতো এক অনুফলকবিশিষ্ট এবং তা কুঁচকে লম্বালম্বিভাবে বেঁকে যায়। তিন অনুফলকবিশিষ্ট পাতা খুব ছোট ও ফুট ফুট দাগবিশিষ্ট হয়। অল্প বয়সে গাছ আক্রান্ত হলে তার কান্ড মধ্যপর্ব ছোট হয়ে গাছ বেঁটে হয়ে যায়।

চিত্র ৩৪ঃ সয়াবিনের মোজাইক রোগ (পাতায় ভাঁজপড়া লক্ষণীয়)

পাতার গায়ে ঢেউয়ের মতো ভাঁজ সৃষ্টি হয় এবং মাঝে মাঝে শিরা বরাবর পাতা গাঢ় সবুজ রঙ ধারণ করে ও চিকন হয়ে বৃদ্ধি পায়। আক্রান্ত অনুফলকগুলো অসামঞ্জস্য অবস্থায় অবস্থান করে এবং কিনারা নিচের দিকে বেঁকে যায়। আক্রান্ত পাতায় কিছুটা হলুদ রঙের ছাট পড়ে। আক্রান্ত ফল প্রায়ই ছোট ও চ্যাপ্টা হয়ে যায় এবং নীরোগ ফলের তুলনায় অনেক বেশি বেঁকে যায়। চিত্র ৩৪ এ মোজাইক রোগে আক্রান্ত সয়াবিন গাছ দেখানো হয়েছে।

দমন ঃ মোজাইক রোগ বীজবাহিত এবং জাব পোকা (aphid) দ্বারা ছড়ায়। এজন্য রোগমুক্ত এলাকা থেকে বীজ সংগ্রহ করে বপন করতে হবে। শতকরা একটি বীজেও ভাইরাস সংক্রমণের লক্ষণ দেখা গেলে সমস্ত বীজ বপণের অযোগ্য বিবেচনা করতে হবে। আগাছা ও জাবপোকা ধ্বংস করতে হবে। চাষের জন্য বীজ উৎপন্ন করতে হলে রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে রোগগ্রস্ত গাছ উঠিয়ে নষ্ট করে ফেলতে হবে।



সারমর্ম ঃ বাদামি দাগ রোগে পাতার উভয় পৃষ্ঠে হলুদ বলয় দ্বারা ঘেরা ত্রিভুজাকৃতির দাগ হয়। কান্ড, পাতার বৃন্ত ও ফলের উপরও আঁকাবাঁকা বাদামি দাগ পড়ে। এনথ্রাকনোজ রোগে কান্ড ও ফলে অনির্দিষ্ট আকারের বাদামি দাগ হয়। মোজাইক রোগে পাতা কুচকে লম্বালম্বিভাবে বেঁকে যায় ও এতে ফুট ফুট দাগ পড়ে। এসব রোগ দমনে রোগমুক্ত এলাকা থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে, বীজকে শোধন করতে হবে এবং রোগনাশক ছিটাতে হবে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। সয়াবিনের বাদামি দাগ রোগের বৈশিষ্ট্য কোন্‌টি?
- ক) বাদামি রঙের গোলাকার হলুদ বলয় দ্বারা ঘেরা দাগ হয়
- খ) বাদামি রঙের ত্রিভুজাকৃতির হলুদ বলয় দ্বারা ঘেরা দাগ হয়
- গ) বাদামি রঙের ডিম্বাকৃতি বলয়বিহীন দাগ হয়
- ঘ) বাদামি রঙের চক্ষু আকৃতির বলয় বিহীন দাগ হয়

২। সয়াবিনের পাতায় দাগ ধরা রোগের দমন পদ্ধতি কোন্‌টি?
- ক) রোগমুক্ত এলাকার বীজ বপন করতে হবে
- খ) বীজ বপনের সময় এগিয়ে আনতে হবে
- গ) ক্ষেতে চুন প্রয়োগ করতে হবে
- ঘ) রোগ দেখা দিলে গাছে গন্ধক চুর্ণ ছিটাতে হবে

৩। সয়াবিনের এনথ্রাকনোজ রোগ সাধারণত কখন হয়?
- ক) চারা গাছে
- খ) মধ্যম বয়সের গাছে
- গ) ফল ধরার সময়
- ঘ) গাছের বৃদ্ধির সকল পর্যায়ে

৪। অল্প বয়সের গাছে মোজাইক রোগ হলে কী ধরনের লক্ষণ প্রকাশ পায়?
- ক) পাতা ছোট হয় এবং এতে ঢেউয়ের মতো ভাঁজ পড়ে
- খ) পাতা ছোট হয় এবং এটি উপরের দিকে বেঁকে যায়
- গ) পাতা লম্বা হয় এবং এতে ঢেউয়ের মতো ভাঁজ পড়ে
- ঘ) পাতা স্বাভাবিক আকারের হয় কিন্তু উপরের দিকে বেঁকে যায়

৫। মোজাইক রোগে আক্রান্ত গাছের ফল কেমন হয়?
- ক) ছোট ও আগার দিক সরু হয়ে যায়
- খ) ছোট ও বোঁটার দিক সরু হয়ে যায়
- গ) ছোট ও উভয় দিক সরু হয়ে যায়
- ঘ) ছোট ও চ্যাপ্টা হয়ে বেঁকে যায়

পাঠ ৩.৫ ডাল ফসলের রোগ



এ পাঠ শেষে আপনি –

- ডাল ফসলের দুটি প্রধান রোগের কারণ বলতে ও লিখতে পারবেন।
- উক্ত দুটি রোগের লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রোগ দুটির দমন ব্যবস্থা বলতে ও লিখতে পারবেন।



গোড়া ও মূলপচা (Foot and root rot)

কারণ ঃ *Rhizoctonia solani* নামক ছত্রাকের আক্রমণে ডাল ফসলের গোড়া ও মূল পচা রোগ হয়।

> *Rhizoctonia solani* নামক ছত্রাকের আক্রমণে ডাল ফসলের গোড়া ও মূল পচা রোগ হয়।

লক্ষণ ঃ যে কোনো বয়সের গাছে এ রোগ হতে পারে। চারাগাছে কান্ডের নিচের দিকে মাটিসংলগ্ন স্থান গাঢ় বাদামি হয়ে পচে যায়। এর ফলে গাছটি মাটির উপরে ঢলে পড়ে। বয়স্ক গাছের কান্ডে ও শিকড়ের এ রোগ হতে পারে এবং পাতা শুকিয়ে আক্রান্ত গাছ মরে যায়। আক্রান্ত গাছ সতর্কতার সঙ্গে মাটি থেকে উঠালে শিকড়গুলোকে পচা অবস্থায় কালচে দেখায়। অনেকক্ষেত্রে শাখা শিকড় থাকে না।



চিত্র ৩৫ এ গোড়া ও মূল পচা রোগে আক্রান্ত মুসুরের ডাল গাছ দেখানো হয়েছে।

চিত্র ৩৫ ঃ মুসুরের গোড়া পচা ও ম ল পচা রোগ
(গাঢ় বাদামি রঙের গোড়া ও ম ল লক্ষণীয়)

দমন ঃ আক্রান্ত গাছের বীজ ও পরিত্যক্ত অংশে ছত্রাক বেঁচে থাকে এবং মৌসুমের প্রারম্ভে রোগসংক্রমণে সাহায্য করে। এ কারণে ফসল তোলার পর যাবতীয় পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে। তারপর জমি গভীরভাবে চাষ করলে মাটিতে জীবাণুর পরিমাণ অনেক কমে যায়। রোগাক্রান্ত ফসলের পরিত্যক্ত অংশ গরুর খাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। সম্ভব হলে ২-৩ বছর জমিতে চিনাবাদাম, মসুর প্রভৃতি গাছ না লাগানো ভালো।

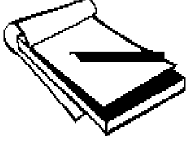
ঢলে পড়া রোগ

কারণ ঃ *Fusarium* -এর বিভিন্ন প্রজাতির ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়।

> ঢলে পড়া রোগের আদর্শ লক্ষণ হলো পাতা ও ডালপালা হঠাৎ করে ঝিমিয়ে পড়া।

লক্ষণ ঃ ঢলে পড়া রোগের আদর্শ লক্ষণ হলো পাতা ও ডালপালা হঠাৎ করে ঝিমিয়ে পড়া। চারা অবস্থায় এ রোগ হলে ক্ষেতে গাছের সংখ্যা অনেক কমে যায়। শীত আসার সাথে সাথে রোগের প্রকোপ কমে যায় এবং গাছ বড় হতে থাকে। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে অল্প অল্প গরম পড়ার সাথে সাথে রোগের লক্ষণ বড় গাছে আবার দেখা দিতে থাকে এবং গাছ ঢলে শুকিয়ে যায়। ঢলে পড়া গাছের কান্ড ও শিকড় লম্বালম্বিভাবে চিরলে তার জাইলেম ও পিথ টিস্যুকে বাদামি বলে মনে হয়। রসসঞ্চালন নালীতে এরূপ দাগ হওয়া এ রোগের আর একটি বৈশিষ্ট্য এবং এটা রোগ নিরূপণের খুবই সহায়ক।

দমন ঃ ফসল তোলার পর সকল গাছ শিকড়সমেত উঠিয়ে বর্ষার প্রারম্ভে লাঙ্গল দিয়ে জমির মাটি ভালো করে ওলটপালট করতে হবে। দাগ ও কুঁচকানো চিহ্নযুক্ত বীজ বপন করা যাবে না। রোগমুক্ত এলাকার বীজ সংগ্রহ করে বপন করতে হবে।



অনুশীলন (Activity) : *ডাল ফসরের গোড়া ও মূল পচা এবং ঢলে পড়া রোগের মধ্যে তুলনা করুন।*



সারমর্ম ঃ শিকড় ও মূলপচা এবং ঢলে পড়া রোগে কান্ড ও শিকড় আক্রান্ত হয়ে গাছ ঢলে পড়ে মরে যায়। এ রোগে রস সঞ্চালন নালিতে বৈশিষ্ট্যমূলক বাদামি দাগ পড়ে। ফসলের পরিত্যক্ত অংশ নষ্ট করে, শস্য পর্যায়ে অন্য ফসল আবাদ করে ও জমি গভীরভাবে চাষ করে এ সব রোগ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৫

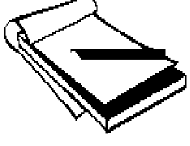
সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। গোড়া ও মূল পচা রোগ গাছের কোন্ পর্যায়ে হয়?
- ক) শুধু চারা গাছে
- খ) ফুল ধরার আগে গাছ বৃদ্ধির পর্যায়ে
- গ) গাছে ফুল ধরার পর
- ঘ) গাছের যে কোনো পর্যায়ে

২। গোড়া ও মূল পচা রোগের লক্ষণ কোন্টি?
- ক) সম্পূর্ণ কান্ড পচে গাছ ঢলে পড়ে
- খ) মাটিসংলগ্ন স্থানে কান্ড পচে গাছ ঢলে পড়ে
- গ) গাছের একদিকের ডাল ঢলে পড়ে
- ঘ) শিকড় পচে গাছ ঢলে পড়ে

৩। গোড়া ও মূল পচা রোগ দমনের জন্য কী করা উচিত?
- ক) ছত্রাকনাশক স্প্রে করা উচিত
- খ) মাটিতে চুন প্রয়োগ করা উচিত
- গ) ফলের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে জমি গভীরভাবে চাষ করা উচিত
- ঘ) বীজ শোধন করে বপন করা উচিত

৪। ঢলে পড়া রোগের গাছের কান্ড ও শিকড়ের লম্বচ্ছেদে জাইলেম টিস্যুর রঙ কোন্টি?
- ক) স্বাভাবিক সাদা
- খ) বাদামি
- গ) হলুদ
- ঘ) লাল



চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ৩

১। সরিষার অলটারনেরিয়া ব্লাইট রোগের লক্ষণ বর্ণনা করুন।
২। বাদামের টিক্কা রোগের জীবাণুর নাম ও লক্ষণ সম্বন্ধে লিখুন।
৩। তিলের গোড়া পচা রোগের বর্ণনা দিন।
৪। সয়াবিনের এনথ্রাকনোজ রোগের বৈশিষ্ট্য লিখুন।
৫। ডালের গোড়াপচা রোগের দমন পদ্ধতি লিখুন।
৬। সয়াবিনের মোজাইক রোগের দমন পদ্ধতি লিখুন।



উত্তরমালা - ইউনিট ৩

পাঠ ৩.১
১। ক ২। গ ৩। খ ৪। ক ৫। গ ৬। ক

পাঠ ৩.২
১। ক ২। ক ৩। ক ৪। গ

পাঠ ৩.৩
১। ঘ ২। গ ৩। গ ৪। ঘ ৫। খ ৬। খ

পাঠ ৩.৪
১। খ ২। ক ৩। ঘ ৪। ক ৫। ঘ

পাঠ ৩.৫
১। ঘ ২। খ ৩। গ ৪। খ

ইউনিট ৪
সবজি ফসলের রোগ
ও প্রতিকার

ইউনিট ৪ সবজি ফসলের রোগ ও প্রতিকার

সবজি বলতে আমরা সেসব ফসলকে বুঝাই যা তোলার পর কাঁচা বা রান্না করে খাওয়া হয়ে থাকে। সমগ্র বাংলাদেশে বহু জাতের সবজি সারা বছরে উৎপন্ন হয়। অন্যান্য ফসলের ন্যায় সবজিরও নানাপ্রকার রোগ হয়। কিছু কিছু রোগ আছে (যথা- আলুর লেইট ব্লাইট রোগ) যা মহামারী আকারে দেখা দিয়ে ফসলের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে থাকে। ভালো সবজি উৎপন্ন করতে হলে তার রোগবালাই সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

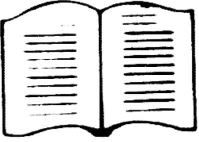
এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে আলু, টমেটো, ঢেঁড়শ, কুমড়া ও শিমের বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকসহ আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৪.১ আলুর রোগ



এ পাঠ শেষে আপনি –

- আলুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রোগের কারণ বলতে ও লিখতে পারবেন।
- উক্ত রোগের লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বর্ণিত রোগসমূহের দমন পদ্ধতি আলোচনা করতে পারবেন।



লেইট ব্লাইট (Late blight)

কারণ ঃ আলুর লেইট ব্লাইট রোগ *Phytophthora infestans* নামক ছত্রাকের আক্রমণে হয়।

লক্ষণ ঃ রোগের প্রাথমিক অবস্থায় পাতার আগা ও কিনারায় ছোট ছোট আঁকাবাঁকা পানিভেজা দাগের আবির্ভাব হয়। অনেক দাগ নীলাভ এবং বয়স্ক দাগের রঙ বাদামি। পাতার নিচে দাগের ধার দিয়ে সাদা



চিত্র ৩৬ ঃ আলুর লেইট ব্লাইট রোগ; বামে- আক্রান্ত পাতা, ডানে (উপরে)- পাতার নিচের দিকে দাগের ধার দিয়ে সাাদা ছত্রাক বৃদ্ধি (রোগের প্রাথমিক পর্যায়), ডানে (নিচে)- বাদামি দাগযুক্ত আলু

তূলোর মতো ছত্রাকের বৃদ্ধি (মাইসেলিয়াম) বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। আবহাওয়ায় দাগগুলো দ্রুত বেড়ে সমস্ত পাতায় ছাড়িয়ে পড়ে এবং কয়েক দিনের মধ্যে পাতা মরে যায়। ঠান্ডা ও আর্দ্র আবহাওয়ায় রোগ পাতা থেকে বৃন্তে সংক্রামিত হয়। রোগের প্রকোপ বেশি হলে পচা পাতা ও কান্ড থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় রোগ মাটির নিচের আলুতেও ছড়িয়ে পড়ে। সংক্রামিত আলুর খোসার নিচে ১.২৫ সে.মি. পরিমাণ স্থানের টিস্যু বাদামি হয়ে যায় এবং পরে পচে যায়। চিত্র ৩৬ এ লেইট ব্লাইট রোগে আক্রান্ত আলু গাছ দেখানো হয়েছে।

যেসব স্থানে এ রোগ প্রায়ই হয়, সেখানে আলুর গাছ ৮-১০ আঙ্গুল হলেই গাছে ডায়থেন এম-৪৫ বা বোর্দো মিক্সচার ১৫ দিন পর পর নিয়মিত ছিটাতে হবে।

দমন ঃ রোগ উৎপাদক ছত্রাক বীজে সজীব অবস্থায় অবসর যাপন করে। এ কারণে রোগমুক্ত এলাকা থেকে পরবর্তী বছরের জন্য বীজ সংগ্রহ করতে হবে। অল্প বীজ হলে তা ভাদ্র মাসে রৌদ্রে এক মাস শুকিয়ে নিলে আলুর মধ্যস্থিত ছত্রাক তাপে মরে যায়। পাতা থেকে আলুতে যাতে রোগ সংক্রামণ না হতে পারে সেজন্য আলু সংগ্রহ করার আগে সাইনক্স বা এমোনিয়াম থায়োসায়ানেট ওষুধ ছিটিয়ে পাতা ঝরিয়ে ফেলতে হয়। শুকনো আবহাওয়ায় আলু সংগ্রহ করা উচিত। গাছের গোড়ায় মাটি উঁচু করে তুলে দিলে মাটির নিচের আলুকে ছত্রাকের আক্রমণ থেকে অনেকাংশে রক্ষা করা যায়। সম্ভব হলে সংগ্রহের পর হিমাগারে আলু সংরক্ষণ করা উচিত। যেসব স্থানে এ রোগ প্রায়ই হয়, সেখানে আলুর গাছ ৮-১০ আঙ্গুল হলেই গাছে ডায়থেন এম-৪৫ বা বোর্দো মিক্সচার ১৫ দিন পর পর নিয়মিত ছিটাতে হবে।

পাতা গুটানো (Leaf roll)

কারণ ঃ এটি ভাইরাসজনিত রোগ। আলুর অনেকগুলো ভাইরাস রোগ আছে, যথা - পাতা গুটানো, পাতা কোঁকড়ানো, মোজাইক, গুচ্ছ রোগ প্রভৃতি। এগুলোর মধ্যে পাতা গুটানো রোগের প্রাদুর্ভাব সব চেয়ে বেশি এবং এ রোগটি খুবই ক্ষতিকারক।

পাতা গুটানো রোগে পাতার অনুফলক মধ্যশিরা নিচে রেখে কিনারা থেকে লম্বালম্বিভাবে উপরের দিকে গুটিয়ে আসতে থাকে এবং অনেকটা ছোট কোদালের আকার ধারণ করে।

লক্ষণ ঃ পাতা গুটানো রোগে পাতার অনুফলক মধ্যশিরা নিচে রেখে কিনারা থেকে লম্বালম্বিভাবে উপরের দিকে গুটিয়ে আসতে থাকে এবং অনেকটা ছোট কোদালের আকার ধারণ করে। আক্রান্ত বীজ হতে যে গাছ হয় তাতে নিচের পাতার অনুফলক হতে শু রু করে ধীরে ধীরে সকল পাতার অনুফলক গুটিয়ে আসে। এসব অনুফলক মোটা ও শক্ত অথচ চামড়ার মতো মনে হয় এবং গাছে খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। এসব পাতা হাত দিয়ে একটু ঘসা দিলেই ভেঙ্গে যায়। গাছের পর্বমধ্যও ছোট হয়ে যায়। ফলে, গাছ বেঁটে হয়। অনেক সময় পাতা লালচে অথবা পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করে । গাছ বেঁটে হওয়া ও পাতা গুটানো এ রোগের বৈশিষ্ট্য। গাছের খাদ্য নালী (phloem) নষ্ট হয়ে যায়। ফলে, খাদ্য পাতা থেকে নিচের দিকে যেতে পারে না এবং গাছে আলুর সংখ্যা কমে যায় ও আকারে অনেক ছোট হয়। চিত্র ৩৭ এ পাতা গুটানো রোগে আক্রান্ত আলু গাছ দেখানো হয়েছে।



চিত্র ৩৭ ঃ আলুর পাতা গুটানো রোগ (পাতা উপরের দিকে গুটিয়ে আসছে)

দমন ঃ রোগমুক্ত এলাকা থেকে বীচন আলু সংগ্রহ করতে হয়। ছোট আকারের আলু কখনোই বীজ হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। জাবপোকা এ রোগ ছড়ায় বিধায় মাঠে এ পোকা দেখার সাথে সাথে কীটনাশক স্প্রে করতে হবে। আক্রান্ত গাছ দেখলেই ক্ষেত থেকে উঠিয়ে নষ্ট করে ফেলতে হবে।

গুদামজাত রোগ

আলুর গুদামজাত রোগের মধ্যে শুকনো পচা ও অন্তঃসার কালো হওয়া রোগ বিশেষ উলে-খযোগ্য।

(১) শুকনো পচা (Dry rot)

কারণ ঃ *Fusarium caerulium* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়।

আলুর শুকনো পচা রোগে আক্রান্ত অংশের খোসা একটু ডেবে যায় এবং গাঢ় রঙ ধারণ

লক্ষণ ঃ আলুর আক্রান্ত অংশের খোসা একটু ডেবে যায় এবং গাঢ় রঙ ধারণ করে। ধীরে ধীরে ভেতরের টিস্যু শুকিয়ে যেতে থাকে এবং খোসায় চক্রাকারে কুঞ্চন দেখা দেয়। শুকনো অংশ বেশ শক্ত মনে হয় এবং অনেক স্থানে ফাঁপা হয়ে যায়। কুচকানো অংশে অনেক সময় সাদা তূলোর ন্যায় ছত্রাকের বৃদ্ধি (মাইসেলিয়াম) দেখতে পাওয়া যায়। চিত্র ৩৮ এ শুকনো পচা রোগে আক্রান্ত আলু দেখানো হয়েছে।



দমন ঃ সাধারণত আলু বাছাই করার সময় নাড়াচাড়া করতে হয় বলে তখন তাতে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং ছত্রাক তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে রোগ সংক্রমণ ঘটায়। এ কারণে সর্বদা নজর রাখতে হবে যেন আলু তোলার সময় তাতে ক্ষতের সৃষ্টি না হয়। আলু আহরণ করে তার উপরের খোসাকে কিছুটা শক্ত করার জন্য বায়ু চলাচল করতে পারে এমন স্থানে কয়েক দিন রাখার পর হিমাগারে ৪-১০^{o} সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়।

(২) কালো অন্তঃসার (Black heart)

কারণ ঃ এ রোগের জন্য কোনো জীবাণু দায়ী নয়। এটি একটি শারীরবৃত্তীয় রোগ।

কালো অন্তঃসার রোগে আক্রান্ত আলুর মাঝখানের টিস্যু কালো ও চামড়ার মতো হয়ে যায়।

লক্ষণ ঃ অত্যধিক তাপ ও বায়ুর স্বল্পতার জন্য এ রোগ হয়। রোগাক্রান্ত আলুর মাঝখানের টিস্যু কালো ও চামড়ার মতো হয়ে যায়। অত্যধিক তাপের ফলে কোষের শ্বসন বেড়ে যায় এবং আলুর কেন্দ্রস্থিত কোষে অক্সিজেনের অভাব ঘটে। ফলে, কোষ মরে যায়। তবে মৃত কোষের এনজাইম স্বাভাবিকভাবে কাজ করে যায় এবং অ্যামাইনো এসিডকে ভেঙ্গে কালো রঙের অদ্রবণীয় মেলানিন উৎপন্ন করে। এ মেলানিনের জন্যই টিস্যুর রঙ কালো হয়। রোগের চরম অবস্থায় আক্রান্ত কোষগুলো শুকিয়ে আলাদা হয়ে গর্তের সৃষ্টি করে। ছোট আলু থেকে বড় আলুতে এ রোগ বেশি হয়। রোগগ্রস্ত আলু খাওয়ার অনুপোযুক্ত হয়ে পড়ে।

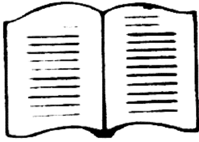
চিত্র ৩৮ ঃ আলুর শুকনো পচা রোগ

(আক্রান্ত অংশে কুঞ্চন ও সাদা সাদা ছত্রাক মাইসেলিয়াম লক্ষণীয়)



চিত্র ৩৯ ঃ আলুর কালো অন্ত ঃসার রোগ
(কেন্দ্রস্থিত টিস্যু কালো ও ভেতর কিছুটা ফাঁপা)

দমন ঃ আলুর সংরক্ষণাগারের তাপমাত্রা ও আলুর স্তুপের উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ করে এ রোগ থেকে আলুকে বাঁচানো যায়। আলু ৫^{o} সেঃ উষ্ণতায় ১৮০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত স্তুপ করে রাখা যায় এবং এ অবস্থায় বায়ু চলাচলের বিশেষ কোনো ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয় না। তবে উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে আলুর স্তুপের উচ্চতা কমাতে হবে এবং বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থা করতে হবে। চিত্র ৩৯ এ অন্তঃসার রোগে আক্রান্ত আলু দেখানো হয়েছে।



সারমর্ম ঃ লেইট ব্লাইট ও শুকনো পচা রোগ ছত্রাক এবং পাতা গুটানো রোগ ভাইরাস দ্বারা হয়। কালো অন্তঃসার রোগ গুদামের অত্যধিক তাপ ও বায়ুর স্বল্পতার দরুন হয়। ব্লাইট রোগে পাতায় প্রথমে পানিভেজা দাগ হয় এবং পরে দাগ ছড়িয়ে বাদামি হয়ে পচে যায়। পাতা থেকে রোগ বৃন্ত ও আলুতে সংক্রমিত হয়। পাতাগুটানো রোগে পাতা কিনারা থেকে উপরের দিকে গুটিয়ে আসে। ব্লাইট রোগ ছত্রাকনাশক ও পাতা গুটানো রোগ কীটনাশক স্প্রে করে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। গুদামের তাপ নিয়ন্ত্রণ ও বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করে গুদামজাত রোগ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। লেইট ব্লাইট রোগের প্রাথমিক অবস্থার লক্ষণ কোন্‌টি?
- ক) পাতায় আলপিনের মাথার মতো পানিভেজা দাগ পড়ে
- খ) পাতার আগা ও কিনারায় ছোট ছোট পানিভেজা আঁকা বাঁকা দাগ পড়ে
- গ) পাতার কিনারা দিয়ে গোলাকার বাদামি দাগ পড়ে
- ঘ) পাতায় ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত মরিচা রঙের গোলাকার দাগ পড়ে

২। লেইট ব্লাইট রোগ কোন্ আবহাওয়ায় বেশি হয়?
- ক) শুকনো আবহাওয়ায়
- খ) ঠান্ডা ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায়
- গ) ঝড়ো আবহাওয়ায়
- ঘ) উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায়

৩। লেইট ব্লাইট রোগ দমনের পদ্ধতি কোন্‌টি?
- ক) ভিজে আবহাওয়ায় আলু তুলতে হবে
- খ) জমিতে বেশি পরিমাণে সার প্রয়োগ করতে হবে
- গ) ডায়থেন এম-৪৫ ছত্রাকনাশক ১৫ দিন পরপর স্প্রে করতে হবে
- ঘ) কীটনাশক ছিটিয়ে কীট দমন করতে হবে

৪। আলুর পাতা গুটানো রোগে পাতার অনুফলকে কী ধরনের লক্ষণ প্রকাশ পায়?
- ক) অনুফলক লম্বালম্বিভাবে উপরের দিকে গুটিয়ে আসে
- খ) অনুফলকের কিনারা নিচের দিকে বেঁকে যায়
- গ) অনুফলক লম্বালম্বিভাবে নিচের দিকে গুটিয়ে যায়
- ঘ) অনুফলকের কিনারা ঢেউ খেলানোর মত হয়

৫। আলুর কালো অন্তঃসার রোগ কোন্ পরিবেশে হয়?
- ক) অত্যধিক ঠান্ডায় আলু স্তুপাকারে সংরক্ষণ করলে
- খ) অত্যধিক ঠান্ডায় আলু ছড়িয়ে সংরক্ষণ করলে
- গ) অত্যধিক তাপ ও অপর্যাপ্ত বায়ুতে স্তুপাকারে সংরক্ষণ করলে
- ঘ) অত্যধিক তাপে খোলামেলা স্থানে সংরক্ষণ করলে

৬। আলুর অন্তঃসার কালো হয় কিসের জন্য?
- ক) টেনিন
- খ) মেলানিন
- গ) এনজাইম
- ঘ) টক্সিন

পাঠ ৪.২ টমোটো গাছের রোগ



এ পাঠ শেষে আপনি –

- টমেটো গাছের কতিপয় রোগের কারণ বলতে ও লিখতে পারবেন।
- রোগসমূহের লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রোগের দমন পদ্ধতি বলতে ও লিখতে পারবেন।



টমেটো গাছের লেইট ব্লাইট (Late blight of tomato)

কারণ ঃ *Phytophthora infestans* নামক ছত্রাকের আক্রমণে টমোটা গাছের লেইট ব্লাইট রোগ হয়।

লক্ষণ ঃ রোগের প্রাথমিক অবস্থায় বয়স্ক পাতার উপর কালচে বাদামি পানিভেজা আঁকাবাঁকা দাগ দেখা দেয়। দাগগুলো দ্রুত বাড়তে থাকে এবং আর্দ্র আবহাওয়ায় কিছু কিছু পাতার নিচের দিকে সাদা সাদা ছত্রাকের বৃদ্ধি দেখতে পাওয়া যায়। ক্রমে রোগ পাতা থেকে কান্ডে এবং কান্ড থেকে টমেটোতে ছড়াতে থাকে। আক্রান্ত কান্ড স্থানে স্থানে কালো বর্ণ ধারণ করে এবং আক্রান্ত স্থানে অনেক সময় কান্ড ভেঙ্গে পড়ে। আর্দ্র আবহাওয়ায় রোগ বিস্তৃত হয়ে গাছ ধূসর বর্ণ হয়ে শুকিয়ে যেতে থাকে। আক্রান্ত টমেটোতে প্রাথমিক অবস্থায় ধূসর পানিভেজা দাগের আবির্ভাব হয়। ঐ দাগ ক্রমশঃ বেড়ে ফলের অনেক অংশে বিস্তৃত হয়ে বাদামি রঙ ধারণ করে এবং উপরিভাগ অনেকটা শক্ত চামড়ার মতো হয়ে যায় ও দাগস্থিত অংশ কুচঁকে যায়। চিত্র ৪০ এ লেইট ব্লাইট রোগে আক্রান্ত টমোটোর পাতা, কান্ড ও ফল দেখানো হয়েছে।

রোগের প্রাথমিক অবস্থায় বয়স্ক পাতার উপর কালচে বাদামি পানিভেজা আঁকাবাঁকা দাগ দেখা দেয়।



চিত্র ৪০ ঃ টমেটোর লেইট ব্লাইট রোগ
বামে- পাতার ওপর কালচে-বাদামি পানিভেজা আঁকাবাঁকা দাগ (রোগের প্রাথমিক পর্যায়)
মাঝে- কান্ড ও টমেটোতে সৃষ্ট দাগ (রোগের শেষের দিকের পর্যায়)
ডানে- রোগগ্রস্ত অংশ দেখতে চামড়ার মতো

দমন ঃ আলু গাছে এ রোগ মারাত্তক আকারে দেখা দেয় বিধায় আলু ক্ষেতের কাছাকাছি টমেটোর চাষ করা উচিত নয়। রোগ দেখা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডায়থেন এম-৪৫ অথবা বোর্দো মিক্সচার আবহাওয়ার প্রকৃতি অনুযায়ী গাছে ৭-১০ দিন অন্তর অন্তর ছিটাতে হবে। ঠান্ডা (১০-২০°সে.) ও আর্দ্র

আবহাওয়ায় (৯১-১০০% আপেক্ষিক আর্দ্রতা) এ রোগের সংক্রমণ ঘটে এবং পরবর্তীতে এ রোগের বৃদ্ধির জন্য ২১-২৪^{o}সে. উষ্ণতা প্রয়োজন হয়। সেজন্য রোগ দেখা দেয়ার আগেই উপরোক্ত আবহাওয়া হলেই ব্যাপকভাবে ওষুধ ছিটানোর ব্যবস্থা করা উচিত।

ঢলে পড়া (Wilt)

কারণ ঃ *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* Ges *Verticillium albo-atrum* নামক ছত্রাকদ্বয় ও *Pseudomonas solanacearum* নামক ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে টমেটো গাছের বিভিন্ন প্রকার ঢলে পড়া রোগ হয়।

Fusarium জনিত ঢলে পড়া রোগের ক্ষেত্রে চারা গাছের বয়স্ক পাতাগুলো নিচের দিকে বেঁকে ঢলে পড়ে। ধীরে ধীরে সমস্ত গাছ নেতিয়ে পড়ে ও মরে যায়।

লক্ষণ ঃ *Fusarium* জনিত ঢলে পড়া রোগের ক্ষেত্রে চারা গাছের বয়স্ক পাতাগুলো নিচের দিকে বেঁকে ঢলে পড়ে। ধীরে ধীরে সমস্ত গাছ নেতিয়ে পড়ে ও মরে যায়। বড় গাছে যে কোনো সময় এ রোগ হতে পারে। রোগের প্রারম্ভে গাছে নিচের দিক থেকে পাতা হলুদ হয়ে আসতে থাকে। প্রথম প্রথম কান্ডের একপাশের পাতা হলদে হয়ে আসতে থাকে এবং পরে অন্যান্য অংশ হলুদ হয়ে যায়। রোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমশঃ গাছের নিচের পাতা থেকে আরম্ভ করে উপরের পাতা হলদে হয়ে ঢলে পড়তে থাকে (চিত্র ৪১ দেখুন) এবং সবশেষে সম্পূর্ণ গাছটি মরে যায়। প্রায়ই অন্যান্য ডালে রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার আগেই একটি ডালকে মরতে দেখা যায়। গাছ ঢলে পড়লেও তার কান্ডে কোনো দাগ বা পচন দেখা যায় না। কিন্তু কান্ডের মধ্যে পানি সঞ্চালন নালিতে গাঢ় বাদামি রঙের দাগ দেখা দেয়। কান্ডে এ দাগ হওয়াটা এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এ রোগ নিরূপনের প্রধান সহায়ক। চিত্র ৪১ এ ফিউজেরিয়াম জনিত উইল্ট রোগে আক্রান্ত টমেটো গাছ দেখানো হয়েছে।



চিত্র ৪১ ঃ টমেটো ফিউজেরিয়াম উইল্ট রোগ
ডানে- গাছের একদিকের ডালের পাতা হলদে হয়ে ঢলে পড়ার পর্যায়
মাঝে- পাতার মধ্যশিরার একপাশের অনুফলক হলুদ হওয়ার পর্যায়
বামে- কান্ডস্থিত বাদামি রঙের পানি সঞ্চালন নালি

Verticillium জনিত উইল্ট রোগ অনেকটা *Fusarium* জনিত উইল্ট রোগের ন্যায়। এক্ষেত্রে গাছ দিনের বেলায় গরমের সময় ঢলে পড়ে আবার রাতে সজীব হয়ে ওঠে। প্রথমে বয়স্ক পাতায় লক্ষণ দেখা দেয় এবং ক্রমে উপরের দিকের অল্প বয়স্ক পাতায় লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে (চিত্র ৪২ দেখুন) এবং শুকিয়ে ঝরে পড়ে। অনুফলকে অনেক সময় V আকৃতির দাগ পড়ে। পাতা ঝরার সময় আগার

পাতাগুলোর কিনারা উপরের দিকে বেঁকে আসে তবে সজীব থাকে। *Verticillium* জনিত উইল্টের

একটি বৈশিষ্ট্য হলো এতে গাছের সকল ডালপালা সমভাবে আক্রান্ত হয় (*Fusarium* জনিত উইল্ট রোগে সব ডাল এক সঙ্গে ঢলে পড়ে না, একটি করে ডালে লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে এবং মৌসুম শেষ হওয়ার আগেই গাছ মরে যায়)। তবে সুস্থ ডালের ন্যায় ততটা সোজা হয়ে থাকতে পারে না। সাধারণত গাছ মরে না, পুরো মৌসুমেই বেঁচে থাকে কিন্তু গাছ খর্বাকৃতি হয় ও ফল ছোট হয়। রোগের শেষ অবস্থায় ডালের আগার দিকে মাত্র কয়েকটি পাতা সজীব থাকে। *Fusarium* জনিত উইল্ট রোগের ন্যায় কান্ডের মধ্যে টিস্যুতে বাদামি রঙের দাগ পড়ে, তবে এর রঙ অপেক্ষাকৃত গাঢ় হয়। চিত্র ৪২ এ টমেটো গাছের *Verticillium* উইল্ট রোগ দেখানো হয়েছে।



চিত্র ৪২ ঃ টমেটো গাছের *Verticillium* উইল্ট রোগ
উপরে- পাতার আগার দিক থেকে নিচের দিকে
ফ্যাকাশে-হলুদ দাগ হওয়ার পর্যায়
নিচে (ডানে)- সম্পূর্ণ গাছটি ঢলে পড়ার পর্যায়
(বামে)- কান্ডস্থিত বাদামি রঙের পানিসঞ্চালন নালী

Pseudomonas ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগে গাছের পাতা ও ডাঁটা খুব দ্রুত ঢলে পড়ে এবং গাছ মরে যায়। অনেক সময় মাঠের সব গাছ ঢলে পড়ে মরে যায় (চিত্র ৪৩ দেখুন)। গাছের পাতায় কোনো দাগ পড়ে না। প্রাথমিক অবস্থায় নিম্নাংশের কান্ড লম্বালম্বিভাবে চিরলে তার মজ্জার মধ্যে বাদামি রঙের দাগ দেখা যায় এবং চাপ দিলে সেখান থেকে ধূসর বর্ণের আঁঠালো পদার্থ বের হয়ে আসে। এ তরল পদার্থে

Pseudomonas ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগে গাছের পাতা ও ডাঁটা খুব দ্রুত ঢলে পড়ে এবং গাছ মরে যায়। অনেক সময় মাঠের সব গাছ ঢলে পড়ে মরে যায়।

অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া থাকে। রোগের শেষ অবস্থায় কান্ডের মধ্যবর্তী স্থান ফাঁপা হয়ে যায়। চিত্র ৪৩ এ ব্যাকটেরিয়াজনিত উইল্ট রোগে আক্রান্ত টমোটো গাছ দেখানো হয়েছে।



চিত্র ৪৩ ঃ টমেটোর ব্যাকটেরিয়াজনিত উইল্ট রোগ
বামে- সম্পর্ণ গাছ ঢলে পড়ার পর্যায়
মাঝে- কান্ডের মজ্জা বাদামি ও ফাঁপা
ডানে- সম্পর্ণ মাঠের গাছ ঢলে শুকিয়ে পড়ার পর্যায়

রুট-নট কৃমি মাটিতে থাকলে *Fusarium* জনিত উইল্ট রোগ বেশি হয়। সেজন্য কৃমিনাশক দিয়ে কৃমি ধ্বংস না করে কখনো টমেটোর চাষ করা উচিত নয়।

দমন ঃ ঢলে পড়া রোগ দমন করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। আক্রান্ত জমি বীজতলার জন্য কখনো ব্যবহার করা উচিত নয়। মাঠে দুএকটা গাছে রোগ দেখা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা উঠিয়ে নষ্ট করতে হবে। আক্রান্ত গাছ উঠানোর পর ঐ স্থানে চারা লাগাতে হলে সেখানকার মাটি ওষুধ দিয়ে শোধন করে নিতে হবে। রুট-নট কৃমি মাটিতে থাকলে *Fusarium* জনিত উইল্ট রোগ বেশি হয়। সেজন্য কৃমিনাশক দিয়ে কৃমি ধ্বংস না করে কখনো টমেটোর চাষ করা উচিত নয়। মাটিতে খুব অল্প পরিমাণে আগাছানাশক ২,৪-ডি প্রয়োগ করে গাছকে খর্বাকৃতি করতে পারলে রোগের প্রকোপ অনেকটা কমে। আসলে রোগ রোগপ্রতিরোধী জাতের চাষ ছাড়া ঢলে পড়া দমন করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ।

মোজাইক (Mosaic) পাতা কোকড়ানো রোগ

কারণ ঃ মোজাইক ভাইরাসজনিত রোগ। টমেটোতে টোবাকো মোজাইক ও কিউকাম্বার মোজাইক রোগ হয়ে থাকে। পাতা কোঁকড়ানো রোগ টমেটো লীফ কার্ল ভাইরাস দ্বারা হয়।

পাতা কোঁকড়ানো রোগের প্রধান লক্ষণ হলো আক্রান্ত গাছের পাতা লম্বালম্বি কুকড়ে যায় এবং পরে বটে যায়।

লক্ষণ ঃ টোবাকো মোজাইক রোগের দরুন পাতার অনুফলকে হালকা এবং গাঢ় সবুজ রঙের ছোপ ছোপ দাগ পড়ে এবং অনুফলকগুলো গুটিয়ে আসতে থাকে ও পাতা আয়তনে ছোট হয়। কান্ড এবং ফলেও নানা বর্ণের দাগের বিন্যাস ঘটে। ফল আকারে ছোট হয়। কিউকাম্বার মোজাইক ভাইরাসে গাছ খর্বাকৃতি হয় ও পাতা অত্যন্ত বেঁকে যায়। পাতা বিভিন্ন স্থানে খুব চিকন হয়ে বাড়তে থাকে। এ লক্ষণকে ‘Shoestring’ লক্ষণ বলা হয়। পাতা কোঁকড়ানো রোগের প্রধান লক্ষণ হলো আক্রান্ত গাছের পাতা লম্বালম্বি কুকড়ে যায় এবং পরে বটে যায়।

দমন ঃ ভাইরাসজনিত এসব রোগ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে মাটিতে পুঁতে বা পুড়িয়ে নষ্ট করতে হবে। মাঠে কাজ করার সময় নানাবিধ যন্ত্রপাতি এবং শরীরের ছোঁয়াচ লেগে রোগ এক গাছ থেকে অন্য গাছে ছড়ায় এবং সেজন্য প্রথমে সুস্থ গাছ নিয়ে কাজ করতে হয়। তামাকেও এ মোজাইক ভাইরাস থাকে এবং সেজন্য জমিতে কাজ করার সময় বিড়ি, সিগারেট খাওয়া

উচিত নয়। কারণ এদের মাধ্যামেও টমেটো গাছে এ রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে। টোবাকো মোজাইক ভাইরাস টমেটো বীজের বহিঃত্বকে সংক্রমণের মাধ্যমে বীজবাহিত হতে পারে। বপনের আগে পাঁচ মিনিট বীজগুলো ননি তোলা দুধে ডুবিয়ে রেখে ঐ ভাইরাস মুক্ত করা যায়। রোগের ভাইরাস শুকনো পাতা, কান্ড ও ফসলের পরিত্যক্ত অংশে বেশ কয়েক বছর বেঁচে থাকতে পারে। এ কারণে ক্ষেত যথাসম্ভব পরিষ্কার রাখতে হবে। জাবপোকা এ রোগ ছড়ায় বিধায় ক্ষেতে তাদেরকে দেখা যাওয়ার সাথে সাথে কীটনাশক ছিটাতে হবে।

শিকড় গিট (Root knot)

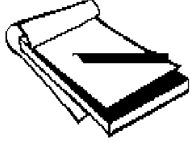
কারণ ঃ এ রোগ *Meloidogyne incognita* নামক কৃমির আক্রমণে হয়।

রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো শিকড়ে স্থানে স্থানে ছোট ছোট গোল আলুর মতো গিটের সৃষ্টি হওয়া। গিটগুলো একে অন্যের সাথে মিশে সমস্ত শিকড় ফুলে যায়।

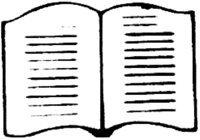


লক্ষণ ঃ মাটির উপরে গাছ হলুদ হয়ে আসতে থাকে এবং খর্বাকৃতি হয়। গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। অনেক ক্ষেত্রে গাছ মরে যায়। এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো শিকড়ে স্থানে স্থানে ছোট ছোট গোল আলুর মতো গিটের সৃষ্টি হওয়া। গিটগুলো একে অন্যের সাথে মিশে সমস্ত শিকড় ফুলে যায়। গিটযুক্ত অংশের উপরিভাগ এবড়ো থেবড়ো মনে হয়। লেন্স বা আতস কাঁচ দিয়ে দেখলে আক্রান্ত অংশের মধ্যে কৃমি ও ডিম দেখতে পাওয়া যায়। পরিণত অবস্থায় কৃমিকে নাসপাতির ন্যায় মনে হয়। চিত্র ৪৪ এ শিকড় গিট রোগে আক্রান্ত টমেটো গাছ দেখানো হয়েছে।

চিত্র ৪৪ ঃ টমেটো গাছের শিকড় গিট রোগ



অনুশীলন (অপঃরারঃ) : *টমেটোর Fusarium ও Verticillium wilt রোগের মধ্যকার পার্থক্য লিখুন।*



সারমর্ম ঃ এ পাঠে টমেটো গাছের ছত্রাকজনিত লেইট ব্লাইট ও ঢলে পড়া রোগ, ব্যাকটেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ, ভাইরাসজনিত মোজাইক রোগ ও কৃমজনিত শিকড় গিঁট রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ব্লাইট রোগে পাতা বাদামি হয়ে পচে যায়। পাতা থেকে রোগ কান্ড ও ফলে ছড়ায়। কান্ডে কালো দাগ হয়ে স্থানে স্থানে ভেঙ্গে পড়ে। ফিউজেরিয়ামজনিত ঢলে পড়া রোগে নিচের দিক থেকে পাতা হলদে হয়ে আসে এবং প্রথম দিকে কান্ডের একপাশের ডাল ঢলে পড়ে। ক্রমে সম্পূর্ণ গাছ ঢলে পড়ে শুকিয়ে মরে যায়। কান্ডে পানি সঞ্চালন নালি বাদামি রঙ ধারণ করে। ব্যাকটেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগে খুব দ্রুত ক্ষেতের সব গাছ ঢলে পড়ে। ঢলে পড়া রোগ দমনে আক্রান্ত গাছ দেখামাত্র উঠিয়ে নষ্ট করতে হবে, কৃমিনাশক দিয়ে ক্ষেতের কৃমি ধ্বংস করতে হবে এবং রোগপ্রতিরোধী জাতের গাছ লাগাতে হবে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। কোন্ জীবাণু দ্বারা টমেটোর লেইট ব্লাইট রোগ হয়?

ক) *Phytophthora palmivora*
খ) *Phytophthora infestans*
গ) *Phytophthora parasitica*
ঘ) *Phytophthora colocasiae*

২। লেইট ব্লাইট রোগের প্রাথমিক লক্ষণ কোন্টি?

ক) কচি পাতায় কালচে পানিভেজা আঁকাবাঁকা দাগ পড়া
খ) বয়স্ক পাতায় কালচে পানিভেজা আঁকাবাঁকা দাগ পড়া
গ) পাতায় বাদামি রঙের গোলাকার দাগ পড়া
ঘ) পাতায় হলুদ বলয় দ্বারা ঘেরা বাদামি রঙের দাগ পড়া

৩। *Fussarium* জনিত ঢলে পড়া রোগের প্রাথমিক লক্ষণ কোন্টি?

ক) কান্ডের নিচের দিক থেকে একপাশের পাতা হলুদ হয়ে আসতে থাকে
খ) গাছে উপরের দিক থেকে পাতা হলুদ হয়ে আসে
গ) কান্ডের উভয়পাশের পাতা হলুদ হয়ে আসতে থাকে
ঘ) কান্ডের সব ডাল ও পাতা দ্রুত ঢলে পড়তে থাকে

৪। *Fusarium* জনিত ঢলে পড়া রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

ক) কান্ডে উপত্বকের নিচের টিস্যু বাদামি রঙ ধারণ করে
খ) কান্ডে ফ্লোয়েম টিস্যু গাঢ় বাদামি রঙ ধারণ করে
গ) কান্ডে জাইলেম টিস্যুতে গাঢ় বাদামি রঙের দাগ পড়ে
ঘ) কান্ডে জাইলেম টিস্যু হলুদ হয়ে যায়

৫। নিচের কোন্ ফসলের সাথে শস্যপর্যায় অবলম্বন করে টমেটোর শিকড় গিট রোগ দমনের চেষ্টা করা হয়?

ক) ধান
খ) পাট
গ) পেঁয়াজ
ঘ) বেগুন

৬। টমেটোর মোজাইক রোগ কীভাবে বিস্তারলাভ করে?

ক) বীজের মাধ্যমে
খ) জাব পোকার মাধ্যমে
গ) পানির মাধ্যমে
ঘ) বাতাসের মাধ্যমে

পাঠ ৪.৩ ঢেঁড়শ গাছের রোগ



এ পাঠ শেষে আপনি –

- ঢেঁড়শ গাছের কয়েকটি ক্ষতিকর রোগের জীবাণুর নাম বলতে ও লিখতে পারবেন।
- রোগসমূহের লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- এসব রোগের দমন পদ্ধতি আলোচনা করতে পারবেন।



হলদে মোজাইক (Yellow mosaic)

কারণ ঃ এক প্রকার ভাইরাসের সংক্রমণে এ রোগ হয়।

হলদে মোজাইক রোগের প্রাথমিক অবস্থায় পাতায় শিরাগুলো হলদে হয়ে যায় কিন্তু দুশিরার মধ্যবর্তী অংশ সবুজ থাকে।

লক্ষণ ঃ যে কোনো বয়সের গাছে এ রোগ হতে পারে। হলদে মোজাইক রোগের প্রাথমিক অবস্থায় পাতায় শিরাগুলো হলদে হয়ে যায় কিন্তু দুশিরার মধ্যবর্তী অংশ সবুজ থাকে। এর ফলে শিরাগুলোকে স্পষ্ট দেখায়। রোগের প্রকোপ বেশি হলে কচি পাতাগুলো সম্পূর্ণ হলুদ বর্ণ ধারণ করে বা আগার দিকের পাতা ফ্যাকাশে সাদা হয়ে যায়, পাতা ছোট এবং বেটে হয়। গাছে ফুল আসতে বিলম্ব হয় এবং কম আসে। গাছে ঢেঁড়শ হলেও তা ছোট, শক্ত এবং ফ্যাকাশে সাদা হয়। এসব ঢেঁড়শের উপরটা এবড়ো থেবড়ো দেখায়। ফলে তার আকৃতি খারাপ হয়ে যায়। চিত্র ৪৫ এ মোজাইক রোগে আক্রান্ত ঢেঁড়শ গাছ দেখানো হয়েছে।



দমন ঃ ক্ষেতে রোগাক্রান্ত গাছ প্রাথমিক অবস্থায় তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হয়। এর ফলে জমিতে রোগের আক্রমণ কম হয়। এ রোগ *Bemisia tabaci* নামক পতঙ্গ মারফত বিস্তার লাভ করে। এ জন্য কীটনাশক ওষুধ মাঝে মাঝে ছিটিয়ে পোকা দমন করতে হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে কোনো কোনো ঢেঁড়শ গাছে এ রোগ হতে দেখা যায় না বা হলেও শেষ বয়সে হয়। অতএব, এসব রোগপ্রতিরোধী জাতের ঢেঁড়শের চাষ করলে রোগ দমন সহজতর হয়।

চিত্র ৪৫ ঃ ঢেঁড়শের হলদে মোজাইক রোগ
(হলুদ শিরাযুক্ত পাতা লক্ষণীয়)

পাতার দাগ (Leaf spot)

Alternaria hibiscinum নামক ছত্রাকের আক্রমণে পাতায় বিভিন্ন আয়তনের গোলাকার, বাদামি ও চক্রাকারে রেখাযুক্ত দাগ উৎপন্ন হয়।

কারণ ঃ কয়েক প্রকার ছত্রাকের আক্রমণে ঢেঁড়শ গাছের পাতায় দাগের সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে *Alternaria, Cercospora* এবং *Phyllosticta* উল্লেখযোগ্য।

লক্ষণ ঃ *Alternaria hibiscinum* নামক ছত্রাকের আক্রমণে পাতায় বিভিন্ন আয়তনের গোলাকার, বাদামি ও চক্রাকারে রেখাযুক্ত দাগ উৎপন্ন হয়। দাগে কালো গুড়োর ন্যায় জীবাণুর উপস্থিতি দেখা যায়। সাধারণত দুর্বল গাছে এ রোগ বেশি হয়।

Cercospora malayensis দ্বারা আক্রান্ত পাতায় লালচে রঙের কিনারাযুক্ত ধূসর বর্ণের দাগ উৎপন্ন হয়।

Phyllosticta hibiscinum ছত্রাক বড় বড় দাগ উৎপন্ন করে। এ দাগের মধ্যস্থল ধূসর বর্ণের হয়। পাতার উভয় পার্শ্বে ছত্রাকের কালো কালো পিকনিডিয়া উৎপন্ন হতে দেখা যায়।

দমন ঃ এ রোগগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে দমনের বিশেষ কোনো প্রচেষ্টা নেয়া হয় না। তবে রোগ দেখা দিলে ডায়থেন এম-৪৫, রোভরাল প্রভৃতি ছত্রাকনাশক ছিটানে হয়।

এনথ্রাকনোজ রোগ

কারণ ঃ ঢেঁড়শের এনথ্রাকনোজ রোগ *Colletotrichum dematium* নামক ছত্রাকের আক্রমণে হয়।

লক্ষণ ঃ এনথ্রাকনোজ রোগে প্রাথমিক অবস্থায় ঢেঁড়শের উপরে আগার দিকে বা স্থানে স্থানে বাদামি দাগ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ক্রমে ঐ দাগ বিস্তৃত হয়ে গোটা ঢেঁড়শ কালচে হয়ে যায়। আক্রান্ত ঢেঁড়শের খোসার ওপর অসংখ্য কালো কালো বিন্দু দেখতে পাওয়া যায়। এসব বিন্দু ছত্রাকের স্পোর ধারক এসারভুলাস দ্বারা গঠিত। হাত আতস কাঁচ (hand lense) দ্বারা এসব বিন্দুকে দেখলে তাতে কালো রঙের কাঁটার মতো এক প্রকার অঙ্গ বা সিটা পাওয়া যায়। সিটা এ রোগের ছত্রাকের একটি বৈশিষ্ট্য। রোগ বেশি হলে ঢেঁড়শ নষ্ট হয়ে যায় ও খাওয়ার অনুপোযুক্ত হয়ে পড়ে। চিত্র ৪৬ এ এনথ্রাকনোজ রোগে আক্রান্ত ঢেঁড়শ দেখানো হয়েছে।

এনথ্রাকনোজ একটি বীজবাহিত রোগ। এজন্য রোগমুক্ত এলাকা থেকে বীজ সংগ্রহ করে ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধন করার পর জমিতে লাগাতে হবে।

দমন ঃ এনথ্রাকনোজ একটি বীজবাহিত রোগ। এজন্য রোগমুক্ত এলাকা থেকে বীজ সংগ্রহ করে ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধন করার পর জমিতে লাগাতে হবে। গাছে ঢেঁড়শ হওয়ার পর ডায়থেন এম-৪৫, রোভরাল অথবা অন্য কোনো ছত্রাকনাশক কয়েকবার স্প্রে করতে হবে। বিশেষ করে বীচনের জন্য রক্ষিত ঢেঁড়শে স্প্রে অত্যাবশ্যক।

চিত্র ৪৬ ঃ ঢেঁড়শের এনথ্রাকনোজ রোগ
ডানে- ঢেড়শের আগার দিকে বাদামি লম্বাটে দাগ
(রোগের প্রাথমিক পর্যায়)
বামে- ঢেড়শের কালো বর্ণ ধারণ (রোগের শেষের দিকের পর্যায়)

সারমর্ম ঃ ঢেঁড়শ গাছের রোগের মধ্যে হলদে মোজাইক খুবই মারাত্তক রোগ। এ রোগে পাতায় শিরা হলদে হয়ে যায়। এনথ্রাকনোজ রোগে ঢেঁড়শ কালচে হয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মোজাইক রোগ দমনে কীটনাশক ছিটাতে হবে ও রোগ সহনশীল জাতের ঢেঁড়শের চাষ করতে হবে। এনথ্রাকনোজ রোগ দমনে রোগমুক্ত এলাকার বীজ শোধন করে বপন করতে হবে এবং প্রয়োজন অনুসারে ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৩



সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। ঢেঁড়শের হলদে মোজাইক রোগের লক্ষণ কোন্‌টি?

ক) পাতার শিরাগুলো হলদে হয়ে যায় কিন্তু দুশিরার মধ্যবর্তী অঞ্চল সবুজ থাকে

খ) পাতার শিরাগুলো হলদে হয়ে যায় কিন্তু দুশিরার মধ্যবর্তী অঞ্চল বাদামি হয়ে যায়

গ) পাতার শিরাগুলো হলদে হয়ে যায় কিন্তু দুশিরার মধ্যবর্তী অঞ্চল মরিচা রঙ ধারণ করে

ঘ) পাতার শিরাগুলো বাদামি হয়ে যায় কিন্তু দুশিরার মধ্যবর্তী অঞ্চল হলুদ বর্ণ ধারণ করে

২। হলুদ মোজাইক রোগে ঢেঁড়শ গাছে ফুল কেমন হয়?

ক) ফুল আগে আসে ও কম হয়

খ) ফুল আগে আসে ও বেশি হয়

গ) ফুল বিলম্বে হয় এবং কম হয়

ঘ) ফুল বিলম্বে হয় এবং বেশি হয়

৩। ঢেঁড়শ গাছে *Alternaria* কী ধরনের দাগ সৃষ্টি করে?

ক) মাকুর মতো ধ সর বর্ণের

খ) গোলাকার বাদামি বর্ণের

গ) গোলাকার, বাদামি ও চক্রাকার রেখাযুক্ত

ঘ) গোলাকার, বাদামি ও হলুদ বলয়যুক্ত

৪। ঢেঁড়শের হলদে মোজাইক রোগ দমনার্থে কী করা উচিত?

ক) বীজকে শোধন করে বপন করতে হবে

খ) গাছের পরিত্যক্ত অংশ নষ্ট করতে হবে

গ) জমিতে নাইট্রোজেন সার কম দিতে হবে

ঘ) কীটনাশক ছিটিয়ে ভাইরাসবাহক পোকা ধ্বংস করতে হবে

পাঠ ৪.৪ কুমড়া গাছের রোগ



এ পাঠ শেষে আপনি–

- কুমড়া গাছের কতিপয় রোগের জীবাণুর নাম বলতে ও লিখতে পারবেন।
- বর্ণিত রোগসমূহের লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রোগের দমন পদ্ধতি সম্বন্ধে বলতে ও লিখতে পারবেন।



পাউডারি মিলডিউ (Powdery mildew)

কারণ ঃ কুমড়া গাছের পাউডারি মিলডিউ রোগ *Erysiphe cichoracearum* নামক ছত্রাকের আক্রমণে হয়।

লক্ষণ ঃ গাছে নিচের বয়স্ক পাতায় প্রথমে ছোট ছোট ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত সাদা সাদা গুঁড়োযুক্ত ফোলা ফোলা গোলাকার দাগ সৃষ্টি হয়। পাতার নিচ থেকে দাগগুলোকে ঈষৎ হলদে মনে হয়। রোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে দাগ বাদামি রঙ ধারণ করতে থাকে। অবশেষে পাতা নিস্তেজ হয়ে মরে শুকিয়ে যায়।

শুকনো ও ঠান্ডা আবহাওয়ায় রোগের প্রকোপ বেশি হয় এবং গাছের লতা ও কান্ডও আক্রান্ত হয়ে প্রথমে সাদা ও পরে বাদামি হয়ে যায়।

পাউডারি মিলডিউ রোগ দমনের জন্য ভোরে শিশির থাকা অবস্থায় গাছে খুব মিহি গন্ধক গুঁড়ো ছড়াতে হয়।

দমন ঃ পাউডারি মিলডিউ রোগ দমনের জন্য ভোরে শিশির থাকা অবস্থায় গাছে খুব মিহি গন্ধক গুঁড়ো ছড়াতে হয়। মিলডেক্স, ডাইনোক্যাপ, কেরাথেন প্রভৃতি ওষুধ পানির সাথে মিশিয়ে প্রতি মাসে ২-৩ বার করে ছিটিয়েও ভালো ফল পাওয়া যায়।

ঢলে পড়া (Wilt)

রোগের কারণ ঃ *Erwinia tracheiphila* নামক ব্যাকটেরিয়ার অথবা *Fusarium oxysporum* নামক ছত্রাকের আক্রমণে কুমড়ার এ রোগ হয়।

লক্ষণ ঃ ব্যাকটেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগে প্রাথমিকভাবে একটি একটি করে গাছের পাতা ঢলে পড়তে থাকে। ক্রমে একদিকের ডালের পাতা থেকে আরম্ভ করে সম্পূর্ণ গাছটি ঢলে পড়ে। ঢলে পড়া গাছটি রাতে কিছুটা সতেজ হয়ে উঠে কিন্তু পরবর্তীতে দিনের বেলায় রোদে আবার ঢলে পড়ে এবং কিছু দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ গাছটি মরে যায়। গাছ মরার পূর্ব পর্যন্ত পাতায় কোনো প্রকার দাগ পড়ে না। রোগের প্রাথমিক অবস্থায় কান্ডের গোড়ার দিক লম্বালম্বিভাবে চিরে ফেলে তার মধ্যে গাঢ় বাদামি-কালচে দাগ দেখতে পাওয়া যায়। আড়াআড়িভাবে কেটে কান্ডকে চাপ দিলে ভাসকুলার টিস্যু থেকে সাদাটে তরল আঁঠালো পদার্থ বের হয়ে আসে। এ তরল পদার্থে অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া থাকার জন্য হাত দিয়ে স্পর্শ করলে আঁঠালো ও চটচটে মনে হয়। ভাসকুলার টিস্যুতে আঁঠালো পদার্থ তৈরি হওয়া ব্যাকটেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ভাসকুলার টিস্যুতে আঁঠালো পদার্থ তৈরি হওয়া ব্যাকটেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

Fusarium জনিত ঢলে পড়া রোগে গাছে লতার বৃদ্ধি কমে যায় এবং পাতাসহ লতা হলদে হয়ে ঢলে পড়ে এবং শুকিয়ে মরে যায়। মাটিসংলগ্ন স্থানে কান্ডের একপাশে প্রথমে পানিভেজা দাগ পড়ে। ক্রমে ঐ দাগ হলুদ ও গাঢ় বাদামি রঙ ধারণ করে। গাছের একপাশের লতায় প্রথম লক্ষণ দেখা দেয়াটা এ রোগের বৈশিষ্ট্য। আক্রান্ত অংশ লম্বালম্বিভাবে কাটলে তার পানি সঞ্চালন নালীতে বাদামি রঙের দাগ দেখতে পাওয়া যায়।

*Fusarium*জনিত ঢলে পড়া রোগ দমনার্থে আক্রান্ত গাছ দেখামাত্রই উঠিয়ে নষ্ট করতে হবে ও মাটি ৪% ফরমালিন দ্রবণ দিয়ে ভিজিয়ে ছত্রাককে ধ্বংস করার চেষ্টা করতে হবে।

দমন ঃ ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের ব্যাকটেরিয়া কিউকাম্বার বিটল-এ বেঁচে থাকে এবং খাদ্য আহরণের সময় গাছে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ করে। এ কারণে বাহক বিটল কীটনাশক স্প্রে করে ধ্বংস করাই এ রোগের প্রধান দমন ব্যবস্থা। এছাড়া আক্রান্ত গাছ চেনা মাত্রই উঠিয়ে নষ্ট করতে হবে।

Fusarium জনিত ঢলে পড়া রোগ দমনার্থে আক্রান্ত গাছ দেখামাত্রই উঠিয়ে নষ্ট করতে হবে এবং সেখানকার মাটি ৪% ফরমালিন দ্রবণ দিয়ে ভিজিয়ে ছত্রাককে ধ্বংস করার চেষ্টা করতে হবে। রোগাক্রান্ত জমিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিও অন্যত্র ব্যবহার করার আগে ফরমালিনে শোধন করে নেওয়া উচিত।

মোজাইক (Mosaic)

কারণ ঃ কিউকাম্বার মোজাইক ভাইরাস দ্বারা এ রোগ হয়।

মোজাইক রোগে বয়স্ক গাছের পাতায় হলুদ ও সবুজের ছিট ছিট দাগের নক্সা দেখা যায় কিন্তু শিরা সবুজ থাকে।

লক্ষণ ঃ চারা গাছ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন বয়সের গাছে এ রোগ হতে পারে। বীজপত্রী পর্যায়ে চারাগাছ আক্রান্ত হলে গাছ বাড়ে না, বীজপত্রী ঢলে কিংবা হলদে হয়ে গাছটি মরে যায়। বয়স্ক গাছের পাতায় হলুদ ও সবুজের ছিট ছিট দাগের নক্সা দেখা যায় কিন্তু শিরা সবুজ থাকে। পাতা ছোট হয় এবং কুকড়ে যায়। পাতার কিনারাগুলো আঁকাবাঁকা হয়ে কুকড়ে যায়। পাতা কোকড়ানো অংশে সবুজ রঙের ফোস্কার মতো উচু হয়ে ওঠে। কুমড়ায় হালকা সবুজ অথবা সাদা ছোপ ছোপ দাগ ফোস্কার মতো উঁচু হয়ে গাঢ় সবুজ দাগের মধ্যে ছড়িয়ে মোজাইক নক্সার সৃষ্টি করে। লতার আগার দিকের পর্বমধ্য স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি না পাওয়ায় ঐ স্থানে অনেক পাতা গুচ্ছাকারে অবস্থান করে রোসেটিং লক্ষণ সৃষ্টি করে। এ রোগের ভাইরাস বীজবাহিত। মাঠে রোগটি এফিড ও কিউকাম্বার বিটল (১২ দাগ যুক্ত) দ্বারা ছড়ায়। কুমড়া আহরণের সময় ক্ষেতমজুরের হাতের নাড়াচাড়ার মাধ্যমে ভাইরাস বিভিন্ন গাছে বিস্তার লাভ করে।

দমন ঃ রোগটি বীজবাহিত হওয়ায় বীজকে ৫৫° সে. উষ্ণতায় এক ঘন্টা রেখে বীজের মধ্যস্থিত ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করা হয়। রোগের বিস্তার রোধকল্পে কীটনাশক স্প্রে করে ক্ষেতের বিটিল এবং জাব পোকা ধ্বংস করতে হয়।

এনথ্রাকনোজ (Anthracnose)

কারণ ঃ এ রোগ *Colletotrichum lagenarium* নামক ছত্রাকের আক্রমণে হয়।

এনথ্রাকনোজ রোগের শেষ পর্যায়ে আক্রান্ত অংশের টিস্যুতে স্থানে স্থানে গোলাকার, লম্বাটে বিভিন্ন আকারের ফাটল সৃষ্টি হতে দেখা যায়।



লক্ষণ ঃ এ রোগে পাতায় প্রথমে পানিভেজা দাগের আবির্ভাব হয়। ক্রমে দাগ বড় ও হলদে হয়ে বাদামি রঙ ধারণ করে। শেষ পর্যায়ে আক্রান্ত অংশের টিস্যুতে স্থানে স্থানে গোলাকার, লম্বাটে বিভিন্ন আকারের ফাটল সৃষ্টি হতে দেখা যায়। পাতার বৃন্ত ও লাতাকান্ডে প্রথমে লম্বা ধরনের পানিভেজা ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এ ক্ষত পরবর্তীতে বাদামি রঙ ধারণ করে। কচি কচি কুমড়াও রোগে আক্রান্ত হয়ে মরে যায়। বয়স্ক কুমড়ায় বড় আকারের কালো কিনারাযুক্ত ডুবা (Sunken) দাগের সৃষ্টি হয়। এসব দাগের মাঝে ঘিয়ে-পীত বর্ণের এক প্রকার আঁঠালো পদার্থ জমতে দেখা যায়। চিত্র ৪৭ এ এনথ্রাকনোজ রোগে

চিত্র ৪৭ ঃ কুমড়া গাছের এনথ্রাকনোজ রোগ
উপরে- রোগের প্রাথমিক পর্যায়ের দাগ
নিচে- রোগের শেষের দিকের পর্যায়ের দাগ

আক্রান্ত কুমড়া গাছ দেখানো হয়েছে।

দমন ঃ ছত্রাক বীজ ও গাছের পরিত্যক্ত অংশে অবসর যাপন করে বেঁচে থাকে এবং পানির ছিটায় ছড়ায়। এ কারণে বীজ লাগানোর আগে ব্রাসিকল অথবা ক্যাপটান (প্রতি কেজি বীজে ২৫ গ্রাম) দ্বারা শোধন করে নিতে হবে। ফসল তোলার পর তার যাবতীয় পরিত্যক্ত অংশসমূহ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। গাছে কুমড়া ধরার পর মাঝে মাঝে ডায়থেন এম-৪৫ বা ব্যাভিস্টিন পানিতে মিশিয়ে (প্রতি লিটারে ১ গ্রাম) স্প্রে করতে হবে।



সারমর্ম ঃ পাউডারি মিলডিউ রোগে কচি পাতায় ফোলা ফোলা সাদা গুড়োযুক্ত দাগ পড়ে, ফিউজেরিয়ামজনিত ঢলে পড়া রোগে গাছের এক পাশের পাতা প্রথমে ঢলে পড়ে এবং ক্রমে অন্যান্য লতায় রোগ ছড়িয়ে সম্পূর্ণ গাছ ঢলে মরে যায়। মোজাইক রোগে পাতায় হলুদ ও সবুজ রঙের ছিটা ছিটা দাগ পড়ে এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগে সম্পূর্ণ গাছ দ্রুত ঢলে পড়ে শুকিয়ে মরে যায়। ছত্রাকনাশক ছিটিয়ে মিলডিউ ও এনথ্রাকনোজ রোগ দমন করতে হয়। কীটনাশক ছিটিয়ে মোজাইক রোগ এবং রোগ সঞ্চলনশীল জাতের গাছ লাগিয়ে ও শস্য পর্যায়ে অন্যান্য ফসল চাষ করে ঢলে পড়া রোগ দমন করা হয়।



পাঠোত্তর ম ল্যায়ন ৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কুমড়া গাছের পাউডারি মিলডিউ রোগের প্রাথমিক লক্ষণ কোন্‌টি?
- ক) কচি পাতায় ফোলা ফোলা সাদা গুড়োযুক্ত দাগ পড়ে
- খ) কচি পাতায় ফোলা ফোলা বাদামি গুড়োযুক্ত দাগ পড়ে
- গ) কচি পাতায় ডুবা ধরনের বাদামি দাগ পড়ে
- ঘ) কচি পাতায় ডুবা ধরনের কালচে দাগ পড়ে

২। পাউডারি মিলডিউ রোগের শেষ পর্যায়ে সাদা গুঁড়োযুক্ত দাগের রঙ কী ধরনের হয়?
- ক) সাদাই থেকে যায়
- খ) কালচে হয়ে যায়
- গ) বাদামি হয়ে যায়
- ঘ) লালচে হয়ে যায়

৩। ব্যাকটেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগে ভাসকুলার টিস্যুর রঙ কেমন দেখায়?
- ক) পীত বর্ণ
- খ) হলুদ বর্ণ
- গ) বাদামি বর্ণ
- ঘ) গাঢ় বাদামি-কালচে বর্ণ

৪। ব্যাকটেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ দ্বারা আক্রান্ত গাছের কর্তিত কান্ড চাপ দিলে কী ধরনের রস বের হয়?
- ক) কালচে রঙের রস
- খ) হলদে রঙের রস
- গ) বাদামি রঙের রস
- ঘ) সাদাটে তরল আঁটালো রস

৫। ফিউজেরিয়ামজনিত ঢলে পড়া রোগের বৈশিষ্ট্য কোন্‌টি?
- ক) সম্পূর্ণ গাছের লতা একসঙ্গে ঢলে পড়ে
- খ) গাছের আগার দিকের লতা ঢলে পড়ে
- গ) গাছের একপাশের লতা ঢলে পড়ে
- ঘ) গাছের গোড়ার দিকে লতা ঢলে পড়ে

৬। কুমড়ার মোজাইক রোগের লক্ষণ কোন্‌টি?
- ক) বয়স্ক গাছের লতা হলদে হয়ে যায়
- খ) বয়স্ক গাছের লতায় হলুদ ও সবুজের ছিটা দাগ পড়ে
- গ) চারা গাছের পাতা হলদে হয়ে যায়
- ঘ) চারা গাছের পাতা বাদামি হয়ে যায়

পাঠ ৪.৫ শিম গাছের রোগ



এ পাঠ শেষে আপনি –

- শিম গাছের কয়েকটি রোগের কারণ বলতে ও লিখতে পারবেন।
- শিম গাছের রোগসমূহের লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিম গাছের রোগের দমন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলতে ও লিখতে পারবেন।



মোজাইক (Mosaic)

কারণ ঃ শিম গাছের মোজাইক রোগ একটি ভাইরাসজনিত রোগ।

মোজাইক আক্রান্ত শিম গাছের পাতায় পর পর হালকা ও গাঢ় সবুজ এবং হলদে রঙের দাগ পড়ে।

লক্ষণ ঃ মোজাইক আক্রান্ত শিম গাছের পাতায় পর পর হালকা ও গাঢ় সবুজ এবং হলদে রঙের দাগ পড়ে। গাঢ় সবুজ অংশ হালকা সবুজ অংশ থেকে দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এর ফলে পাতা কুঁচকে যায়। এ কুঞ্চন পাতার মধ্যশিরা বরাবরই বেশি হয় এবং কিনারা নিচের দিকে বেঁকে যায়। এ রোগে গাছ মরে না এবং মৌসুমের শেষ পর্যন্ত এভাবেই বেঁচে থাকে। মৌসুমের শেষের দিকে রোগ হলে কেবল কচি কচি পাতা কুঞ্চিত হয় কিন্তু অন্যান্য অংশ সুস্থ মনে হয় এবং স্বাভাবিকভাবে শিম হয়। কিন্তু মৌসুমের প্রারম্ভে রোগ হলে গাছে কদাচিৎ শিম ধরে। চিত্র ৪৮ এ মোজাইক রোগে আক্রান্ত ছিম গাছ দেখানো হয়েছে।



দমন ঃ বীজে ভাইরাস সজীব থাকে। এ কারণে রোগমুক্ত এলাকা থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে দূরে নষ্ট করে ফেলতে হবে। জাব পোকা দ্বারা এ রোগ বিস্তৃত হয় বিধায় কীটনাশক স্প্রে করে ঐ পোকা ধ্বংস করতে হবে। এছাড়া রোগ সহনশীল জাতের গাছের বীজ লাগানোর চেষ্টা করতে হবে।

চিত্র ৪৮ ঃ শিম গাছের মোজাইক রোগ
(পাতায় হলুদ ও সবুজ রঙের ছোপ ছোপ দাগ লক্ষণীয়)

এনথ্রাকনোজ (Antharacnose)

কারণ ঃ *Colletotrichum lindemuthianum* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়।

এনথ্রাকনোজ রোগে আক্রান্ত শিম গাছের পাতার বৃন্ত ও কান্ডে কালো কালো ডুবা (Sunken) ধরনের দাগ হয়। অনেক স্থানে আক্রান্ত পাতা ও ডগা ভেঙ্গে পড়ে।

লক্ষণ ঃ যে কোনো বয়সের গাছে এ রোগ হতে পারে। পাতা আক্রান্ত হলে উপরে লাল বা কালো রঙের দাগ পড়ে। পাতার বৃন্ত ও কান্ডে কালো কালো ডুবা (Sunken) ধরনের দাগ হয়। অনেক স্থানে আক্রান্ত পাতা ও ডগা ভেঙ্গে পড়ে। শিমের ওপর বাদামি রঙের আঁকাবাঁকা দাগ হয় এবং ত্বকে কিছুটা ডুবা অবস্থায় থাকে। শুকনো আবহাওয়ায় শিমের বীজে কালো কালো দাগ উৎপন্ন হয়। একাধিক দাগ পরস্পরের সঙ্গে মিশে বীজাবরণের অর্ধেক অংশ ঢেকে ফেলে। চিত্র ৪৯ এ এনথ্রাকনোজ রোগে আক্রান্ত শিম গাছ দেখানো হয়েছে।



চিত্র ৪৯ ঃ শিমের এনথ্রাকনোজ রোগ
(কালচে দাগযুক্ত পাতা)

দমন ঃ বীজ ও ফসলের পরিত্যক্ত অংশে ছত্রাক বেঁচে থাকে এবং পরবর্তী মৌস মে রোগ সংক্রমণ ঘটায় বিধায় রোগমুক্ত এলাকা থেকে নীরোগ ও সুস্থ বীজ সংগ্রহ করে ছত্রাকনাশক দিয়ে শোধনের পর বপন করতে হবে। শস্য আহরণের পর পরিত্যক্ত অংশসমূহ সংগ্রহ করে অন্যত্র নষ্ট করতে হবে। গাছে রোগ দেখা দিলেই সঙ্গে সঙ্গে ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে।

পাতার দাগ (Leaf spot)

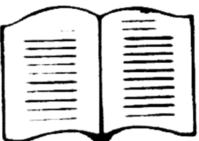
কারণ ঃ *Cercospora cruenta* এবং *Alternaria tenuis* নামক ছত্রাকদ্বয়ের আক্রমণে পাতার দাগ ধরা রোগ হয়।

লক্ষণ ঃ *Cercospora* জনিত রোগে পাতার উপর আঁকাবাঁকা ছোট ছোট কালচে বাদামি রঙের দাগ হয়। কিন্তু আক্রান্ত অংশের নিচের দিক ধূসর বর্ণ মনে হয়। রোগ বেশি হলে ডালপালায় এবং শিমেও এ ধরনের দাগ হতে দেখা যায়। অনেক সময় আক্রান্ত গাছের অনেক শিমও ঝরে পড়ে।

Alternaria জনিত দাগ প্রাথমিকভাবে ছোট, আঁকাবাঁকা ও লালচে-বাদামি রঙের হয়। দাগ বড় হওয়ার সাথে সাথে গোলাকার হয়ে যায় এবং দাগের মধ্যে অনেকগুলো বৃত্তাকার রেখা বেশ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বয়স্ক দাগের মধ্যভাগ ধূসর ও কিনারা কালো রঙ ধারণ করে। অনেক সময় এসব দাগের মাঝখানটা খসে পড়ে ছিদ্রের সৃষ্টি করে। দাগের এ ধরনের ছিদ্রকে “শট হোল” বলে। বেশি আক্রান্ত গাছের পাতা মরে যায় এবং মাঝে মাঝে কান্ডে এবং পাতার বোঁটায়ও ছোট লম্বাটে ধরনের দাগ হয়।

Cercospora জনিত রোগে পাতার উপর আঁকাবাঁকা ছোট ছোট কালচে বাদামি রঙের দাগ হয়। কিন্তু *Alternaria* জনিত দাগ প্রাথমিকভাবে ছোট, আঁকাবাঁকা ও লালচে-বাদামি রঙের হয়।

দমন ঃ রোগসহনশীল জাতের শিমের বীজ সংগ্রহ করে চাষ করার চেষ্টা করতে হবে। মাঠে রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ছত্রাকনাশক কয়েকবার স্প্রে করতে হবে।



সারমর্ম ঃ এনথ্রাকনোজজনিত দাগ কিছুটা ডুবা ধরনের হয়। ভাইরাস দ্বারা পাতায় সবুজ ও হলদে রঙের দাগ হয়। সুস্থ বীজ সংগ্রহ ও শোধন করে এবং ওষুধ স্প্রে করে বিভিন্ন দাগজনিত ও

এনথ্রাকনোজ রোগ দমন করতে হয়। মোজাইক রোগ দমনে রোগমুক্ত এলাকার বীজ বপন করতে হবে এবং কীটনাশক ছিটিয়ে জাব পোকা ধ্বংস করতে হবে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। শিমের মোজাইক রোগে পাতায় কী রকম দাগ পড়ে?

- ক) পরপর হালকা ও গাঢ় সবুজ রঙের
- খ) পরপর হালকা ও গাঢ় বাদামি রঙের
- গ) পরপর হালকা ও গাঢ় হলুদ রঙের
- ঘ) পরপর হালকা হলুদ ও গাঢ় বাদামি রঙের

২। এনথ্রাকনোজ রোগে শিমে কী ধরনের দাগ উৎপন্ন হয়?

- ক) হলুদ গোলাকার দাগ
- খ) বাদামি গোলাকার দাগ
- গ) বাদামি ও আঁকাবাঁকা কিছুটা ডুবা ধরনের দাগ
- ঘ) কালচে আঁকাবাঁকা দাগ

৩। শিমের *Cercospora* জনিত রোগের দাগের বৈশিষ্ট্য কোন্‌টি?

- ক) পাতায় আঁকাবাঁকা কোনাচে গাঢ় বাদামি দাগ পড়া
- খ) পাতায় আঁকাবাঁকা কোনাচে লালচে দাগ পড়া
- গ) পাতায় কোনাচে পানিভেজা দাগ পড়া
- ঘ) পাতায় গোলাকার বাদামি দাগ পড়া

৪। শিমের *Alternaria* জনিত দাগের বৈশিষ্ট্য কোন্‌টি?

- ক) পাতায় গোলাকার বাদামি দাগ পড়া
- খ) পাতায় আঁকাবাঁকা বাদামি দাগ পড়া
- গ) পাতায় সরু সরু বাদামি দাগ পড়া
- ঘ) বৃত্তাকার রেখাযুক্ত আঁকাবাঁকা লালচে-বাদামি দাগ পড়া

ব্যবহারিক

পাঠ ৪.৬ আলু, বেগুন ও টমেটোর রোগাক্রান্ত নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ



এ পাঠ শেষে আপনি–

- আলু, বেগুন ও টমেটোর রোগাক্রান্ত নমুনা নিজ হাতে সংগ্রহ করতে পারবেন।
- সংগৃহীত নমুনা ভবিষ্যতে পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের জন্য সংরক্ষণ করতে পারবেন।



সাধারণ পদ্ধতি

উপকরণ ঃ আলু, বেগুন ও টমেটোর নমুনা, পলিথিন ব্যাগ, ছুরি, কোদাল, নমুনা সংরক্ষণের কাঁচপাত্র (specimen jar), ফরমালিন (৪০%), ইথাইল এলকোহল (৭০%), পাতিত পানি, লেবেল, কলম, আঁঠা, জিলেটিন, মোম ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

- কেবলমাত্র রোগের আদর্শ লক্ষণযুক্ত আলু, বেগুন ও টমেটো নমুনার জন্য বাছাই করুন। লক্ষ্য রাখবেন এসব নমুনাতে যেন অন্য কোনো রোগজনিত দাগ বা ক্ষত না থাকে।
- নমুনার জন্য গোটা আলু, বেগুন ও টমেটো সংগ্রহ করে পলিথিন ব্যাগে করে অনুশীলন কক্ষে নিয়ে আসুন। নমুনা সংগ্রহের সময় লক্ষ্য রাখবেন যেন তাতে আঘাত লেগে কোনো ক্ষতের সৃষ্টি না হয়।
- নমুনায় ময়লা থাকলে তা পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করুন।
- আলু, বেগুন ও টমেটো খুব রসালে হওয়ায় এদেরকে শুকিয়ে হারবেরিয়াম সিটে সংরক্ষণ করা যায় না। এজন্য বাজারে বিক্রিত ফরমালিন (৪০%) এর ৪% দ্রবণে অথবা ইথাইল এলকোহাল (৭০%) ও ফরমালিন (৪০%) যথাক্রমে ১০০ঃ৬ অনুপাতে মিশিয়ে একটি নমুনা সংরক্ষণ কাঁচ পাত্রে রাখুন এবং তার মধ্যে নমুনা ডুবিয়ে রাখুন।
- কাঁচ পাত্রের ঢাকনাটি পরে এঁটে দিন। এর জন্য প্রথমে ৩০ গ্রাম জিলেটিন পানিতে কয়েক ঘন্টা ভিজিয়ে রাখুন। অতিরিক্ত পানি ঢেলে ফেলুন ও জিলেটিনকে গরম করে গলিয়ে ফেলুন। তারপর আনুমানিক ৭ গ্রাম টুকরো করা মোম উহাতে মিশান এবং গরম করে নেড়ে নেড়ে গলিয়ে ফেলুন। গরম থাকা অবস্থায় মোমমিশ্রিত জিলেটিন কাঁচ পাত্রের মুখের ধার দিয়ে লাগান এবং সঙ্গে সঙ্গে ঢাকনাটি উহার উপর রেখে চাপ দিয়ে আঁটুন। ঢাকনার কোনো স্থানে কিছু ফাঁক থাকলে তা বন্ধ করার জন্য পাশ দিয়ে নরম মোমমিশ্রিত জিলেটিনের প্রলেপ দিয়ে দিন।
- একটি লেবেলে নমুনার স্থানীয় নাম, বৈজ্ঞানিক নাম, সংগ্রহ স্থানের নাম, সংগ্রহকারীর নাম, রোগ ও উহার জীবাণুর নাম, সংগ্রহের তারিখ ইত্যাদি লিখে আঁঠা মাখিয়ে পাত্রের গায়ে লাগিয়ে দিন।

বিশেষ পদ্ধতি

ফরমালিন এবং ফরমালিনমিশ্রিত এলকোহলে নমুনা তার স্বাভাবিক রঙ হারিয়ে ফেলে। এজন্য বিশেষ দ্রবণে সংরক্ষণ করে নমুনার রঙ (বিশেষ করে সবুজ ও লাল রঙ) স্থায়ী করতে পারেন। টমেটো ও বেগুনের জন্য এ পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

সবুজ রঙ স্থায়ীকরণ পদ্ধতি

উপকরণ ঃ নমুনা, কপার অ্যাসিটেট, অ্যাসিটিক এসিড (৫০%), ফরমালিন (৪০%), বিকার, নমুনা সংরক্ষণের কাঁচের পাত্র, জিলেটিন, মোম, লেবেল, আঁঠা, কলম ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

- উপরে বর্ণিত সাধারণ পদ্ধতির ন্যায় নমুনা সংগ্রহ করুন।
- একটি পাত্রে অ্যাসিটিক এসিড নিয়ে তার মধ্যে ধীরে ধীরে কপার অ্যাসিটেট যোগ করুন এবং নেড়ে দ্রবীভূত করে একটি অতিসম্পৃক্ত দ্রবণ প্রস্তুত করুন।
- এ দ্রবণের কিছু একটি পাত্রে নিয়ে তার সঙ্গে ৩-৪ গুণ পাতিত পানি মিশান ও খোলামেলা স্থানে গরম করুন।
- দ্রবণ ফুটতে আরম্ভ করলে তার মধ্যে নমুনা ডুবিয়ে দিন এবং লক্ষ্য করুন যে কিছুক্ষণের মধ্যে নমুনা তার নিজস্ব রঙ হারিয়ে সাদা হয়ে গেছে। আরও কয়েক মিনিট পরে দেখবেন যে নমুনা পুনরায় স্বীয় রঙ ফিরে পেয়েছে।
- দ্রবণে আধা ঘন্টা রাখার পর নমুনা পানিতে ভালো করে ধুয়ে নমুনা সংরক্ষণের কাঁচ পাত্রে ৪% ফরমালিন (৪০%) এ ডুবিয়ে রাখুন।
- পরিশেষে নমুনা দ্রবণে ডুবিয়ে সাধারণ পদ্ধতির ন্যায় মোমমিশ্রিত জিলেটিন দ্বারা পাত্রের ঢাকনি লাগান ও বিভিন্ন বিবরণসহ লেবেল পাত্রের একপাশে আঁঠা দিয়ে লাগান (বিশদ বিবরণের জন্য সাধারণ পদ্ধতি দ্রষ্টব্য)।

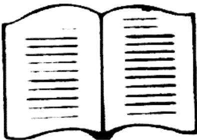
লাল রঙ স্থায়ীকরণ পদ্ধতি

উপকরণ ঃ নমুনা, জিঙ্ক ক্লোরাইড, গি-সারিন, ফরমালিন (৪০%) পাতিত পানি, বিকার, নমুনা সংরক্ষণের কাঁচের পাত্র, জিলেটিন, মোম, লেবেল, আঁঠা, কলম ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

- রোগাক্রান্ত লাল রঙের টমেটোর নমুনা সংগ্রহ করুন।
- হেসলারস সলিউশন তৈরি করুন। এর জন্য ৫০ গ্রাম জিঙ্ক ক্লোরাইড বিকারে গরম পানিতে

  দ্রবীভূত করুন। দ্রবণ ছেঁকে উহার মধ্যে ২৫ মি.লি. গি-সারিন ও ২৫ মি.লি. ফরমালিন মিশান। উপরের দ্রবণে পাতিত পানি যোগ করে সর্বমোট ১০০০ মি.লি. করে হেসলারস সলিউশন তৈরি করুন।
- ঠান্ডা হওয়ার পর দ্রবণের নিচে তলানি জমলে উপর হতে পরিষ্কার দ্রবণ কাত করে নমুনা সংরক্ষণের পাত্রে ঢালুন।
- পরিশেষে দ্রবণে নমুনা ডুবিয়ে পাত্রের ঢাকনি মোমমিশ্রিত জিলেটিন দ্বারা সাধারণ পদ্ধতির ন্যায় ঢাকনা লাগিয়ে দিন এবং নমুনার বিভিন্ন বিবরণসহ একটি লেবেল পাত্রের গায়ে একপাশে আঁঠা দিয়ে এঁটে দিন (বিস্তারিত বিবরণের জন্য সাধারণ পদ্ধতি দ্রষ্টব্য)।



সারমর্ম ঃ এ পাঠে আলু, বেগুন ও টমেটোর রোগাক্রান্ত নমুনা ভবিষ্যতে পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের জন্য কীভাবে সাধারণ পদ্ধতিতে এবং সবুজ ও লাল রঙ স্থায়ীকরণের জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যায় তা বর্ণনা করা হয়েছে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। কাঁচা রোগাক্রান্ত টমেটোর নমুনা কোন্ দ্রবণে সংরক্ষণ করা উচিত?
- ক) ফরমালিনে
- খ) এলকোহলে
- গ) ফরমালিনমিশ্রিত এলাকোহলে
- ঘ) কপার অ্যাসিটেট অ্যাসিডিক এসিডের দ্রবণে

২। পাকা টমেটোর রোগাক্রান্ত নমুনা কোন্ দ্রবণে সংরক্ষণ করা উচিত?
- ক) ফরমালিনে
- খ) এলকোহলে
- গ) ফরমালিনমিশ্রিত এলকোহলে
- ঘ) হেসলারস সলিউশনে

৩। আলু, বেগুন, টমেটোর রোগাক্রান্ত নমুনা সংরক্ষণের জন্য কোন্‌টি প্রয়োজন?
- ক) ২০% ফরমালিন
- খ) ৩০% ফরমালিন
- গ) ৪০% ফরমালিন
- ঘ) ৬০% ফরমালিন

ব্যবহারিক

পাঠ ৪.৭ বীজ শোধন অনুশীলন



এ পাঠ শেষে আপনি –

- বীজ শোধনের উপকারিতা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- নিজে নিজে বীজ শোধন করতে পারবেন।



বীজ শোধনের উপকারিতা

অনেক রোগ আছে যাদের জীবাণু বীজে বছরের পর বছর বেঁচে থাকে। ফলে, ঐসব বীজ বপন করলে গাছে রোগের প্রাথমিক সংক্রমণ ঘটে। বীজবাহিত জীবাণু ধ্বংস করার জন্যই বীজকে শোধন করতে হয়। জীবাণু বীজের উপর অথবা মধ্যে থাকতে পারে। জীবাণুর অবস্থানের উপর বীজ শোধন প্রক্রিয়া নির্ভর করে। বীজশোধণের উপকারিতা মূলত তিনটি। যথা-

(১) শোধণের ফলে বীজের উপর ও মধ্যস্থিত জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়।

(২) শোধিত বীজকে নিশ্চিন্তে সংরক্ষণ করা যায়। কারণ ওষুধমিশ্রিত বীজ জীবাণু আক্রমণ করতে পারে না।

(৩) শোধিত বীজ বপন করলে মৃত্তিকাস্থিত অসংখ্য জীবাণুর আক্রমণ হতে বীজগুলো রক্ষা পায়। কারণ বীজের খোসায় লেগে থাকা ওষুধ বীজসংলগ্ন চারিপাশের মাটিকে বিষাক্ত করে ফেলে এবং বাইরের জীবাণু এ বিষাক্ত মাটি ভেদ করে বীজ এবং বীজ হতে গজানো অঙ্কুর আক্রমণ করতে পারে না। এর ফলে অঙ্কুর বেশ নিরাপত্তার সাথে জীবাণু শুন্য পরিবেশের মধ্য দিয়ে মাটির উপরে উঠতে থাকে। অঙ্কুর বা শিশু গাছকে এভাবে নিরাপত্তা না দিলে জন্মের পর যখন তার পুরো ক্ষমতা গড়ে ওঠে না তখন জীবাণুর আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারে না। এ কারণে অনেক অঙ্কুর মাটির উপরে ওঠার আগেই মৃত্তিকাস্থিত জীবাণুর আক্রমণে নষ্ট হয়ে যায়। বীজ শোধনের ফলে সকল পুষ্ট বীজ হতেই অঙ্কুর মাটির উপরে উঠে আসে এবং সুস্থ ও সবল শিশু গাছে পরিণত হয়।

বীজ শোধন পদ্ধতি

বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক পদ্ধতিতে বীজ শোধন করা যায় এবং এসব পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ পাঠ ১.৪ এ দেয়া হয়েছে। এ পাঠে অনুশীলনের জন্য কেবলমাত্র ২টি পদ্ধতি দেয়া হলো।

শুকনো পদ্ধতিতে বীজ শোধন

উপকরণ ঃ বীজ, ওষুধ, মাপন যন্ত্র , টিনের কৌটা অথবা রোটারি ড্রাম, থলে অথবা বস্তা, লেবেল, কলম, আঁঠা, সুতা ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

ক.

- বীজের পরিমাণ কম হলে টিনের ছোট কৌটায় ২/৩ অংশ পরিমাণ বীজ নিন ও পরিমাণমতো ওষুধ যোগ করুন (বীজের প্রকৃতি, পরিমাণ ও ওষুধের মাত্রা পাঠ ১.৪ এ দেয়া হয়েছে)।
- কৌটার মুখ বন্ধ করুন ও ভালো করে ঝাঁকিয়ে বীজ ওলটপালট করে বীজের গায়ে ওষুধ মাখান।
- শোধিত বীজ সরাসরি জমিতে বপন করুন অথবা কাপড়ের ছোট থলেতে মুখ বন্ধ করে রেখে দিন।

- 'বিষাক্ত বীজ' কথাটি একটি লেবেলে লিখে থলের গায়ে বেঁধে রাখুন।

খ.

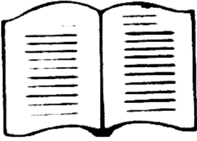
- বীজের পরিমাণ বেশি হলে রোটারি ড্রামের ৩/২ অংশ বীজ দিয়ে ভর্তি করুন এবং তার মধ্যে পরিমিত গুড়ো ওষুধ যোগ করুন।
- হাতল ধরে ড্রামটি ৪-৫ মিনিট ঘুরিয়ে বীজগুলোকে ওলটপালট করে গায়ে ওষুধের গুড়ো মাখান (চিত্র ১৮ খ দেখুন)।
- শোধিত বীজ বস্তায় রাখুন অথবা সরাসরি জমিতে বপন করুন।
- সংরক্ষণ করতে হলে বীজের বস্তার মুখ ভালো করে বাঁধুন ও 'বিষাক্ত বীজ' কথাটি একটি লেবেলে লিখে বস্তার গায়ে বেঁধে অথবা আঁঠা দিয়ে আঁটকিয়ে রাখুন।

ভিজানো পদ্ধতিতে বীজ শোধন

উপকরণ ঃ বীজ, ওষুধ, পানি, কাপড়ের থলে অথবা চটের বস্তা, পানি রাখার জন্য ছোট অথবা বড় পাত্র, লেবেল, সুতা,কলম ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

- একটি পাত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি নিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ ওষুধ মিশিয়ে ওষুধের সলিউশন অথবা সাসপেনশান তৈরি করুন (কোন্ ওষুধ কতটা কত পরিমাণ পানিতে মিশাতে হয় তা পাঠ ১.৪ এ দেয়া আছে)।
- বীজ থলেতে (কম বীজ হলে) অথবা বস্তায় (বেশি বীজ হলে) নিন এবং ওষুধমিশ্রিত পানিতে ১০-১৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন।
- শোধিত বীজ সরাসরি অথবা রোদে শুকিয়ে জমিতে বপন করুন।
- শোধিত বীজ সংরক্ষণ করতে হলে বীজ শুকিয়ে থলেতে অথবা বস্তায় ভরে মুখ শক্ত করে বেঁধে রাখুন।
- থলে অথবা বস্তায় 'বিষাক্ত বীজ' লিখিত একটি লেবেল বেঁধে অথবা আঁঠা দিয়ে আঁটকে রাখুন।



সারমর্ম ঃ বীজবাহিত জীবাণু ধ্বংস করার জন্য বীজ শোধন করতে হয়। শোধিত বীজ নিশ্চিন্তে সংরক্ষণ করা যায় এবং এসব বীজ বপন করলে তারা মৃত্তিকাস্থিত অসংখ্য জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। এ পাঠে শুকনো ও ভিজানো পদ্ধতিতে বীজ শোধনের নিয়মগুলো বর্ণনা করা হয়েছে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। বীজ শোধনের উদ্দেশ্য কোন্টি?
- ক) বীজের উপরিস্থিত জীবাণু ধ্বংস করা
- খ) বীজের অভ্যন্ত রস্ত জীবাণু ধ্বংস করা
- গ) বীজের উপরিস্থিত ও অভ্যন্ত রস্থিত জীবাণু ধ্বংস করা
- ঘ) মৃত্তিকাস্থিত জীবাণু ধ্বংস করা

২। ভিজা পদ্ধতিতে ওষুধের দ্রবণে বীজ কতক্ষণ ডুবিয়ে রেখে শোধন করা যায়?
- ক) ২৪ ঘন্টা
- খ) ১২ ঘন্টা
- গ) ৬ ঘন্টা
- ঘ) ১০-১৫ মিনিট

৩। শুকনো পদ্ধতিতে শোধন করে বীজ কখন বপন করতে হয়?
- ক) শোধনের পরপরই
- খ) শোধনের পর কিছুদিন সংরক্ষণ করে
- গ) শোধনের পরপর অথবা কিছুদিন সংরক্ষণ করে
- ঘ) শোধনের পর কয়েক ঘন্টা ভিজিয়ে

ব্যবহারিক

পাঠ ৪.৮ মৃত্তিকা শোধন অনুশীলন



এ পাঠ শেষে আপনি –

- ফরমালিন ও ক্লোরোপিকারিন দিয়ে নিজে নিজে মাটি শোধন করতে পারবেন।



অনেক পরজীবী ছত্রাক ও কৃমি এক মৌসুম থেকে অন্য মৌসুম অবসর যাপন করে এবং গাছকে আক্রমণ করে রোগ সৃষ্টি করে। নানা প্রকার ওষুধ দ্বারা এসব জীবাণু ধ্বংস করে মাটি শোধন করা হয়। মাটি শোধন পদ্ধতি গাছের প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। গাছ লাগানোর আগে, লাগানোর সময় অথবা পরে গাছ বৃদ্ধির সময় মাটিতে ওষুধ প্রয়োগ করে জীবাণু ধ্বংস করা যায়। মাটি শোধনের জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাটির উপরে ওষুধ প্রয়োগ করা হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাটির উপরের কয়েক সেন্টিমিটার মাটির সঙ্গে উহা মিশানো হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইনজেকশন নিডিল দ্বারা মাটির মধ্যে ওষুধ প্রবেশ করিয়ে জীবাণু ধ্বংস করা হয়। বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক পদ্ধতি অনুসরণ করে মাটি শোধন করা যায় এবং পাঠ এ ১.৪ এসব পদ্ধতির বিস্ত ারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এখানে অনুশীলনের জন্য কেবলমাত্র দুটি রাসায়নিক পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে।

ক. ফরমালিন দ্বারা মাটি শোধন

সাধারণত বীজতলার ও টবের মাটি ফরমালিন দিয়ে শোধন করা হয়।

উপকরণ ঃ ফরমালিন (৪০%), পানি, পানি ছিটানোর ঝাঝরি, কোদাল, মুগুর, মাপার পাত্র (measuring cylinder), ত্রিপল অথবা পলিথিন শিট ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

- একটি বীজতলা বাছাই করুন ও তার মাটি বারে বারে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে ভালো করে গুড়ো করুন।
- মাটি শুকালে শতকরা ৪ ভাগ ক্ষমতাসম্পন্ন পানিমিশ্রিত ফরমালিন উহাতে ঝাঝরির সাহায্যে ছিটিয়ে ভালো করে ভিজিয়ে ফেলুন।
- ফরমালিন ছিটানোর সাথে সাথে ত্রিপল অথবা পলিথিন শিট দিয়ে জমি ঢেকে দিন।
- ৪৮ ঘন্টার পর ঢাকানা সরিয়ে এক সপ্তাহ মাটিকে আলগা অবস্থায় রাখুন এবং ঐ সময়ের মধ্যে কয়েকবার মাটি কুপিয়ে ওলটপালট করুন।
- মাটিতে ফরমালিনের গন্ধ যখন পাবেন না তখন জমিতে বীজ অথবা চারা লাগান।

খ. ক্লোরোপিকরিন দ্বারা মাটি শোধন

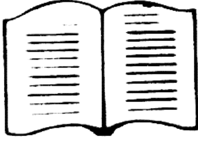
ক্লোরোপিকরিন উদ্বায়ী প্রকৃতির ওষুধ। এ ওষুধের অপর নাম টিয়ার গ্যাস। সাধারণত অতি উচ্চ চাপে এ গ্যাসকে তরল অবস্থায় টিনের কৌটায় মুখ বন্ধ অবস্থায় রাখা হয়। টিনের মুখ খোলার সাথে সাথে গ্যাস শব্দ করতে করতে ধূয়ার ন্যায় বের হয়ে আসে।

উপকরণ ঃ ক্লোরোপিকরিন, কোদাল, মুগুর, ত্রিপল অথবা পলিথিন সিট, ঝাঝরি, পানি ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

- শোধনের জন্য জমি নির্বাচন করুন।
- ৩৮ সেন্টিমিটার পরপর গর্ত খুড়ে অথবা বিভিন্ন সারিতে লম্বালম্বিভাবে গর্ত খুড়ে ১৫ সেন্টিমিটার নিচে ওষুধ প্রয়োগ করুন (তের বর্গমিটার স্থানের মাটির জন্য ৪৫৪ গ্রাম ব্যবহার করুন)।
- ওষুধ প্রয়োগের সাথে সাথেই আশেপাশের মাটি বা পলিথিন শিট দিয়ে গর্তগুলো বন্ধ করে দিন।
- গর্তে মাঝে মাঝে পরিমাণমতো পানি ছিটিয়ে ৪-৫ সেন্টিমিটার পরিমাণ মাটি ভিজিয়ে দিন।
- ওষুধ প্রয়োগের ৭ দিন পর গর্তে বীজ বা চারা গাছ লাগান।

ক্লোরোপিকরিনের ন্যায় আরও উদ্বায়ী প্রকৃতির ওষুধ আছে। (যথা- মিথাইল ব্রোমাইড, ইথাইল ব্রোমাইড, ভ্যাপাম, ডাউফিউম প্রভৃতি)। এসব ওষুধ দ্বারাও ক্লোরোপিকরিনের ন্যায় একই পদ্ধতিতে মাটি শোধন করতে পারেন।



সারমর্ম ঃ মাটিতে বিভিন্ন প্রকারের অসংখ্য জীবাণু থাকে। বীজকে ওসব জীবাণুর অঙ্কুরোদ্গমপূর্ব ও অঙ্কুরোদ্গমত্তর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য মাটিকে শোধন করা হয়। এ পাঠে মাটি শোধনের পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৮

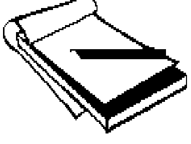
সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। মাটি শোধনের পদ্ধতিসমূহকে প্রধাণত কয় ভাগে বিভক্ত করা যায়?
- ক) এক ভাগে
- খ) দু ভাগে
- গ) তিন ভাগে
- ঘ) চার ভাগে

২। কোন ওষুধটি উদ্বায়ী পদার্থ হিসেবে মাটি শোধনে ব্যবহৃত হয়?
- ক) কুপ্রাভিট
- খ) মিথাইল ব্রোমাইড
- গ) ক্যাপটান
- ঘ) ব্যাভিস্টান

৩। উদ্বায়ী ওষুধ মাটিতে প্রয়োগের পর কখন বীজ বপন করা যায়?
- ক) পরপরই
- খ) ১২ ঘন্টা পর
- গ) ২৪ ঘন্টা পর
- ঘ) ওষুধের গ্যাস মাটি থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর

৪। মাটি শোধনে শতকরা কত ভাগ ক্ষমতাসম্পন্ন ফরমালিন ব্যবহার করা হয়?
- ক) ১০ ভাগ
- খ) ২০ ভাগ
- গ) ৪ ভাগ
- ঘ) ২৫ ভাগ



চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ৪

১। আলুর লেইট ব্লাইট রোগের লক্ষণ বর্ণনা করুন।
২। আলুর গুদামজাত রোগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখুন।
৩। টমেটোর বিভিন্ন প্রকার ঢলে পড়া রোগের জীবাণুর নাম কী? কোন জীবাণু দ্বারা কী ধরনের লক্ষণ প্রকাশ পায়?
৪। কুমড়ার পাউডারি মিলডিউ রোগের বৈশিষ্ট্যমূলক লক্ষণ কী? কীভাবে এ রোগ দমন করা হয়?
৫। শিম গাছের এনথ্রাকনোজ রোগের লক্ষণ ও দমন ব্যবস্থা লিখুন।



উত্তরমালা - ইউনিট ৪

পাঠ ৪.১
১। খ ২। খ ৩। গ ৪। ক ৫। গ ৬।খ

পাঠ ৪.২
১। খ ২। খ ৩। ক ৪। গ ৫। গ ৬। খ

পাঠ ৪.৩
১। ক ২। গ ৩। গ ৪। ঘ

পাঠ ৪.৪
১। ক ২। গ ৩। ঘ ৪। ঘ ৫। গ ৬। খ

পাঠ ৪.৫
১। ক ২। গ ৩। ক ৪। ঘ

পাঠ ৪.৬
১। ঘ ২। ঘ ৩। গ

পাঠ ৪.৭
১। গ ২। ঘ ৩। গ

পাঠ ৪.৮
১। খ ২। খ ৩। ঘ ৪। গ

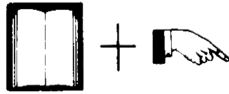
ইউনিট ৫
ফলের রোগ ও প্রতিকার

ইউনিট ৫ ফলের রোগ ও প্রতিকার

ফল স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। ফলের মধ্যে যেসব উপাদান আছে তা আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজন। আমাদের শরীর রক্ষার্থে যেসব ভিটামিন প্রয়োজন তার সবগুলো ফলে রয়েছে। এছাড়া, ফলে ক্যালসিয়াম, লৌহ, ফসফরাস ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার খণিজ উপাদান আছে যা দেহের বিপাক কার্যাবলী স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। পাকা আম, পেঁপে, কাঁঠাল, বেল, খেজুর, কমলা প্রভৃতিতে ভিটামিন 'সি' পাওয়া যায়। কলা, বাদাম, লিচু, আঙ্গুর, কমলায় ভিটামিন 'বি-১' বা থায়মিন এবং পেঁপে, বেল, লিচু, আনারস, কদবেল, ডালিমে ভিটামিন 'বি-২' বা রাইবোফ্লাভিন থাকে। পেয়ারা, লেবু, কমলা, আমলকি, লিচু, আনারসে ভিটামিন 'সি' বা অ্যাসকরবিক এসিড থাকে। উপরোক্ত পুষ্টি উপাদানের জন্য খাদ্যকে সুষম করতে হলে ভাত ও তরিতরকারির সঙ্গে আমাদের খাদ্যতালিকায় কিছু না কিছু ফল থাকা উচিত। খাদ্য হিসেবে ফলের সুবিধা হলো যে, রান্না ছাড়াই এদেরকে খাওয়া যায়। বাংলাদেশের আবহাওয়া ফল চাষের খুবই উপযোগী এবং একরপ্রতি জমিতে যে কোনো মাঠ ফসলের তুলনায় ফলের গড় ফলন অনেক বেশি হওয়ায় আর্থিক দিক দিয়ে কৃষকের আরও বেশি লাভ হয়। ফল বাগানে ফল গাছের ফাঁকে ফাঁকে আদা, হলুদ, শাকশবজি লাগিয়েও বাড়তি আয় করা সম্ভব। অনেক পতিত জমি আছে যেখানে কোনো মাঠ ফসল করা যায় না (যেমন- রেল লাইনের পাশ, রাস্ ার ধার, পুকুরের পাড়, বাড়ির আনাচেকানাচে ইত্যাদি) সেখানে ফলের গাছ লাগিয়ে জমির সদ্ব্যবহার করা যায়। ওষুধ হিসেবে ফলের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফল ও ফল গাছ বিভিন্ন শিল্প স্থাপনে বিশেষ অবদান রাখে। রাস্ ায় ছায়া প্রদান, রোদ ও ঝড়ের তীব্রতা কমানো, জমির ক্ষয় রোধ ইত্যাদিতেও ফল গাছের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে সারাবছরই বিভিন্ন জাতের ফল হয়। কিন্তু বিভিন্ন রোগের দরুন ফলের উৎপাদন অনেক স্থানে আশাতীত হয় না। ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ফলের বিভিন্ন রোগ ও উহার প্রতিকার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

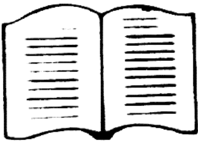
এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে আম, কলা, পেঁপে, পেয়ারা, লেবু ইত্যাদি ফল গাছের রোগ, রোগের নমুনা সংগ্রহ ও শনাক্তকরণ ইত্যাদি বিষয় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৫.১ আম গাছের রোগ



এ পাঠ শেষে আপনি–

- আম ও আম গাছের কয়েকটি ক্ষতিকর রোগের কারণের নাম বলতে ও লিখতে পারবেন।
- বর্ণিত রোগসমূহের লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বর্ণিত রোগসমূহের দমন পদ্ধতি বলতে ও লিখতে পারবেন।



এনথ্রাকনোজ (Anthracnose)

কারণ ঃ *Colletorichum gloeosporioides* নামক ছত্রাকের আক্রমণে আমের এনথ্রাকনোজ রোগ হয়। এটি আমের খুবই ক্ষতিকর রোগ।

পাতায় বাদামি রঙের ছোট ছোট কিছুটা কোনাচে ধরনের দাগ উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ ঃ গাছের পাতা, ডাল, ফুল ও ফল এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। পাতায় বাদামি রঙের ছোট ছোট কিছুটা কোনাচে ধরনের দাগ উৎপন্ন হয়। চিত্র ৫০ এ এনথ্রাকনোজ রোগে আক্রান্ত আম পাতা, মঞ্জুরী ও ফল দেখানো হয়েছে।



চিত্র ৫০ ঃ আমের এনথ্রাকনোজ রোগ; উপরে (বামে)- দাগযুক্ত আক্রান্ত পাতা
(ডানে)- আক্রান্ত কালচে মঞ্জরী; নিচে- বিভিন্ন পর্যায়ের দাগযুক্ত আম

বয়স্ক দাগের তন্তু ফেটে যায়। পাতার বোঁটা আক্রান্ত হলে এটি কালো হয়ে ঝরে পড়ে। ডালের গায়েও কালো দাগ উৎপন্ন হয়। আক্রান্ত কচি ডাল আগা থেকে গোড়ার দিকে শুকাতে থাকে। মঞ্জরী আক্রান্ত হলে ফুল কালো হয়ে ফল ধরার আগেই শুকিয়ে যায়। মৃদুভাবে মঞ্জুরী আক্রান্ত হলে তাতে কিছু ফল ধরলেও রোগ প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ঝরে পড়ে। বড় আম আক্রান্ত হলে তার গায়ে কালো কালো কিছুটা ডুবা (sunken) ধরনের দাগ হয়। এ দাগ বৃদ্ধি পেয়ে আয়তনে বড় হতে থাকলে ফল পচতে শুরু করে।

দমন ঃ গাছের আক্রান্ত অংশ এবং মাটিতে পড়ে থাকা আক্রান্ত অংশসমূহে ছত্রাক বেঁচে থাকে বিধায় গাছের মরা ডাল ও নিচের যাবতীয় পরিত্যক্ত অংশ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে অথবা মাটির নিচে পুঁতে রাখতে হবে। ফুল আসার সময় কয়েক দিন পরপর ৩-৪ বার ও গুটি ধরার সময় ২-৩ বার

ছত্রাকনাশক (যথা- বেনলেট, ডায়থেন এম-৪৫) স্প্রে করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় ছত্রাকনাশক অবশ্যই স্প্রে করতে হবে নতুবা মুকুল ঝরে যাবে। ফল পচা কমানোর জন্য ৫১$^{\circ}$ সে. উষ্ণতার পানিতে আমকে ১৫ মিনিট ডুবিয়ে পানি মুছে সংরক্ষণ করতে হবে।

সুটি মোল্ড (Sooty mold)

কারণ ঃ এ রোগটি *Capnodium ramosum* নামক ছত্রাকের দ্বারা হয়।

লক্ষণ ঃ বস্তুত ছত্রাকটি প্রত্যক্ষভাবে গাছে পরজীবী হিসেবে রোগ সৃষ্টি করে না। কতকগুলো পোকামাকড় গাছের পাতায় এক প্রকার মিষ্ট রস নিঃসরণ করে। এ মিষ্ট রসে ছত্রাক জন্মে ও খুব দ্রুত বংশ বিস্তার করে পাতার উপরের দিক ছেয়ে ফেলে। ছত্রাক কালো স্পোর উৎপন্ন করলে তা রসের সঙ্গে লেপটে পাতাকে কালো ও কুৎসিত করে ফেলে। পাতার উপরটা ছত্রাকের মাইসেলিয়াম ও স্পোর দ্বারা আবৃত থাকায় গাছের সালোকসংশ্লেষণ অপেক্ষাকৃত কম হয় এবং ফল ছোট হয়।

দমন ঃ কীটনাশক (প্রতি লিটার পানিতে ৩ গ্রাম সেভিন) ছিটিয়ে পোকামাকড় ধ্বংস করে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। ওষুধ ছিটানোর পরপরই আঁঠালো স্টার্চ সলিউশন প্রয়োগ করা দরকার। কারণ ঐ আঁঠালো সলিউশনে পত্রস্থিত ছত্রাক আঁটকে যায় এবং পরে সেগুলো শুকিয়ে ছত্রাকসহ টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। তারপর আর একবার কীটনাশক ছিটাতে হবে।

পাউডারি মিলডিউ (Powdery mildew)

কারণ ঃ *Oidium mangiferae* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়।

কচি পাতা, পুষ্পমঞ্জরী, কচি ফলে পাউডারি মিলডিউ রোগ হয়ে থাকে। গাছের সব স্থানই প্রথমে সাদা এবং মাঝে মাঝে ধূসর বর্ণের পাউডার দ্বারা আবৃত হয়ে পড়ে।

লক্ষণ ঃ কচি পাতা, পুষ্পমঞ্জরী, কচি ফলে পাউডারি মিলডিউ রোগ হয়ে থাকে। সব স্থানই প্রথমে সাদা এবং মাঝে মাঝে ধূসর বর্ণের পাউডার দ্বারা আবৃত হয়ে পড়ে। পুষ্পমঞ্জরী এ রোগে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মারাত্তকভাবে আক্রান্ত গাছের পাতা ও ফল ঝরে পড়ে। এছাড়া আম অনেকটা বিকৃত হয়ে যায় এবং তাতে স্বাভাবিক রঙও হয় না।

দমন ঃ ফুল হওয়ার সময় ও ফল ধরার সময় একেকবার করে গন্ধকজাতীয় ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে। ডাইনোক্যাপ ছত্রাকনাশক ছিটিয়েও ভালো ফল পাওয়া যায়।

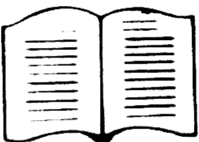
বৃন্ত পচা

কারণ ঃ *Diplodia natalensis* নামক ছত্রাক এ রোগ সৃষ্টি করে।

রোগগ্রস্থ আম সম্পূর্ণ আম কালো হয়ে যায়। আমের ভিতরের অংশ বাদামি এবং নরম হয়ে যায়।

লক্ষণ ঃ রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ফলের বোঁটার গোড়ার নিচে চারিদিক দিয়ে পেরিকার্প (pericarp) কালচে হয়ে আসতে থাকে। এ দাগ খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে বৃন্ত কে ঘিরে ফেলে এবং ২-৩ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আম কালো হয়ে যায়। রোগগ্রস্ত আমের ভিতরের অংশ বাদামি এবং নরম হয়ে যায়।

দমন ঃ আমকে ৫-৬% বোরাক্স সলিউশনে ৪৩$^{\circ}$ সে. উষ্ণতায় তিন মিনিট ডুবিয়ে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এছাড়া শুষ্ক এবং পরিষ্কার আবহাওয়ায় আম সংগ্রহ করার পরপরই তা গুদামে সংরক্ষণ করতে হবে এবং নাড়াচাড়ার সময় আমে যেন ক্ষতের সৃষ্টি না হয় তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।



সারমর্ম ঃ এনথ্রাকনোজ রোগে পাতায় বাদামি রঙের কোনাচে দাগ উৎপন্ন করে। বোঁটা আক্রান্ত হলে এটি কালো হয়ে আম ঝরে পড়ে। আক্রান্ত মঞ্জরীর ফুল কালো হয়ে ঝরে পড়ে। বড় আমে কালো

রঙের ডুবা ধরনের দাগ পড়ে। সুটি মোল্ডে পাতার উপরটাকে কালো ও কুৎসিৎ করে ফেলে। পাউডারি মিলডিউ রোগে পাতা ও ফল প্রথমে সাদা এবং পরে ধূসর বর্ণের পাউডার দ্বারা আবৃত হয়ে পড়ে। ছত্রাকনাশক স্প্রে করে আমের এসব রোগ দমন করতে হয়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। এনথ্রাকনোজ রোগ গাছের কোন্ অংশে হয়?
- ক) কেবল পাতায়
- খ) কেবল কচি কচি ডালে
- গ) কেবল মঞ্জরীতে
- ঘ) পাতা, ডাল, ফুল ও ফলে

২। আমের এনথ্রাকনোজ রোগ দমনে কখন ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হয়?
- ক) ফুল আসার সময় কয়েকবার
- খ) গুটি ধরার সময় কয়েকবার
- গ) আমে আঁটি হওয়ার সময় কয়েকবার
- ঘ) ফুল আসার এবং গুটি ধরার সময় কয়েকবার

৩। পাউডারি মিলডিউ রোগ গাছের কোথায় হয়?
- ক) কেবল পাতায়
- খ) কেবল কচি ফলে
- গ) কেবল পুষ্পমঞ্জরীতে
- ঘ) কচি পাতা, পুষ্পমঞ্জরী ও কচি ফলে

৪। পাউডারি মিলডিউ রোগ মারাত্তক আকারে দেখা দিলে গাছে কী ধরনের লক্ষণ প্রকাশ পায়?
- ক) পাতা বেঁকে যায়
- খ) পাতা শুকিয়ে যায়
- গ) ফল পচে যায়
- ঘ) পাতা ও ফল ঝরে পড়ে

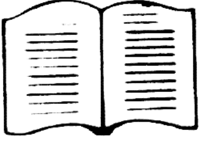
৫। পাউডারি মিলডিউ রোগ দমনকল্পে কী ব্যবস্থা নেয়া উচিত?
- ক) ফুল ধরার সময় কুপ্রভিট স্পে করতে হবে
- খ) ফুল ধরার সময় কয়েকবার ডায়থেন এম-৪৫ স্প্রে করতে হবে
- গ) ফুল ধরার সময় ও ফল ধরার সময় একেকবার করে গন্ধকজাতীয় ছত্রাকনাশক (যথা-ডাইনোক্যাপ, গুঁড়ো গন্ধক চূর্ণ) স্প্রে করতে হবে।
- ঘ) ফুল ও ফল ধরার সময় একেকবার করে গাছের গোড়ায় পানি দিতে হবে

পাঠ ৫.২ কলা গাছের রোগ



এ পাঠ শেষে আপনি–

- কলা গাছের কতিপয় ক্ষতিকর রোগের কারণ বলতে ও লিখতে পারবেন।
- রোগসমূহের লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রোগসমূহের দমন পদ্ধতি বলতে ও লিখতে পারবেন।



সিগাটোকা (Sigatoka)

কারণ ঃ *Cercospora musae* নামক ছত্রাকের আক্রমণে কলা গাছের সিগাটোকা রোগ হয়।

অনেকগুলো দাগ একত্রে যুক্ত হয়ে পাতার অনেকটা অংশ জুড়ে ফেলে এবং তখন পাতাকে পুড়ে যাওয়ার মতো দেখায়।



লক্ষণ ঃ প্রথমে পাতাতে শিরার মধ্যবর্তী অঞ্চলে সমান্তরালভাবে ছোট ছোট ও লম্বাটে ঈষৎ হলুদ রঙের দাগ দেখা দেয়। এ দাগ ক্রমশঃ বেড়ে লম্বা হতে থাকে এবং গাঢ় বাদামি রঙ ধারণ করে। ক্রমে দাগের মধ্যবর্তী স্থান শুকিয়ে হালকা ধূসর বর্ণ হয়ে যায়। এসব দাগ চারদিকে প্রায়ই হলুদ আভাতে ঘেরা থাকে। ধীরে ধীরে অনেকগুলো দাগ একত্রে যুক্ত হয়ে পাতার অনেকটা অংশ জুড়ে ফেলে এবং তখন পাতাকে পুড়ে যাওয়ার মতো দেখায়। মরা পাতার বৃন্ত প্রায়ই ভেঙ্গে যায়। এর ফলে আক্রান্ত গাছে গুটি কতক পাতাকে খাড়া হয়ে থাকতে দেখা যায়। সাধারণত কচি পাতায় এ রোগ বেশি হয়। রোগাক্রান্ত গাছে ফল ছোট হয় এবং অকালে পেকে যায়। চিত্র ৫১ এ সিগাটোকা রোগে আক্রান্ত কলা গাছ দেখানো হয়েছে।

দমন ঃ কলা আহরণের পর গাছের সব পাতা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। আক্রান্ত গাছে ডায়থেন এম-৪৫ বা বোর্দো মিক্সচার স্প্রে করে রোগের প্রকোপ কমানো যায়। রোগপ্রতিরোধী জাতের কলা সংগ্রহ করে তার চাষ করলে রোগ সহজেই নিয়ন্ত্রিত হয়। গাছ একটু ছায়া পেলে পাতায় শিশির কম পড়ে এবং রোগের প্রকোপ কমে।

চিত্র ৫১ ঃ কলাগাছের সিগাটোকা রোগ
(হলুদ আভা দ্বারা ঘেরা বাদামি দাগযুক্ত পাতা)

এনথ্রাকনোজ (Anthracnose)

কারণ ঃ কলার এ রোগটি *Gloeosporium musarum* নামক ছত্রাকের আক্রমণে হয়।

লক্ষণ ঃ কচি কচি ফলের বোঁটার কাছাকাছি স্থানে খোসায় প্রথমে কালচে রঙ হতে দেখা যায়। স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় ছত্রাক বৃদ্ধির জন্য আক্রান্ত অংশে বাদামি রঙের আস্তরণ পড়তে দেখা যায়। রোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে সমস্ত ফল, ফলের বোঁটা, এমনকী সমস্ত ছড়ার কলায় রোগের লক্ষণ প্রকট আকারে দেখা দেয়। কলা বিকৃত হয়ে যায় এবং কলার শাঁসেও দাগ ধরে।

দমন ঃ বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। কলা পুরোপুরিভাবে বের হয়ে গেলে মোচা কেটে ফেলতে হবে। কলার ছড়ি বের হওয়ার পর ডায়থেন এম-৪৫ (প্রতি লিটার পানিতে ৪ গ্রাম) বা ব্যাভিস্টিন (প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম) মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। দু'সপ্তাহ পরপর আরও দুবার ওষধ ছিটাতে হবে।

গুচ্ছপাতা (Bunchytop)

কারণ ঃ এ রোগটি *Musa virus*-ও দ্বারা হয়। কেউ কেউ মনে করেন এ রোগ মাইকোপ্লাজমা দ্বারা সংঘটিত হয়।

আক্রান্ত গাছের আগায় অনেকগুলো ছোট ছোট পাতা খাড়া অবস্থায় জটলা বেঁধে থাকায় গাছের মাথাটা গুচ্ছাকার দেখায়। গুচ্ছাকারে পাতা থাকে বলে এই রোগের নাম তাই গুচ্ছমাথা বা গুচ্ছাপাতা দেয়া হয়েছে।



লক্ষণ ঃ প্রথমে আক্রান্ত গাছের পাতাতে নিচের দিকে শিরায় আঁচড়ের ন্যায় গাঢ় সবুজ রঙের দাগ দেখা দিতে থাকে। পরে দাগগুলো মধ্যশিরা ও বৃন্তে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত পাতা ক্রমশঃ ছোট এবং চিকন হয়ে যায় এবং তাদেরকে সোজা হয়ে থাকতে দেখা যায়। পাতার কিনারায় সমভাবে সবুজ রঙ থাকে না এবং কিনারা কুঁচকে ঢেউতোলা টিনের মতো হয়ে যায়। অনেক সময় কচি পাতাটি সম্পূর্ণভাবে বের হওয়ার আগেই আর একটি নতুন পাতা বের হয়ে আসে। এর ফলে গাছের আগায় অনেকগুলো ছোট ছোট পাতা খাড়া অবস্থায় জটলা বেঁধে থাকায় গাছের মাথাটা গুচ্ছাকার দেখায়। গুচ্ছাকারে পাতা থাকে বলে এই রোগের নাম গুচ্ছমাথা বা গুচ্ছপাতা দেওয়া হয়েছে। রোগগ্রস্থ গাছে স্বাভাবিক নিয়মে মোচা বের হতে পারে না। ভূয়া কান্ড ফেটে খুবই ছোট আকারের মোচা বের হয়। চিত্র ৫২ এ গুচ্ছপাতা রোগে আক্রান্ত কলা গাছ দেখানো হয়েছে।

চিত্র ৫২ ঃ কলাগছের গুচ্ছপাতা রোগ
(গুচ্ছকারে সৃষ্টপাতা লক্ষণীয়)

দমন ঃ এ রোগ যে এলাকায় নেই সেখানকার সুস্থ গাছ থেকে চারা সংগ্রহ করতে হবে। আক্রান্ত গাছ দেখা মাত্রই তা সমূলে উঠিয়ে মাটিতে পুঁতে ধ্বংস করতে হবে। জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে সার দিতে পারলে গাছের রোগ সহনশীলতা বাড়ে। জাবপোকার উপদ্রব হলে কীটনাশক স্প্রে করতে হবে।

পানামা (Panma)

কারণ ঃ এ রোগ গাছের একটি মারাত্তক রোগ এবং রোগ হলেই গাছ মরবে। *Fusarium oxysporium* f.sp. *cubense* নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ সংঘটিত হয়।

লক্ষণ ঃ গাছের বয়স ৫-৬ মাস হওয়ার পর থেকে এ রোগের লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। অনেক সময় অল্প বয়সের গাছেও এ রোগ ধরা পড়তে পারে। আক্রান্ত গাছে প্রথম বাহিরের দিকের সব চেয়ে পুরানো পাতার কিনারা ঈষৎ হলুদ হয়ে আসতে থাকে। ক্রমে তা মধ্যশিরার দিকে বিস্তৃত হয়ে গাঢ় বাদামি রঙ ধারণ করে। পরে ভিতরের পাতাগুলো একের পর এক হলদে হতে থাকে এবং বৃন্ত ভেঙ্গে পাতা ঝুলে পড়ে ও শুকিয়ে যায়। অনেক সময় মাঝের পাতা বাইরে মেলার আগেই তাতে দাগ ধরে পচে যায়। কিছু দিনের মধ্যে ক্ষেতে কেবলমাত্র ভূয়া কান্ডটিকে স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। অনেক সময় রোগাক্রান্ত গাছের কান্ডের গোড়ার দিকে লম্বালম্বিভাবে ফেটে যায়। চিত্র ৫৩ এ পানামা রোগে আক্রান্ত কলা গাছ দেখানো হয়েছে।

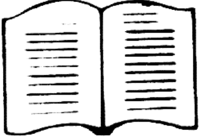


অল্প বয়সের গাছ আক্রান্ত হলে তার থেকে মোচা বের হয় না। যে সকল গাছ মোচা বের হওয়ার পর আক্রান্ত হয় সেসব গাছে কলা বাড়তে পারে না এবং কলার গোড়ার দিক বেঁকে বোতলের গলার মতো হয়ে যায়।

আক্রান্ত গাছের ভূয়া কান্ড আড়াআড়িভাবে কাঁটলে রস সঞ্চালন নালীর মধ্যে মাঝে মাঝে লালচে রঙের দাগ দেখা যায়। এ দাগ মোথার মধ্যে খুবই স্তষ্ট দেখা যায়।

চিত্র ৫৩ ঃ কলা গাছের পানামা রোগ
(বাইরের দিক থেকে ভেতরের দিকে পাতা হলদে হয়ে গোড়া থেকে ভেঙ্গে পড়া লক্ষণীয়)

দমন ঃ জমিতে অম্লত্বের পরিমাণ বেশি থাকলে চুন প্রয়োগ করতে হবে (প্রতি একরে ৭৭৫ কেজি চুন)। গোবর ও অন্যান্য সার মাটিতে প্রয়োগ করে জমির উর্বরতা বাড়ালে রোগের প্রকোপ কমানো যায়। রোগ দেখা দিলেই গাছ সমূলে উঠিয়ে তাতে কেরোসিন মাখিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। আমন ধান চাষ করে ৫/৬ মাস জমি জলমগ্ন অবস্থায় রাখতে পারলে মাটি অনেকাংশে জীবাণুমুক্ত হতে পারে। চারা সংগ্রহ করার আগে বয়স্ক গাছের মোথা কেটে দেখতে হবে তাতে লাল দাগ আছে কি-না এবং দাগ থাকলে ঐ ঝাড়ের কোনো চারাই রোপণ করা যাবে না।



সারমর্ম ঃ সিগাটোকা রোগে পাতায় শিরার সমান্তরালে হলুদ বলয় দ্বারা ঘেরা বাদামি দাগ হয়। গুচ্ছ পাতা রোগে গাছের আগার দিকে ছোট ছোট পাতা জটলা বেঁধে গুচ্ছাকারে থাকে। পানামা খুবই মারাত্তক রোগ। এ রোগে বাইরের দিক থেকে ভেতরের দিকে পাতা হলদে হয়ে গোড়া থেকে ভেঙ্গে পড়ে এবং মোথার মধ্যে লালচে দাগ পড়ে। ছত্রাকনাশক স্প্রে করে সিগাটোকা ও এনথ্রাকনোজ রোগ, আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে নষ্ট করে ও কীটনাশক ছিটিয়ে গুচ্ছ পাতা রোগ এবং লাল দাগবিহীন মোথার চারা লাগিয়ে পানামা রোগ দমন করতে হয়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সিগাটোকা রোগে পাতায় কী ধরনের দাগ পড়ে?
- ক) হলুদ আভাতে ঘেরা লম্বাটে গাঢ় বাদামি রঙের দাগ পড়ে
- খ) হলুদ আভাতে ঘেরা গোলাকার গাঢ় বাদামি রঙের দাগ পড়ে
- গ) ধূসর বর্ণের লম্বাটে দাগ পড়ে
- ঘ) ধূসর বর্ণের বড় বড় আঁকাবাঁকা দাগ পড়ে

২। সিগাটোকা রোগ হলে গাছে কলা কেমন হয়?
- ক) কলা ছোট আকারের হয়
- খ) কলা বড় আকারের হয়
- গ) কলা ছোট হয়ে অকালে পেকে যায়
- ঘ) কলা ছোট হয় এবং পাকে না

৩। কলার এনথ্রাকনোজ রোগের প্রাথমিক লক্ষণ কোন্‌টি?
- ক) পাতার বৃন্তে কালচে দাগ দেখা দেয়
- খ) পাতার উপর বিক্ষিপ্তভাবে কালচে দাগ দেখা দেয়
- গ) কচি ফলের বোঁটার কাছে খোসার উপর কালচে রঙের দাগ দেখা দেয়
- ঘ) কচি ফলের বোঁটার উপর হলুদ রঙের দাগ দেখা দেয়

৪। এনথ্রাকনোজ রোগ নিয়ন্ত্রণ কল্পে কী ব্যবস্থা নেয়া উচিত?
- ক) কলার ছড়ি বের হওয়ার আগে গাছে ডায়থেন এম-৪৫ স্প্রে করতে হবে
- খ) কলার ছড়ি বের হওয়ার সময় ডায়থেন এম-৪৫ স্প্রে করতে হবে
- গ) কলার ছড়ি বের হওয়ার পরে দুতিন বার ডায়থেন এম-৪৫ স্প্রে করতে হবে
- ঘ) কলা পাকার সময় ডায়থেন এম-৪৫ স্প্রে করতে হবে

৫। কলার গুচ্ছ পাতা রোগজনিত গাছে মোচা কেমন হয়?
- ক) কান্ড মধ্য থেকে মোচা বের হয় না
- খ) স্বাভাবিকভাবেই মোচা বের হয়
- গ) ভূয়া কান্ড ফেটে খুবই ছোট আকারের মোচা বের হয়
- ঘ) ভূয়া কান্ড ফেটে স্বাভাবিক আকারের মোচা বের হয়

পাঠ ৫.৩ পেঁপে গাছের রোগ



এ পাঠ শেষে আপনি–

- পেঁপে গাছের বিভিন্ন ক্ষতিকর রোগের কারণ বলতে ও লিখতে পারবেন।
- রোগসমূহের লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বর্ণিত রোগসমূহের দমন পদ্ধতি আলোচনা করতে পারবেন।



মোজাইক রোগ

কারণ ঃ পেঁপে গাছে যেসব রোগ হয় তন্মধ্যে মোজাইক রোগ সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতি করে। রোগটি পাপায়া মোজাইক ভাইরাস (Papaya mosaic virus) দ্বারা হয়।

লক্ষণ ঃ যে কোনো বয়সের পেঁপে গাছে এ রোগ হতে পারে। তবে চারাগাছ আক্রান্ত হলে ক্ষতি বেশি

আক্রান্ত গাছের পাতাতে সবুজ রঙের মধ্যে হলুদ রঙের ছোপ ছোপ দাগ উৎপন্ন হয়ে মোজাইক লক্ষণ সৃষ্টি করে।

হয়। আক্রান্ত গাছের পাতাতে সবুজ রঙের মধ্যে হলুদ রঙের ছোপ ছোপ দাগ উৎপন্ন হয়ে মোজাইক লক্ষণ সৃষ্টি করে। আগার দিকের কচি কচি পাতায় রোগের প্রথম সংক্রমণ ঘটে। রোগে গাছের বৃদ্ধি মারাত্তকভাবে ব্যাহত হয়ে গাছ খর্বাকৃতি হয়। পাতা আয়তনে ছোট হতে থাকে। গাছে আগার দিকে এক গুচ্ছ পাতা বাদে প্রায় সব পাতা ঝরে পড়ে। অনেক সময় পাতাগুলো পাকিয়ে সুতার মতো হয়ে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাতাকে বিকৃত হতে দেখা যায়। পুরানো পাতার কিনারা কুঁচকে যায়। রোগাক্রান্ত গাছের ফল ছোট ও বিকৃত হয়। অনেক ফলের গায়ে হলুদ রঙের ছোপ ছোপ দাগ হতে দেখা যায়।

দমন ঃ এ রোগ দমন খুবই কষ্টকর। রোগপ্রতিরোধী জাতের পেঁপে গাছ (যথা- ক্যারিকা কলিফ্লোরা) লাগিয়ে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তবে চারা গাছে রোগ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে সব গাছ তুলে পুড়িয়ে নষ্ট করলে এবং কীটনাশক স্প্রে করে জাব পোকা দমন করলে রোগের সংক্রমণ অনেকাংশে কমানো যায়।

এনথ্রাকনোজ রোগ

কারণ ঃ *Colletotrichum capsici* নামক ছত্রাকের আক্রমণে পেঁপের এনথ্রাকনোজ রোগ হয়। এ রোগটি পেঁপের ছত্রাকঘটিত রোগসম হের অন্যতম।



চিত্র ৫৪ ঃ পেঁপের এনথ্রাকনোজ রোগ; বামে- প্রাথমিক পর্যায়ের হালকা হলুদ রঙের দাগযুক্ত পেঁপে; ডানে- গোলাকার কালচে দাগ ও উহার মধ্যস্থিত গোলাপি গুটিযুক্ত পেঁপে

লক্ষণ ঃ পাতা ও পেঁপে (কাঁচা ও পাঁকা) উভয়ই এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। রোদের দিকে পেঁপের যে অংশ থাকে সেখানে প্রথমে হাল্‌কা হলদে রঙের দাগ পড়তে দেখা যায়। পরে ঐ স্থান বাদামি ও কিছুটা নরম হয়ে যায়। এ ক্ষতস্থানের মাঝে গোলাকার কালচে দাগ পড়ে। বড় বড় বয়স্ক দাগের উপর ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে লালচে বা গোলাপি রঙের গুটি উৎপন্ন হতে দেখা যায়। কান্ড আক্রান্ত হলে রোগাক্রান্ত অংশের বিপরীত দিকটা অনেক সময় চুপসে যায় এবং ধীরে ধীরে সে অংশ শুকিয়ে যেতে থাকে এবং শেষে গাছ মরে যায়। চিত্র ৫৪ এ এনথ্রাকনোজ রোগে আক্রান্ত পেঁপে দেখানো হয়েছে।

দমন ঃ রোদের দিকে রোগের সূচনা হয় বলে গ্রীষ্মকালে কলা পাতা বা অন্য কোনো জিনিষ দিয়ে গাছের কান্ড ও ফলকে বেঁধে প্রখর রৌদ্রের তাপ থেকে রক্ষা করতে হবে। এছাড়া রোগগ্রস্ত অংশে ছত্রাকনাশক স্প্রে করে ছত্রাকের সংক্রমণ বন্ধ করতে হবে।

চারা ধ্বসা রোগ

কারণ ঃ *Pythium aphanidermatum* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়।

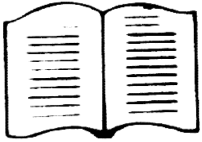
ধ্বসা রোগে মাটিসংলগ্ন স্থানে কান্ডে পানিভেজা দাগ হয় এবং ঐ স্থানে গাছ ভেঙ্গে পড়ে।



লক্ষণ ঃ প্রথমে মাটি সংলগ্ন স্থানে কান্ডে পানিভেজা দাগের সৃষ্টি হয়। দাগ ক্রমে বেড়ে কান্ডকে বেষ্টন করে ফেলে। আক্রান্ত অংশ ধীরে ধীরে বাদামি হয়ে ভেতরে পচে যায়। রোদ ও বাতাসে আক্রান্ত অংশ শুকিয়ে সুতোর মতো হয়ে যায়। পচা স্থানে চারা গাছ হেলে পড়ে এবং কয়েক দিনেই মরে যায়। চারা ধ্বসা রোগে বীজতলায় প্রচুর গাছ নষ্ট হয়ে যায়। চিত্র ৫৫ এ চারা ধ্বসা রোগে আক্রান্ত পেঁপে গাছ দেখানো হয়েছে।

চিত্র ৫৫ ঃ পেঁপের চারা ধ্বসা রোগ
(মাটিসংলগ্ন কান্ড শুকিয়ে সুতার মতো
হয়ে চারা ঢলে পড়া লক্ষণীয়)

দমন ঃ আর্দ্র ও স্যাঁতস্যাঁতে জমিতে এ রোগ বেশি হয় বিধায় উঁচু এবং সুষ্ঠু পানি নিকাশযোগ্য জমিতে চারা তৈরি করতে হয়। মাটিতে জীবাণু থাকে এবং সেজন্য বপনের আগে বীজ ও বীজ তলার মাটি ওষুধ দিয়ে শোধন করে নিতে হয়। চারা গজানোর পর সকালের দিকে রোদ ওঠার পর অল্প অল্প পানি দিয়ে বীজতলার মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে। রোগ দেখা দিলে জমিতে চেসান্ট কম্পাউন্ড প্রয়োগ করতে হবে।



সারমর্ম ঃ মোজাইক রোগে পাতায় সবুজ ও হলুদ রঙের ছোপ ছোপ দাগ পড়ে এবং পাতা পাকিয়ে সূতাকৃতি হয়ে যায়। এনথ্রাকনোজ রোগ পাতা এবং কাঁচা ও পাকা পেঁপেতে প্রথমে হলদে পরে ও বাদামি দাগ উৎপন্ন করে। ধ্বসা রোগে মাটিসংলগ্ন স্থানে কান্ডে পানিভেজা দাগ হয় এবং ঐ স্থানে গাছ ভেঙ্গে পড়ে। মোজাইক ও এনথ্রাকনোজ রোগ দমনে যথাক্রমে কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক ছিটাতে হবে। ধ্বসা রোগ দমনে বীজতলার মাটি শোধন করে বীজ বপন করতে হবে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। পেঁপে গাছের মোজাইক রোগে পাতার সবুজ রঙের মধ্যে কী রঙের ছোপ ছোপ দাগ হয়?
- ক) বাদামি
- খ) হলুদ
- গ) বেগুনি
- ঘ) কালচে

২। পেঁপে গাছের মোজাইক রোগের লক্ষণ কোন্‌টি?
- ক) পাতা পাকিয়ে সুতাকৃতি হয়
- খ) পাতা গোড়া থেকে ভেঙ্গে পড়ে
- গ) পাতা চিকন হয়ে খাড়াভাবে থাকে
- ঘ) গাছে অনেক পাতা হয়

৩। পেঁপের এনথ্রাকনোজ রোগ কোথায় হয়?
- ক) কেবল পাতায় হয়
- খ) কেবল কাঁচা পেঁপেতে হয়
- গ) কেবল পাকা পেঁপেতে হয়
- ঘ) পাতা এবং কাঁচা ও পাকা পেঁপেতে হয়

৪। পেঁপের ধ্বসা রোগের প্রাথমিক লক্ষণ কোন্‌টি?
- ক) মাটিসংলগ্ন স্থানে কান্ডে পানি-ভেজা দাগ হয়
- খ) মাটিসংলগ্ন স্থানে কালো দাগ হয়
- গ) মাটিসংলগ্ন স্থানে কান্ডে লালচে দাগ হয়
- ঘ) মাটিসংলগ্ন স্থানে কান্ডে গলের সৃষ্টি হয়

৫। চারা ধ্বসা রোগ দমন ব্যবস্থাপনা কোন্‌টি?
- ক) মাটিতে গোবর সার অধিক পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে
- খ) মাটি ও বীজ ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধন করে বপন করতে হবে
- গ) সন্ধ্যার পর জমি পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে
- ঘ) ভোরে রোদ ওঠার আগে জমি পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে

পাঠ ৫.৪ পেয়ারা গাছের রোগ



এ পাঠ শেষে আপনি–

- পেয়ারা গাছের দুটি মারাত্তক রোগের কারণ বলতে ও লিখতে পারবেন।
- রোগ দুটির লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রোগ দুটির দমন ব্যবস্থা বলতে ও লিখতে পারবেন।



এনথ্রাকনোজ রোগ

কারণ ঃ পেয়ারার এ রোগটি খুবই মারাত্তক এবং *Colletotrichum psidi* নামক ছত্রাক দ্বারা হয়।

পেয়ারার এনথ্রাকনোজ রোগে ফলের উপর বেশ বড় বড় গোল ও গাঢ় বাদামি থেকে কালো রঙের দাগের সৃষ্টি হয়।

লক্ষণ ঃ শিকড় ছাড়া বাকি সব অংশই এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। সাধারণত ফল পাকার সময় এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। ফলের উপর বেশ বড় বড় গোল ও গাঢ় বাদামি থেকে কালো রঙের দাগের সৃষ্টি হয়। দাগগুলোর মাঝে বসে যেয়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। মাঝে মাঝে একের অধিক দাগ মিশে বড় দাগের সৃষ্টি হয়। এসব দাগের ক্ষতের মধ্যে প্রায় গোলাকার বিন্দুর ন্যায় অনেক কালো



চিত্র ৫৬ ঃ পেয়ারার এনথ্রাকনোজ রোগ
(বিভিন্ন পর্যায়ের দাগযুক্ত পেয়ারা)

কালো ছত্রাক অঙ্গ উৎপন্ন হয়। এগুলো ছত্রাকের স্তোর উৎপন্নকারী এসারভুলাস দিয়ে গঠিত। ক্রমে আক্রান্ত স্থান শক্ত ও খরখরে হয়ে যায়। ফল বিকৃত হয়ে ঝরে পড়তে পারে। এনথ্রাকনোজ রোগ

ডালেও হতে পারে। আক্রান্ত ডাল আগা থেকে নিচের দিকে আস্তে আস্তে শুকাতে থাকে।এজন্য অনেকে এ রোগকে ‘আগা শুকানো’ রোগ বলে থাকেন। ডাল শুকানোর সংগে সংগে পাতাও ঝরে যায়। এ কারণে আক্রান্ত গাছে অনেক পত্রবিহীন মৃত, অর্ধমৃত বা রোগাটে ডাল দেখা যায়। চিত্র ৫৬ এ এনথ্রাকনোজ রোগে আক্রান্ত পেয়ারা গাছের ডাল দেখানো হয়েছে।

দমন ঃ রোগাক্রান্ত ফল গাছ থেকে সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ফল ধরার সময় ও পরে ১৫ দিন পরপর কয়েকবার ছত্রাকনাশক (রোভরাল) প্রয়োগ করলে রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়।

ঢলে পড়া রোগ

কারণ ঃ *Fusarium oxysporum psidi* এবং *Rhizoctonia bataticola* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়।

লক্ষণ ঃ প্রথমে রোগের লক্ষণ গাছের একপাশের ডালে দেখা দেয়। তবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কান্ডটাই আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত ডালগুলোর পাতা ঢলে পড়ে ও ডাল শুকিয়ে যায়। কোনো কোনো ডালে নতুন পাতা জন্মায় না। কোনো কোনো ডাল পালায় দুচারটি নতুন পাতা জন্মালেও তা অল্প কয়েকদিনে শুকিয়ে যায়। ক্রমে সমস্ত গাছের পাতা ঝরে পড়ে এবং এক-দু বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ গাছ মরে যায়। আক্রান্ত গাছের কান্ড লম্বালম্বিভাবে কাটলে তার মধ্যকার টিসুকে বহুদূর পর্যন্ত বাদামি দেখায়। রোগাক্রান্ত গাছে কদাচিৎ ফল হয়। চিত্র ৫৭ এ ঢলে পড়া রোগে আক্রান্ত পেয়ারা গাছর বিভিন্ন পর্যায় দেখানো হয়েছে।



চিত্র ৫৭ ঃ পেয়ারা গাছের ঢলে পড়া রোগের বিভিন্ন পর্যায়; উপরে (ডানে)- একপাশের ডাল ঢলে পড়েছে (রোগের প্রাথমিক পর্যায়); (বামে)- সম্পূর্ণ গাছ ঢলে পড়েছে (রোগের চরম পর্যায়)

নিচে(বামে)- আক্রান্ত গাছের কান্ডমধ্যস্থিত টিস্যু বাদামি

দমন ঃ এ রোগের জীবাণু মাটিতে বেঁচে থাকে বিধায় ওষুধ স্প্রে করে কোনো ফল পাওয়া যায় না। গাছের গোড়ার দিকে কিছু স্থানের মাটি কুপিয়ে গন্ধক চূর্ণ প্রয়োগ করলে কিছুটা সুফল পাওয়া যায়।

রোগাক্রান্ত গাছ সমূলে উঠিয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করা উচিত।



সারমর্ম ঃ এনথ্রাকনোজ রোগে ডাল আগা থেকে নিচের দিকে শুকিয়ে আসে এবং ফলে বাদামি থেকে কালচে গোলাকার দাগ হয়। ঢলে পড়া রোগে প্রথমে গাছের একপাশের ডালের পাতা ঢলে পড়ে ও শুকিয়ে যায়। আক্রান্ত স্থানের কান্ডস্থিত টিস্যু বাদামি হয়ে যায়। এনথ্রাকনোজ রোগ দমনে ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হয়। ঢলে পড়া রোগের ক্ষেত্রে গাছের গোড়ায় গন্ধক চূর্ণ প্রয়োগ করে ও আক্রান্ত গাছ সমূলে উঠিয়ে নষ্ট করে দমনের চেষ্টা করতে হয়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। পেয়ারা গাছের এনথ্রাকনোজ রোগের বৈশিষ্ট্য কোন্‌টি?
- ক) সম্পূর্ণ গাছটি শুকিয়ে যায়
- খ) গোড়ার দিকের ডাল শুকিয়ে যায়
- গ) আগার দিকের ডাল শুকিয়ে যায়
- ঘ) বিভিন্ন স্থানে কিছু কিছু ডাল আগার দিক থেকে নিচের দিকে শুকিয়ে যায়

২। পেয়ারার এনথ্রাকনোজ রোগ গাছের কোন্‌ কোন্‌ অংশে হয়?
- ক) কেবল পাতায়
- খ) কেবল ডালে
- গ) কেবল ফলে
- ঘ) পাতায়, ডালে ও ফলের যে কোনো অংশে

৩। পেয়ারার উপর এনথ্রাকনোজ রোগে কী ধরনের দাগ উৎপন্ন হয়?
- ক) বড় বড় আঁকাবাকা লালচে দাগ
- খ) বড় বড় গোলাকার বাদামি থেকে কালচে দাগ
- গ) বড় বড় হলুদ আভাবেষ্টিত বাদামি দাগ
- ঘ) বড় বড় পানিভেজা দাগ

৪। পেয়ারা গাছের ঢলে পড়া রোগের বৈশিষ্ট্য কোন্‌টি?
- ক) প্রাথমিকভাবে গাছের একপাশের ডালের পাতা ঢলে পড়ে ও ডাল শুকিয়ে যায়
- খ) প্রাথমিকভাবে সম্পূর্ণ গাছের পাতা ঢলে পড়ে ও ডাল শুকিয়ে যায়
- গ) প্রাথমিকভাবে কিছু কিছু ডালের পাতা ঢলে পড়ে ও ডাল আগা থেকে নিচের দিকে শুকিয়ে আসে
- ঘ) প্রাথমিকভাবে গাছের সব ডালের পাতাই ঢলে পড়ে ও ডাল আগা থেকে নিচের দিকে শুকিয়ে আসতে থাকে

৫। পেয়ারা গাছের ঢলে পড়া রোগে আক্রান্ত গাছের কান্ড চিরলে ভিতরের টিস্যু কেমন দেখায়?
- ক) হলুদ বর্ণ
- খ) বাদামি বর্ণ
- গ) গোলাপি বর্ণ
- ঘ) কালো বর্ণ

পাঠ ৫.৫ লেবু গাছের রোগ



এ পাঠ শেষে আপনি–

- লেবু গাছের ক্ষতিকর তিনটি রোগের জীবাণুর নাম বলতে ও লিখতে পারবেন।
- রোগসমূহের লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বর্ণিত রোগসমূহের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্বন্ধে বলতে ও লিখতে পারবেন।



ক্যাঙ্কার রোগ

কারণ ঃ *Xanthomonas campestris* pv. *citri* নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে ক্যাঙ্কার রোগ হয়।

লক্ষণ ঃ রোগটি লেবু গাছের শিকড় ছাড়া সব অঙ্গেই হয়। কচি কচি পাতায় প্রথমে তেলের ছোট ছোট ফোটার ন্যায় দাগ পড়ে। রোগাক্রমণের কয়েক দিনের মধ্যে আক্রান্ত স্থান মোটা হয়ে মাঝখানকার টিস্যু সাদাটে রঙ ধারণ করে এবং ফোস্কার মতো উঁচু হয়ে বের হয়ে আসে। ক্রমে বয়স্ক দাগের রঙ বাদামি হয়ে খসখসে হয়ে যায়। তবে তার কেন্দ্রস্থল একটু নিচু থাকে বিধায় ঐ স্থান আগ্নেয়গিরির মুখের মতো মনে হয়। দাগের চারিদিক গ্রিজের (Grease) মতো মনে হয় এবং বৈশিষ্ট্যমূলক হলুদ আভা দিয়ে ঘেরা থাকে। এ দাগ পাতার উভয় পিঠে হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে উল্টাপিঠে বেশি হয় এবং এ পিঠ বেশি খসখসে মনে হয়। ধীরে ধীরে আরও অনেক দাগ সৃষ্টি হয় এবং আয়তনে বাড়তে বাড়তে পাতার অনেকাংশ জুড়ে ফেলে। অবশেষে দাগের মধ্যস্থিত টিস্যু শুকিয়ে খসে পড়ে। এর ফলে পাতায় ছোট ছোট ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। ডাল বা কাঁটাতে দাগ হলে তা পাতার দাগের ন্যায় চারপাশ দিয়ে তেমন কোনো হলুদ আভা থাকে না। ফলের উপর যেসব দাগ হয় তার মুখগবহর বেশ পরিস্ফুট। ফলের খোসার উপরের দাগের চারপাশেও হলুদ আভা থাকে না। এ রোগটি কেবল খোসায় সীমাবদ্ধ থাকে এবং ভেতরের রসালো অংশের বিশেষ ক্ষতি করে না। ফলে, এ রোগে ফলন কমে না কিন্তু দাগের জন্য বিশ্রী দেখায় এবং বাজারে কম দামে বিক্রি হয়। চিত্র ৫৮ এ ক্যাঙ্কার রোগে আক্রান্ত লেবু গাছ দেখানো হয়েছে।

> এ রোগটি খোসায় সীমাবদ্ধ থাকে এবং ভেতরের রসালো অংশের বিশেষ ক্ষতি করে না। ফলে, এ রোগে ফলন কমে না কিন্তু দাগের জন্য বিশ্রী দেখায় এবং বাজারে কম দামে বিক্রি হয়।

চিত্র ৫৮ ঃ লেবু গাছের ক্যাঙ্কার রোগ
উপরে- পাতায় হলুদ বলয় দ্বারা ঘেরা বাদামি রঙের খসখসে দাগ; নিচে- ডাল ও কাঁটায় খসখসে দাগ

দমন ঃ দাগবিহীন সতেজ চারা সংগ্রহ করে লাগাতে হবে। শুকনো আবহাওয়ায় (নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে) রোগাক্রান্ত গাছের ডালপালা ছেঁটে ফেলতে হয় এবং নতুন পাতা ও ডাল বের হওয়ার সময় এগ্রিমাইসিন নামক ছত্রাকনাশক (প্রতি লিটার পানিতে ৪০০ মিলিগ্রাম) ও তার সঙ্গে কিছু কীটনাশক মিশিয়ে স্প্রে করতে হয়। ফল ধরার ২-৩ মাস পর আবারও একবার ওষুধ স্প্রে করতে হবে।

স্ক্যাব রোগ

কারণ ঃ *Elsinoe fawcetti* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়।

স্ক্যাব রোগে পাতা ও ফলে সূচালো আচিলের মতো সৃষ্টি হয়।

লক্ষণ ঃ প্রথমে পাতার উপর ফিকে কমলা রঙের দাগ দেখা দেয়। রোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে স্ক্যাব দাগ আঁচিলের ন্যায় উচু হয়ে ওঠে। ফলে, উপরটা খসখসে হয়ে যায়। আঁচিলের নিচে পাতার উল্টা দিকে কিছুটা ডেবে যায়। পাতার উভয় পিঠেই এ দাগ হতে পারে তবে উল্টা পিঠে বেশি হয়। পাতার যে পিঠে দাগ হয় তার উল্টা পিঠে ঠিক দাগ বরাবর আঁচিলের অগ্রভাগ বেশ সূচালো (conical) হয়ে উঠতে থাকে। আঁচিলের উপর ফিকে হলদে-কমলা রঙের মামড়ি পড়তে দেখা যায় এবং ক্রমে তারা ধূসর বর্ণ ধারণ করে। চিত্র ৫৯ এ স্ক্যাব রোগে আক্রান্ত লেবুর পাতা, কাগজি লেবু ও মালটা দেখানো হয়েছে।



চিত্র ৫৯ ঃ লেবুর স্ক্যাব রোগ; উপরে (ডানে)- আঁচিলের ন্যায় স্ক্যাব দাগযুক্ত কোঁকড়ানো পাতা
বামে- সূচালোকৃতি স্ক্যাব দাগ (রোগের প্রাথমিক পর্যায়); নিচে (ডানে) - কাগজি লেবুর উপরে খসখসে স্ক্যাব দাগ
(মাঝে) - মালটার উপরে স্ক্যাবজনিত দাগ; (বামে) - স্ক্যাব দাগকে বড় করে দেখানো হয়েছে (দাগের মাঝখানটা ফাটা)

অতিশয় রোগাক্রান্ত পাতা অত্যধিক মাত্রায় কুচকে যায় ও বিকৃত হয়ে যায়। পাতা কুচকানো এ রোগের একটি বৈশিষ্ট্য। রোগের ব্যাপক প্রসার ঘটলে ডাল এবং ফলেও দাগের উপর অনুরূপভাবে ঘিয়ে বা কমলা রঙের আঁচিল দেখা দেয় এবং খোসার উপরটা কর্কের ন্যায় খসখসে হয়ে বিশ্রী দেখায়। রোগের শেষের দিকে আঁচিল ফেটে যেতে পারে। মারাত্মকভাবে আক্রান্ত ফল ঝরে পড়তে পারে।

দমন ঃ গাছ থেকে আক্রান্ত পাতা, ডাল ও ফল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। বসন্তকালে গাছে নতুন পাতা বের হওয়ার সময় একবার ও ফুল ফোটার পর আর একবার বোর্দো মিক্সচার বা অন্য কোনো ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে। নার্সারির কলমগুলোতে ১০-১৫ দিন পরপর ২-৩ বার ছত্রাকনাশক স্প্রে করা ভালো।

ডাইব্যাক রোগ

কারণ ঃ *Colletotrichum gloeosporoides* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়।

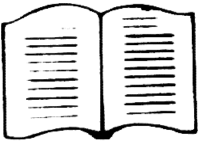


লক্ষণ ঃ গাছে পুরানো পাতায় ছোট ছোট হালকা সবুজ রঙের দাগ পড়তে থাকে। ক্রমে এগুলো বাদামি বর্ণ ধারণ করে। আর্দ্র আবহাওয়ায় আক্রান্ত অংশে ছত্রাকের অযৌন প্রজনন অঙ্গ (এসারভুলাস) অসংখ্য কালো কালো বিন্দুর ন্যায় উৎপন্ন হয়। ডালপালা আগার দিকে প্রথম আক্রান্ত হয় এবং ধূসর-রূপালি বর্ণ ধারণ করে। আক্রান্ত ডালের পাতা শুকিয়ে যায় এবং ফুল ও ছোট ছোট ফল ঝরে পড়ে। আক্রান্ত ডাল আগা থেকে শুরু করে নিচের দিকে ধীরে ধীরে শুকিয়ে আসতে থাকে। এজন্য এ রোগকে 'আগা শুকানো' রোগও বলা হয়ে থাকে। ডাল মরে গেলে তাতে অসংখ্য এসারভুলাস কালো কালো বিন্দুর ন্যায় দেখা দেয়। ফল আক্রান্ত হলে তার উপত্বকে শক্ত কুঁচকানো বাদামি রঙের দাগ পড়ে। চিত্র ৬০ এ ডাইব্যাক রোগে আক্রান্ত লেবু গাছ দেখানো হয়েছে।

> ডাইব্যাককে 'আগা শুকানো' রোগও বলা হয়ে থাকে। ডাল মরে গেলে তাতে অসংখ্য এসারভুলাস কালো কালো বিন্দুর ন্যায় দেখা দেয়।

চিত্র ৬০ ঃ লেবুগাছের ডাইব্যাক রোগ
(ডাল আগা থেকে নিচের দিকে শুকিয়ে আসছে)

দমন ঃ বাগানে নিরোগ চারা লাগাতে হবে। ঐ চারা বড় হওয়ার সময় গাছকে রোগাক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য জানুয়ারি ও সেপ্টেম্বর মাসে একবার করে ৪ঃ৪ঃ৫০ হারে রোজিন বোর্দো মিক্সচার স্প্রে করতে হবে। গাছের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য শিকড়ের চারদিকে সার ও সেচ দিয়ে গাছকে সতেজ রাখার চেষ্টা করতে হবে। মাটিতে ক্ষার বেশি থাকলে প্রত্যেক গাছের গোড়ায় ৪.৫ কেজি জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি বছর লেবু সংগ্রহের পর গাছের ডালপালা ছেটে পুড়িয়ে নষ্ট করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে ডাল ছাটার সময় যেন দাগের নিচেও কিছুটা অংশ কেটে ফেলা হয়। ডাল ছাটার পর কাটা অংশ দিয়ে জীবাণু যাতে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য কাটা মুখে আলকাতরা বা পেইন্ট লাগিয়ে দিতে হবে।



সারমর্ম ঃ ক্যাঙ্কার রোগ শিকড় ছাড়া সব অঙ্গেই ফোস্কার মতো উঁচু দাগ উৎপন্ন করে। দাগের চারিদকে গ্রিজের মতো মনে হয় এবং বৈশিষ্ট্যমূলক হলুদ আভা দিয়ে ঘেরা থাকে। এগ্রিমাইসিন স্প্রে করে এ রোগ দমন করতে হয়। স্ক্যাব রোগে পাতা, ডাল ও ফলের উপর আঁচিলের ন্যায় উঁচু দাগ হয় এবং তার উপরিভাগ খসখসে হয়। আক্রান্ত অংশসমূহ ধ্বংস করে ও রোগনাশক ছিটিয়ে এ রোগ দমন করা হয়। ডাইব্যাক রোগ নিয়ন্ত্রণে আক্রান্ত অংশসমূহ সংগ্রহ করে নষ্ট করতে হবে এবং রোগনাশক ছিটাতে হবে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। ক্যাঙ্কারজনিত দাগের বৈশিষ্ট্য কোন্‌টি?
- ক) দাগ বাদামি রঙের আভা দিয়ে ঘেরা থাকে
- খ) দাগ লালচে রঙের আভা দিয়ে ঘেরা থাকে
- গ) দাগ হলুদ রঙের আভা দিয়ে ঘেরা থাকে
- ঘ) দাগ ছাইয়ে রঙের আভা দিয়ে ঘেরা থাকে

২। ক্যাঙ্কার রোগ গাছের কোন্‌ অংশে হয়?
- ক) কেবল পাতায়
- খ) কেবল কান্ডে
- গ) কেবল ফলে
- ঘ) পাতা, কান্ড ও ফলে

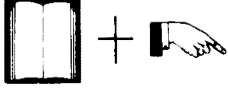
৩। ক্যাঙ্কারজনিত দাগ পাতার কোথায় হয়?
- ক) উভয় পিঠে হয় তবে উপরের পিঠে বেশি হয়
- খ) উভয় পিঠে হয়, তবে নিচের পিঠে বেশি হয়
- গ) কেবল উপরের পিঠে হয়
- ঘ) কেবল নিচের পিঠে হয়

৪। ক্যাঙ্কার রোগ দমনার্থে ছত্রাকনাশক কখন স্প্রে করতে হয়?
- ক) বছরের যে কোনো মাসে
- খ) বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে
- গ) বছরের জুন-আগষ্ট মাসে
- ঘ) বছরের জানুয়ারি-মার্চ মাসে

৫। স্ক্যাব রোগজনিত দাগ নতুন অবস্থায় দেখতে কেমন?
- ক) রূপালি রঙের মতো
- খ) পানিভেজার মতো
- গ) কালচে রঙের মতো
- ঘ) মাংসের রঙের মতো

ব্যবহারিক

পাঠ ৫.৬ ফলের রোগের নমুনা সংগ্রহ ও শণাক্তকরণ



এ পাঠ শেষে আপনি –

- রোগাক্রান্ত ফল গাছ ও ফলের নমুনা সংগ্রহ করতে পারবেন।
- ফলের রোগ শণাক্ত করতে পারবেন।



উপকরণ ঃ আক্রান্ত ফল গাছ ও ফল, ভাসকুলাম, মাটি খোড়ার যন্ত্র, ডালাপালা ছাঁটার কাঁচি, চোষ কাগজ বা খবরের কাগজ, ছোট করাত, হালকা প্রেস, ভারি প্রেস, হারবেরিয়াম শিট, ছোট আকারের কাগজের বাক্স, সেলোপেন, আঠা, গাম টেপ, লেবেল, নোটবুক, পেন্সিল, পারমানেন্ট কালি, হারবেরিয়াম শিট ও নমুনা সংরক্ষণের বিভিন্ন আধার, রোগ শণাক্তকরণের বিভিন্ন পুস্তক, ছবি, চার্ট ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

১. নমুনার জন্য সর্বদা সদ্য আক্রান্ত বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত গাছ বা তার অংশবিশেষ ও ফল সংগ্রহ করুন।

২. রোগ বৃদ্ধির বিভিন্ন অবস্থায় রোগের লক্ষণ কেমন হয় তা দেখার জন্য রোগের বিভিন্ন অবস্থার একাধিক নমুনা সংগ্রহ করুন (নমুনা সংগ্রহের সময় লক্ষ্য রাখবেন যেন উহাতে রোগজনিত ক্ষত ছাড়া পোকামাকড়জনিত ক্ষত বা অন্য কোনো ক্ষত না থাকে)।

৩. গাছের পাতা, শিকড়, কান্ড প্রভৃতির নমুনা সংগ্রহ করার সঙ্গে সঙ্গে চোষ কাগজ বা খবরের কাগজের মধ্যে নিয়ে হালকা প্রেসের মধ্যে চাপ দিয়ে রাখুন।

৪. নমুনা বড় হলে তা সংগ্রহ করে ভিজে কাগজ বা কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে ভাসকুলামে রাখুন।

৫. ফল সংগ্রহ করে সেলোপেন ব্যাগে মুখ বন্ধ করে রাখুন।

৬. বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করে ব্যবহারিক শ্রেণিকক্ষে নিয়ে আসুন।

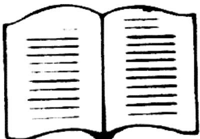
৭. ব্যবহারিক শ্রেণিকক্ষে রোগ শণাক্ত করার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন পুস্তক, ম্যানুয়াল, আলোকচিত্র ও ছবি এবং হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত শুকনো ও ভিজে নমুনার লক্ষণ মিলিয়ে রোগকে শণাক্ত করুন।

৮. সংগ্রহের পরপরই রোগ শণাক্ত করতে না পারলে নমুনাকে ফ্রিজ বা অন্য কোনো ঠান্ডাস্থানে রেখে দিন এবং সময় ও সুবিধা মতো শনাক্ত করার চেষ্টা করুন।

৯. বিভিন্ন পুস্তক, ছবি, হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত নমুনার সঙ্গে মিলিয়ে রোগকে নিশ্চিতভাবে শণাক্ত করতে না পারলে নমুনার রোগগ্রস্ত অংশ থেকে প্যাথোজেন বা রোগের জন্য দায়ী জীবাণুকে পৃথক করে বা আবাদমাধ্যমে চাষ করে মাইক্রোস্কোপে দেখুন ও জীবাণুকে শণাক্ত করুন (জীবাণু শণাক্তকরণ পদ্ধতি পাঠ ২.৭ এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

১০. পুস্তক, ছবি, হারবেরিয়াম শিট ও কাঁচের আধারে রক্ষিত নমুনার বৈশিষ্ট্য ও জীবাণুর বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে রোগকে নিশ্চিতভাবে শণাক্ত করুন।

১১. ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য শণাক্তকৃত রোগের নমুনাসমূহ তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী শুকিয়ে হারবেরিয়াম শিটে অথবা ভিজে অবস্থায় বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের দ্রবণে ডুবিয়ে সংরক্ষণ করুন (বিভিন্ন সংরক্ষণ পদ্ধতি পাঠ ২.৭ এ আলোচনা করা হয়েছে)।



সারমর্ম ঃ ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য রোগের নমুনাসমূহ তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী শুকিয়ে হারবেরিয়াম শিটে অথবা ভিজে অবস্থায় কাঁচের আধারে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের দ্রবণে ডুবিয়ে সংরক্ষণ করা হয়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৬

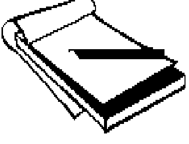
সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। রোগের কোন্ পর্যায়ে নমুনা সংগ্রহ করতে হয়?

- ক) রোগের লক্ষণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে
- খ) রোগ বর্ধনের মাঝামাঝি পর্যায়ে
- গ) গাছ বা তার কোনো অংশ মরে গেলে
- ঘ) রোগ বর্ধনের বিভিন্ন পর্যায়ে

২। নিশ্চিতভাবে রোগ শণাক্ত কীভাবে করতে হয়?

- ক) পুস্তকে বর্ণিত লক্ষণের সঙ্গে নমুনার লক্ষণ মিলিয়ে
- খ) রোগের বিভিন্ন ছবির সঙ্গে নমুনার লক্ষণ মিলিয়ে
- গ) হারবেরিয়াম শিটে বা কাঁচের আধারে রক্ষিত নমুনার সঙ্গে মিলিয়ে
- ঘ) উপরের সবগুলোর সাহায্যে ও জীবাণুর বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে



চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ৫

১। আমের এনথ্রাকনোজ রোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
২। কলা গাছের পানামা রোগের কারণ, লক্ষণ ও দমন পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
৩। পেঁপে গাছের মোজাইক রোগ সম্বন্ধে লিখুন।
৪। পেয়ারা গাছের ঢলে পড়া রোগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে লিখুন।
৫। লেবু গাছের কয়েকটি রোগের নাম কারণসহ লিখুন।
৬। ডাইব্যাক রোগের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।



উত্তরমালা - ইউনিট ৫

পাঠ ৫.১
১। ঘ   ২। ঘ   ৩। ঘ   ৪। ঘ   ৫। গ

পাঠ ৫.২
১। ক   ২। গ   ৩। গ   ৪। গ   ৫। গ

পাঠ ৫.৩
১। ক   ২। ক   ৩। ঘ   ৪। ক   ৫। খ

পাঠ ৫.৪
১। ঘ   ২। ঘ   ৩। খ   ৪। ক   ৫। ঘ

পাঠ ৫.৫
১। গ   ২। ঘ   ৩। খ   ৪। খ   ৫। ঘ

পাঠ ৫.৬
১। ঘ   ২। ঘ

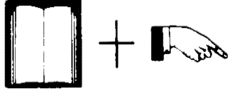
ইউনিট ৬ আগাছা

ইউনিট ৬ আগাছা

কৃষি খামার স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো অধিকতর উৎপাদন। কিন্তু রোগ ও কীটপতঙ্গের ন্যায় আগাছাও ফসলের মারাত্তক ক্ষতিসাধন করে উৎপাদন ব্যহত করে। প্রাথমিকভাবে আগাছাজনিত কারণে ফসলে যে ক্ষতি হয় তা বোঝা না গেলেও সামগ্রিকভাবে কীটপতঙ্গ ও রোগজনিত কারণের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি এদের দ্বারা হয়। আসলে আগাছা ফসল উৎপাদনকারীদের জন্য অনাকাংখিত গাছ। বাংলাদেশে আগাছার জন্য ফসলের উৎপাদন ২৫ শতাংশেরও কম হয়। অতএব, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে আগাছা শণাক্ত করে তাদেরকে ধ্বংস করতে হবে।

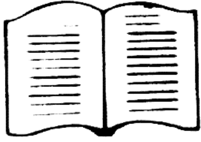
এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে আগাছার ধারণা, বৈশিষ্ট্য, শ্রেণিবিভাগ, আগাছা দমনের পদ্ধতি, সমন্বিত আগাছা দমন ব্যবস্থাপনা এবং মাঠ ফসলের প্রধান প্রধান আগাছা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়গুলো তাত্তিক ও ব্যবহারিকসহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৬.১ আগাছার ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিবিভাগ



এ পাঠ শেষে আপনি–

- আগাছা বলতে কী বুঝায় তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- আগাছার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন আগাছাকে শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন।



আগাছা কী?

বিভিন্ন বিজ্ঞানী আগাছাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে আগাছার কয়েকটি সংজ্ঞা দেয়া হলো। যথা-

১. ক্ষেতে ফসলের সঙ্গে জন্মানো অবাঞ্ছিত ক্ষতিকর গাছই আগাছা।
২. আগাছা যথোপযুক্ত স্থানে না জন্মানো এক প্রকারের উদ্ভিদ।
৩. ক্ষেতের চাষকৃত ফসল ছাড়া অন্যান্য সব গাছই আগাছা।
৪. নিজ অস্বিত্ত্ব রক্ষার জন্য স্বতন্ত্রভাবে খাদ্য সংগ্রহকারী প্রতিযোগী উদ্ভিদকে আগাছা বলা হয়।

ক্ষেতে ফসলের সঙ্গে জন্মানো অবাঞ্ছিত ক্ষতিকর গাছই আগাছা।

উপরে বর্ণিত সংজ্ঞাসমূহ থেকে এটা বলা যায় যে, আগাছা কৃষকদের কাম্য কোনো গাছ নয়। কারণ এরা মাটি থেকে খাদ্য আহরণ করে কাংখিত গাছের বৃদ্ধিতে বাধার সৃষ্টি করে। আগাছা চাষকৃত গাছের বৃদ্ধি, উৎপাদন, বংশ বিস্তার প্রভৃতির ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি করে।

বৈশিষ্ট্য

আগাছার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো -

- ক্ষেতে আগাছা ফসলের সাথে খাদ্য, পানি, আলো, বাতাস প্রভৃতির জন্য প্রতিযোগিতা করে।
- আগাছা ক্ষেতে রোগজীবাণু, পোকামাকড় প্রভৃতির আশ্রয়ের স্থান করে দেয়।
- চাষকৃত ফসলের তুলনায় আগাছা প্রতিকূল অবস্থায় জন্মাতে পারে এবং ঐ পরিবেশে অনেকদিন বেঁচেও থাকতে পারে।
- আগাছা অঙ্গজ উপায়ে ও বীজের মাধ্যমে চাষকৃত ফসলের চেয়ে খুব দ্রুত বংশ বিস্তার করে।
- চাষকৃত ফসলে যে পরিমাণ বীজ হয় তার তুলনায় আগাছা অত্যন্ত অধিক হারে বীজ উৎপন্ন করতে পারে।
- আগাছার কিছু কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে যা তাদের বিস্তৃতি লাভের জন্য খুবই সহায়ক। অনেক আগাছার বীজ খুবই ছোট ও হালকা। এ কারণে যেসব বীজ বাতাসের সাহায্যে খুব দ্রুত

বিস্তারলাভ করতে পারে। কিছু আগাছার ফল ও বীজ কন্টকময় যা গরুছাগলের গায়ে আটকে বিভিন্ন স্থানে ছড়াতে সাহায্য করে।

- কিছু আগাছা আছে যারা ফসল থেকে সরাসরি খাদ্যরস আহরণ করে (যথা-স্ট্রিগা)। এ স্ট্রীগা আখ, ভুট্টা, জোয়ার, তামাক প্রভৃতির ক্ষেতে জন্মায় এবং তাদের শিকড়ের সাথে সংযুক্ত হয়ে গাছ থেকে সরাসরি খাদ্যরস আহরণ করে তাকে দুর্বল করে ফেলে।
- আগাছা কেউ চাষ করে না এবং সেজন্য প্রতিকূল অবস্থায় বেঁচে থাকার জন্য তাদের গঠনও খুব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়।
- তুলনামূলকভাবে আগাছায় রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়।

শ্রেণিবিভাগ

উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহের জন্য আগাছা ফসলের অত্যন্ত ক্ষতিসাধন করে। অতএব, উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। আগাছা ধ্বংস করতে হলে তাদেরকে চিনতে হবে। আগাছা চেনার জন্যই তাদেরকে শ্রেণিবিভাগ করা প্রয়োজন। আগাছাকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা যায়। যথা-

পরিবেশভিত্তিক বা বাস্তুসংস্থানগত শ্রেণিবিভাগ

সব গাছ একই পরিবেশে জন্মাতে পারে না। কী পরিবেশে আগাছা জন্মায় তার ওপর ভিত্তি করে আগাছাকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা-

যেসব আগাছা স্যাঁতস্যাঁতে বা জলা জমিতে জন্মায় তাদেরকে জলজ আগাছা বলা হয়।

ক. জলজ আগাছা ঃ যেসব আগাছা স্যাঁতস্যাঁতে বা জলাভূমিতে জন্মায় তাদেরকে জলজ আগাছা বলা হয়। জলজ আগাছা বিভিন্ন পরিবেশে জন্মে থাকে এবং তার ওপর ভিত্তি করে এ ধরনের আগাছাগুলোকে বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয়েছে। যথা-

- **ভাসমান জলজ আগাছা-** এসব আগাছা কেবল পানির উপরে ভেসে বায়ুর সংস্পর্শে বেঁচে থাকে। মাটির সংগে এদের কোনো সংযোগ থাকে না। যথা- কচুরি পানা, টোপা পানা, ক্ষুদে পানা ইত্যাদি।
- **অবলম্ব জলজ আগাছা-** এ শ্রেণির আগাছা পানির নিচে ও মাটির উপরে অবস্থান করে বেঁচে থাকে। এরা কেবল পানির সংস্পর্শে থাকে কিন্তু বায়ু ও মাটির সঙ্গে এদের কোনো সংযোগ থাকে না। যথা - ঝাঁঝি।
- **সংযুক্ত প্লাবিত জলজ আগাছা-** এ আগাছার সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ অংশ পানির নিচে থাকে এবং গোড়া মাটির সংগে সংযুক্ত থাকে কিন্তু বায়ুর সাথে কোনো সংযোগ থাকে না। যথা- পানি কলা, পাতা ঝাঁঝি, হাইড্রিলা ইত্যাদি।
- **ভাসমান পাতাবিশিষ্ট সংযুক্ত প্লাবিত জলজ আগাছা-** এ আগাছা মাটি, পানি ও বায়ুর সংস্পর্শে থেকে জন্মায়। যথা- শাপলা, শালুক ইত্যাদি।
- **উভচর জলজ আগাছা-** এ আগাছা শুকনো মাটি ও পানিতে বেঁচে থাকতে পারে। শুকনো মাটিতে জন্মালেও এদের শিকড়, কান্ডের নিম্নাংশ এমনকী কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিচের পাতাও পানির নিচে অবস্থান করে বেঁচে থাকে। যথা - ধৈইঞ্চা, ভাতশোলা ইত্যাদি।
- **সিক্তভূমি জলজ আগাছা-** এ জাতীয় আগাছা আর্দ্র সম্পৃক্ত মাটির সাথে সংযুক্ত থেকে বেঁচে থাকে। এরা শুকনো জমিতে ও পানির নিচে জন্মাতে পারে না। যথা- বিষকাটালী, কানাইবাঁশি ইত্যাদি।

খ. মরুভূমিজ আগাছা ঃ এ আগাছা মরু অঞ্চলের আগাছা এবং খরা ও অপর্যাপ্ত পানিযুক্ত জমিতে জন্মায়। যথা - ফণিমনসা, ক্যাকটাস ইত্যাদি।

গ. লোনাভূমিজ আগাছা ঃ লবণাক্ত অঞ্চলের লোনা জমিতে উৎপন্ন আগাছাগুলো লোনাভ মিজ আগাছা বলা হয়। যেমন সল্টবুপ আগাছা (Atriplex patula) ইত্যাদি।

ঘ. স্থলজ আগাছা ঃ যেসব আগাছা মধ্যম আর্দ্রতা সম্পন্নজমিতে জন্মায় সেগুলোকে স্থলজ আগাছা বলে। এরা জলাবদ্ধতা ও দীর্ঘস্থায়ী খরা সহ্য করতে পারে না। যথা- শ্যামা ও দূর্বা ঘাস, বথুয়া ইত্যাদি।

জীবনচক্রভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ

জীবনচক্রের ওপর ভিত্তি করে আগাছাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

জীবন-চক্রের ওপর ভিত্তি করে আগাছাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. বর্ষজীবী আগাছা ঃ যেসব আগাছা এক বছর বা তার কম সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকে তাদেরকে বর্ষজীবী আগাছা বলা হয়। এগুলো বীজের সাহায্যে বংশ বিস্তার করে। যথা- বথুয়া , কাঁটানটে, শ্যামা ঘাস ইত্যাদি।

খ. দ্বিবর্ষজীবী আগাছা ঃ যেসব আগাছা দুবছর বা তার কম কিন্তু এক বছরের বেশি সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে সেগুলোকে দ্বিবর্ষজীবী আগাছা বলা হয়। এসব আগাছা প্রথম বছরে মাটির মধ্যে ভালো করে শিকড় প্রবেশ করিয়ে অঙ্গজ বৃদ্ধি করে এবং দ্বিতীয় বছরে ফুল ও ফল উৎপাদন করে মরে যায়। যথা- গাজর।

গ. বহুবর্ষজীবী আগাছা ঃ যেসব আগাছা দুবছরের বেশি সময় বেঁচে থাকে সেগুলোকে বহুবর্ষজীবী আগাছা বলা হয়। এসব আগাছা থেকে প্রত্যেক বছরই অনুকূল আবহাওয়ায় নতুনভাবে গাছের জন্ম হয় ও বাড়তে থাকে এবং বীজ ও অঙ্গজ অংশ দ্বারা বংশ বিস্তার করে । যথা- দুর্বা, কাশ, মুথা ইত্যাদি।

মৌসুমভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ

এ পদ্ধতিতে আগাছা বছরের কোনো সময় হয় তার উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। যথা-

ক. খরিপ আগাছা ঃ এসব আগাছা খরিপ মৌসুমে অর্থাৎ এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে

জন্মায়। গরম আবহাওয়ায় এদের বৃদ্ধি বেশি হয়। যথা- শ্যামা, হাতিশ ড়, জয়না ইত্যাদি।

খ. রবি আগাছা ঃ অপেক্ষাকৃত কম গরম আবহাওয়ায় রবি মৌসুমে অর্থাৎ অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত সময়ে জন্মায় রবি মৌসুমীয় আগাছা। যথা- বথুয়া, নুনেশাক ইত্যাদি।

পাতার আকৃতি ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ

পাতার আকৃতির ওপর ভিত্তি করে আগাছাকে দুভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা-

ক. চিকন পাতাবিশিষ্ট আগাছা ঃ এ বিভাগের আগাছার পাতা গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত ক্রমশ: সরু হয় এবং সাধারণত গ্রামিনি ও সাইপেরেসি পরিবারের গাছ। গ্রামিনি পরিবারভুক্ত আগাছা ঘাসজাতীয় গাছ। এদের কান্ড ফাঁপা, খাড়া ধরনের অথবা লতানো অবস্থায় থাকে। এদের পাতা একক, একান্তর ও সমান্তরাল শিরাবিন্যাস বিশিষ্ট। এরা বর্ষজীবী অথবা বহুবর্ষজীবী গাছ। যথা- শ্যামা, দুর্বা, চাপড়া প্রভৃতি ঘাস। সাইপেরেসি পরিবারভুক্ত আগাছা সেজজাতীয় গাছ। এদের কান্ড ত্রিকোনাকৃতি বা গোলাকার এবং ফাঁপা। পাতা খাড়া বা তীর্যকভাবে থাকে। এদের অনেকেই রাইজোমের (Rhizome) সাহায্যে বংশ বিস্তার করে । যেমন- চেচড়া, মুথা, হলদে মুথা ইত্যাদি।

খ. চওড়া পাতাবিশিষ্ঠ আগাছা ঃ এ ধরনের আগাছা সাধারণত দ্বিবীজপত্রী। পাতা একক বা যৌগিক এবং জালিকা প্রকৃতির শিরাবিন্যাস বিশিষ্ট । যথা- কচুরি পানা, পানিকচু ইত্যাদি।

নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ

এ ধরনের আগাছাকে দুভাবে বর্ণনা করা যায়। যথা-

যেসব আগাছা কেবল আবাদি জমিতে জন্মায় এবং প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জে অন্যান্য উদ্ভিদের সংগে বেঁচে থাকতে পারে না তাদেরকে অবলিগেইট আগাছা বলা হয়।

ক. অবলিগেইট আগাছা ঃ যেসব আগাছা কেবল আবাদি জমিতে জন্মায় এবং প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জে অন্যান্য উদ্ভিদের সংগে বেঁচে থাকতে পারে না তাদেরকে অবলিগেইট আগাছা বলা হয়। যথা- ফিল্ড বাইন্ডউইড (Field Bind Weed)।

খ. সুবিধাবাদী আগাছা ঃ এ জাতীয় আগাছা সাধারণত বনেজঙ্গলে জন্মে এবং সুযোগ পেলেই চাষকৃত জমিতেও জন্মাতে পারে। যেমন Opuntia spp.

ক্ষতির মাত্রা অনুসারে শ্রেণিবিভাগ-

এ নীতি অনুসারে আগাছাকে দুভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা-

ক. সাধারণ আগাছা ঃ এসব আগাছা কম বীজ উৎপন্ন করে এবং কম ক্ষতি করে। এদেরকে দমন করাও সহজ।

খ. ক্ষতিকর আগাছা ঃ এ জাতীয় আগাছা খুব বেশি পরিমাণ বীজ উৎপন্ন করে এবং খুব দ্রুত বিস্তারলাভ করে। এদের দমন করাও খুব কষ্টকর।

রীতিভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ

আমাদের দৈনন্দিন কাজের সুবিধার্থে এবং প্রয়োজনের সময় সঠিক জায়গা থেকে সঠিক বস্তুটি পাওয়ার জন্য আমরা যেমন বিভিন্ন বস্তুকে সঠিক স্থানে সাজিয়ে রাখি তেমনি বিভিন্ন আগাছাকেও ঠিকমতো চেনার জন্য বিশেষ রীতি অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। পৃথিবীর অসংখ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন আগাছার মধ্যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কিছু না কিছু পার্থক্য আছে এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে তাদের মধ্যকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য মিলিয়ে উদ্ভিদতাত্ত্বিক সুষ্ঠু রীতি অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। রীতিভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ খুব বড় বিধায় তাদের বিস্তারিত শ্রেণিলতা না দিয়ে কয়েকটি পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কিছু আগাছার বাংলা ও বৈজ্ঞানিক নাম সারণি ২ এ দেয়া হলো।

সারণি ২ঃ আগাছার রীতিভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ

পরিবার	আগাছা	বৈজ্ঞানিক নাম
Amaranthaceae	কাঁটা নটে শাক নটে শাক মালঞ্চ	*Amaranthus spinosus* *A. viridis* *Alternanthera philoxeroides*
Araceae	টোপাপানা কচু	*Pistia stratioites* *Calocasia esculenta*
অষরংসধপবধব	চাঁদমালা ছোট কুট	*Sagittaria guyanensis* *S. sagittifolia*
Boraginaceae	হাতিশুঁড়	*Heliotropium indicum*
Cyperaceae	মুথা ঘাস (চিত্র- ৬১) হলদে মুথা (চিত্র- ৬১) বড় চুচা (চিত্র- ৬১) শক্ত খাগড়া চেচরা ক্ষুদে চেচরা জয়না (চিত্র- ৬১) মাটি চেচ	*Cyperus rotundus* *C. esculentus* *C. iria* *C. pilosus* *Scirpus mucronatus* *S. supinus* *Fimbristylis miliacea* *F. dichotoma*



wPÎ 61 t Cyperaceae cwievii Pvi wUNvm; evg ‡_‡K Wv‡b- Rqbvl Zvi gÄix
nj ‡` gyvl Zvi gÄix; gyvl Zvi gÄixGes eo P‡ovl Zvi gÄix

সারণি- ২ ঃ আগাছার রীতিভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ

পরিবার	আগাছা	বৈজ্ঞানিক নাম
Chenopodiaceae	বথুয়া চাপালি ঘাস	*Chenopodium album* *C. ambrosioides*
Compositae	কেশটি হেলেঞ্চা শিয়ালমুত্রা ঘাঘরা বন শিমুল বন লেটুস বন সরিষা মরিচ ঘাস বন মূলা	*Eclipta alba* *Enhydra fluctuans* *Blumea lacera* *Xanthium indicum* *Sassurea affinis* *Cotula chinensis* *Brassica kaber* *Lepidium densiflorum* *Raphanus raphanistrum*
Commelinaceae	কানাইবাশী মনায়না পানি কলাগাছি কমেলিনা কানাইনালা	*Commelina bengalensis* *C. diffusa* *C. auriculata* *C. paleata* *Cyaotis axillaris*
Cactaceae	ফণি মনসা	*Opuntia dellenii*
Convolvulaceae	কলমী লতা (চিত্র ৬২) স্বর্ণলতা মর্নিং গ্লোরি বিন্দলতা	*Ipomoea aquatica* *Cuscuta reflexa* *Ipomoea purpurea* *Convolvulus arvensis*
Euphorbiaceae	বড় দুধিয়া ছোট দুধিয়া বন মরিচা	*Euphorbia hirta* *E. microphylla* *Croton sparsiflorus*
Gramineae	শ্যামা ঘাস (চিত্র ৬২) ক্ষুদে শ্যামা (চিত্র ৬২) দুর্বা ঘাস চাপড়া ঘাস (চিত্র ৬২) আরাইলা চেলা ঘাস গিটলা ঘাস	*Echinochloa crusgalli* *E. Colonum* *Cynadon dactylon* *Eleusine indica* *Leersia hexandra* *Parapholis strigosa* *Paspalum disticum*



wPÎ 62 t Graminea cwievti i Pvi wU Nvm; evg †_‡K Wv‡b- Pvc ovl Zvi gÄi x
†gvi v‡i v l Zvi gÄi x; k¨vgvl Zvi gÄi x Ges ¶z‡` k¨vgvl Zvi gÄi x

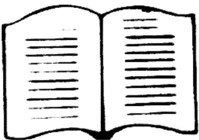
সারণি ২ ঃ আগাছার রীতিভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ

পরিবার	আগাছা	বৈজ্ঞানিক নাম
Gramineae	কাশ	*Saccharum sponteneum*
	উলু ঘাস	*Imperata cylindrica*
	প্রেম কাটা	*Chrysopogon aciculatus*
	ঝরা ধান	*Oryza rufipogon*
	দুধ নল	*Eragrostis cilianensis*
	ছোট দুধ নল	*E. aspera*
	বরেন্দা ঘাস	*Panicum repens*
	আঙ্গুলী ঘাস	*Digitaria sanguinalis*
	মোরারো (চিত্র ৬১)	*Ischaemum rugosum*
	গইচা	*Paspalum commersonni*
	ময়ুরলেজা ঘাস	*Leptochloa panicea*
	ফুলকা ঘাস	*Leptochloa chinensis*
Labiateae	রক্তদ্রোণ	*Leonurus sibiricus*
	শ্বেতদ্রোণ	*Leucus aspera*
	শিয়াল লেজা	*Dysophylla crassicaulis*
Lentibulariaceae	ঝাঝি	*Utricularis flexuosa*
Leguminosae	ভাতশোলা	*Aeschynomene aspera*
	আরাইচা	*Cassia tora*
	লজ্জাবতী	*Mimosa pudica*
	বন্য মশুর	*Vicia sativa*
	মসুর চানা	*V. hirsuta*
	নারিন্দা ঘাস	*Desmodium gangeticum*
Lemnaceae	ক্ষুদে পানা	*Lemma minor*
	তিলক পানা	*L. trisulaca*
Malvaceae	কানফুল	*Sida vernicaefolia*
	বেরেলা	*S. cordifolia*
Nymphaceae	শালুক	*Nymphaea lotus*
	শাপলা	*N. nuchali*
	নীল পদ্ম	*N. stellete*
	রক্ত কমল	*N. rubra*
	পদ্ম	*Nilumbo nucifera*

সারণি ঃ আগাছার রীতিভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ

পরিবার	আগাছা	বৈজ্ঞানিক নাম
Oxalidaceae	আমরুল শাক	*Oxalis europaea*
Onagraceae	হেলেঞ্চা	*Jussieua repens*
Pontederiaceae	কচুরি পানা পানি কচু (চিত্র ৬৩)	*Eichhornia crassipes* *Monochoria hastata*
Papaveraceae	শিয়ালকাঁটা	*Argimone mexicana*
Polygonaceae	বিষকাঁটালী তিতা মরিচ পানি মরিচ	*Polygonum hydropiper* *Rumex obtusifolius* *Polygonum orientale*
Portulaceae	নুনিয়া	*Portulaca oleracea*
Polypodiaceae	ঢেঁকিশাক	*Dryopteris fillix-mas*
Sphenocleaceae	ঝিল মরিচ (চিত্র ৬৩)	*Sphenoclea zeylanica*
Solanaceae	তিতা বেগুন বন্য বেগুন কাঁটা বেগুন ধুতুরা ফোসকা বেগুন	*Solanum torvum* *S. nigrum* *S. carolinense* *Datura stramonium* *Physalis heterophylla*
Umbelliferae	থানকুনি বন ধনিয়া বন গাজর	*Hydrocotyle asiatica* *Oenanthe bengalensis* *Daucus carota*
Verbenaceae	কাঁটা মেহেদী মটকা	*Duranta plumeri* *Lippia germinata*

wPÎ 63 t weyfb œ wewfbœi K‡qKwU AvMvQv ev †K‡ÎK Ww‡b- Kj gyi Zv
cwb KPzI Zvi gÄixGes wSj gwP I Zvi gÄix



সারমর্ম ঃ আগাছা এক প্রকারের প্রতিযোগিজাতীয় অবাঞ্ছিত গাছ। এসব গাছ প্রতিকূল পরিবেশে বাঁচতে পারে এবং অধিক হারে বীজ উৎপন্ন করে দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করতে পারে। এদের রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়। আগাছাকে পরিবেশ, জীবনচক্র, মৌসূম, পাতার আকৃতি, ক্ষতির মাত্রা প্রভৃতির ওপর ভিত্তি করে বিভিন্নভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন আগাছার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে তাদের মধ্যকার সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য মিলিয়ে উদ্ভিদতাত্ত্বিক সুষ্ঠু রীতি অনুযায়ী আগাছাকে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। চাষকৃত ফসলের তুলনায় আগাছা কত বীজ উৎপন্ন করে?
- ক) অধিক পরিমাণ বীজ উৎপন্ন করে
- খ) কম পরিমাণ বীজ উৎপন্ন করে
- গ) প্রায় সম পরিমাণ বীজ উৎপন্ন করে
- ঘ) কোন বীজই উৎপন্ন করে না

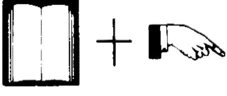
২। আগাছার বীজের বৈশিষ্ট্য কী?
- ক) খুবই ছোট ও হালকা
- খ) খুবই ছোট ও ভারি
- গ) খুবই বড় ও হালকা
- ঘ) খুবই বড় ও ভারি

৩। আগাছাকে সাধারণত কয় ভাগে বিভক্ত করা যায়?
- ক) দুই ভাগে
- খ) তিন ভাগে
- গ) চার ভাগে
- ঘ) পাঁচ ভাগে

৪। জলজ আগাছা কোথায় অবস্থান করে?
- ক) কেবল পানির উপর ভাসমান অবস্থায়
- খ) কেবল পানির নিচে ও মাটির উপরে ভাসমান অবস্থায়
- গ) কেবল পানির নিচে মাটির সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায়
- ঘ) পানির ওপরে, পানি ও মাটির উপরে ও মাটির সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায়

৫। বিষকাটালী কোথায় জন্মে?
- ক) পানিতে
- খ) মরুভূমিতে
- গ) লোনা ভূমিতে
- ঘ) স্থলে

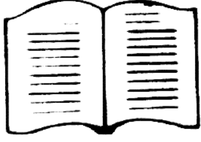
পাঠ ৬.২ আগাছা দমনের পদ্ধতি



এ পাঠ শেষে আপনি–

- আগাছা দমনের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে বলতে ও লিখতে পারবেন।

আগাছা কৃষকদের জন্য আপত্তিকর উদ্ভিদ এবং সেজন্য মানব কল্যাণের স্বার্থে আগাছা দমন খুবই প্রয়োজন। আগাছা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা সম্ভব নয় কিন্তু বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে আগাছার ক্ষতিকর প্রভাবকে অনেক নিম্ন পর্যায়ে রাখা যায়। যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করে কম সময়ে কম খরচে আগাছার ক্ষতিকর প্রভাবকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা যায় সেগুলোই কৃষকদের অনুসরণ করতে হবে।



দমন পদ্ধতি

আগাছা দমনের বিভিন্ন পদ্ধতির একটি শ্রেণিকরণ নিম্নে দেয়া হয়েছে।

১. প্রতিরোধকরণ পদ্ধতি

২. উচ্ছেদ বা নির্মূলকরণ পদ্ধতি

৩. নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

১। দৈহিক পদ্ধতি

২। পরিচর্যা পদ্ধতি

(১) ভূমি কর্ষণ
(২) আঁচড়া দেয়া
(৩) কর্তন
(৪) মাটি কোপানো
(৫) নিড়ানী দেয়া
(৬) জাবড়া প্রয়োগ
(৭) পোড়ানো
(৮) প্লাবন
(৯) মাটি তুলে দেয়া
(১০) বেড়ার ব্যবহার
(১১) শস্য পর্যায়

৩। জৈবিক পদ্ধতি

(১) কীটপতঙ্গ ব্যবহার
(২) উদ্ভিদ ব্যবহার
(৩) রোগজীবাণু ব্যবহার

৪। রাসায়নিক পদ্ধতি

দমনের প্রক্রিয়া অনুসারে ঃ
(১) স্পর্শক আগাছানাশক
(২) প্রবাহমান (Systemic) আগাছানাশক

ক্রিয়াশিলতার স্থান অনুসারে
(১) মাটিতে প্রয়োগ পদ্ধতি
(২) পাতায় প্রয়োগ পদ্ধতি

৫। সমন্বিত পদ্ধতি

১. প্রতিরোধকরণ (Prevention) পদ্ধতি

আবহাওয়া ও অন্যান্য নানাবিধ কারণের জন্য সব আগাছা সব দেশে হয় না। কিন্তু কোনোভাবে আগাছা কোন দেশে এসে পড়লে কয়েক বছরের মধ্যে ঐ আগাছার বিস্তারলাভের সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য ফসলের বীজ বা অন্য কোনো অঙ্গের মাধ্যমে আগাছার বীজ যাতে এক দেশ থেকে অন্য দেশে আসতে না পারে তার জন্য উদ্ভিদ সঙ্গরোধ বা কোয়ারেন্টাইন কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা রাখে। এটি একটি আইনগত (Regulatory) ব্যবস্থা। দেশে হয় না এরকম কোনো আগাছার বীজ যাতে অন্য দেশ থেকে আসতে না পারে তা দেখাই এ আইনের মূল লক্ষ্য। এ আইনে শস্য বীজের সঙ্গে কোনো আগাছার বীজের বিদেশ থেকে প্রবেশ যেমন নিয়ন্ত্রিত হতে পারে তেমনি দেশের মধ্যে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ক্ষতিকর আগাছার বিস্তার নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। একটি দেশের একস্থান থেকে অন্যস্থানে আগাছার বিস্তার রোধের ব্যবস্থাগুলো হচ্ছে-

- দেশের মধ্যে আন্তবিভাগ বা আন্তজেলা পর্যায়ে কোয়ারেন্টাইন পদ্ধতি অনুসরণ করা।
- বীজ অনুমোদন কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- ফল ও বীজ উৎপাদনের পূর্বে জমির আইল ও রাস্তার পাশের আগাছা কেটে ফেলা।
- সেচের নালা আগাছামুক্ত রাখা।
- আগাছা বীজমুক্ত জৈবসার ব্যবহার করা।
- পশুর গায়ে আগাছার বীজ লেগে থাকলে বিচরণের আগে তা পরিষ্কার করা।

কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা সফল করতে হলে জলপথ, স্থলপথ ও বিমান পথে দেশের প্রবেশদ্বারগুলোতে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ যথেষ্ট সংখ্যক ইন্সপেক্টর থাকতে হবে যাঁরা বিদেশ থেকে আসা বীজ ও গাছগাছড়ার অন্যান্য অংশ পরীক্ষা করে দেখবেন সেগুলো আগাছা বীজ ও গাছের অন্যান্য অংশ মুক্ত কি-না। আমদানিকৃত গাছগাছড়া আগাছামুক্ত হলে প্রশংসাপত্র দেয়ার পর সেগুলোকে খালাস করার অনুমতি দেয়া হয়।

২. উচ্ছেদ বা নির্মলকরণ (Eradication) পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে কোনোস্থানে আগাছার বীজ, বংশবিস্তারকারী অন্যান্য অংঙ্গসমূহ, এমনকী কোনো কোনো সময় সম্পূর্ণ গাছকেই এমনভাবে নষ্ট করতে হবে যেন সেখান থেকে নতুন করে আগাছা বীজ বিস্তারলাভ করতে না পারে।

কোয়ারেন্টাইন ও উচ্ছেদ পদ্ধতি আগাছা নিয়ন্ত্রণের খুব সফল পদ্ধতি নয়। বীজ বিভিন্নভাবে এক দেশ থেকে অন্য দেশে আসে এবং সব বীজকে পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব নয়। তাছাড়া পানি ও বায়ু প্রবাহের

মাধ্যমে আগাছার বীজ সহজেই বিস্তারলাভ করে বিধায় উচ্ছেদকরণ পদ্ধতিও বাস্তবে তেমন ফলপ্রস হয় না। তবে, কোনো কোনো স্থানে (যথা- সবুজঘর, কাঁচঘর) উচ্ছেদকরণ ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারে।

ডনয়ন্ত্রণ (Control) পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে আগাছাকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করা হয় না। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষতিকর পর্যায়ের নিচে রাখা যায়। বাস্তবে কোয়ারেন্টাইন ও উচ্ছেদ পদ্ধতি পূর্ণাঙ্গভাবে সফল হয় না বিধায় ফসল উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ থেকে নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসরণ করাই শ্রেয়। মাটির আগাছাকে বেশ কয়েকটি কৃত্রিম পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

১. দৈহিক (Physical) পদ্ধতি

শারীরিক শক্তি ব্যবহার করে আগাছা দমনকে দৈহিক পদ্ধতি বলে। হাতে টেনে অল্প জায়গার অগভীর মূলজাতীয় আগাছাকে মূলসমেত উপড়ে ফেলে নিধন করা যায়। আমন ধানের ক্ষেতের আগাছা, পুকুরের টোপা পানা, কচুরি পানা, হেলেঞ্চা প্রভৃতি আগাছাও হাতে টেনে তোলা হয়। সাধারণত ভিজে জমির আগাছাই হাতে টেনে তুলতে সহজতর হয়। অনেক সময় রোপা ধানের ক্ষেতের মধ্যে হেটে পা

দিয়ে দাবিয়ে আগাছাকে কাদার মধ্যে পুঁতে দমন করা হয়। দৈহিক পদ্ধতির সুবিধা হলো যে এ পদ্ধতিতে কোনো যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না, তেমন কোনো অভিজ্ঞতারও দরকার হয় না। মাটিতে পুঁতে দেয়া আগাছা মাটিতে জৈব পদার্থ যোগ করে এবং ভিজে মাটিতে খুব কার্যকরী হয়। তবে, এ পদ্ধতির কিছু কিছু অসুবিধাও আছে, যথা- সময় বেশি লাগে, শুকনো মাটি ও গভীরমূলী আগাছার জন্য উপযুক্ত নয়, বেশি বড় জমির জন্য প্রযোজ্য নয় এবং ব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশি হয়।

২. *পরিচর্যা (Cultural) পদ্ধতি*

অনেক সময় দেখা গেছে যে সাধারণভাবে অনুসৃত চাষের পদ্ধতিগুলোর কিছু রদবদল করলে জমির পরিবেশে পরিবর্তন ঘটে। ফলে আগাছার প্রকোপ কমে যায়। বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে পরিচর্যার কাজ সহজ ও দ্রুততর করা হয়।

(১) ভূমি কর্ষণ ঃ লাঙ্গল দিয়ে চাষ করলে জমির আগাছা কিছু আলগা হয়ে যায় এবং মাটি একটু শুকানোর পর মই দিয়ে জমির ঢেলা গুঁড়ো করে মাটির উপরিভাগ সমান করার সময় আগাছা পৃথক হয়ে পড়ে এবং জমি থেকে তাদেরকে সহজেই সংগ্রহ করা যায়। যেসব আগাছা এক বর্ষজীবী এবং মাটির নিচে অল্প গভীরে শিকড় বিস্তার লাভ করে তাদেরকে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে সহজে মেরে ফেলা যায়। তবে, মুথা সৃষ্টিকারী আগাছা ও দ্বিবর্ষজীবী এবং বহুবর্ষজীবী আগাছাকে মারতে হলে গভীরভাবে বার বার চাষ করতে হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের ভূনিস্থ শিকড়ের টুকরোগুলো শুকিয়ে মরে যায়। জমি কর্ষণে মাটি আলগা হওয়ার ফলে ঢেলা বাতাস ও রোদে শুকিয়ে যায় এবং পানির অভাবে শিকড়ও শুকিয়ে মরে যায়। বহুবর্ষজীবী আগাছাকে নষ্ট করতে হলে চারা অবস্থাতে জমিতে চাষ দিতে হবে। কন্দ ও মূলযুক্ত আগাছার ক্ষেত্রেও জমি বারে বারে চাষ দিয়ে মাটিকে ওলটপালট করে শুকিয়ে ধ্বংস করতে হবে। সাধারণত গ্রীষ্মকালে প্রখর রোদে এসব ভূমি কর্ষন পদ্ধতি খুব কার্যকর হয়।

(২) আঁচড়া দেওয়া (Hoeing) ঃ চারা অবস্থায় বৃষ্টিপাত অথবা সেচের পর মাটি শুকিয়ে গেলে মাটির ওপর একটি স্তর সৃষ্টি হয়। ঐ স্তরকে আঁচড়া দিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার সময় অনেক আগাছা উঠে আসে এবং শুকিয়ে মরে যায়। সাধারণত ঘন চারাযুক্ত শস্যের ক্ষেতে এ প্রথা বেশ ব্যবহৃত হয়। এ কাজে হস্ত, পশু ও যন্ত্রচালিত বিভিন্ন ধরনের আঁচড়া ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

(৩) কর্তন (গড়রিহম) ঃ মোয়ার যন্ত্র, দা, কাঁচি প্রভৃতি বিভিন্ন যন্ত্রের দ্বারা আগাছার বিটপ, ফুল ও বীজ হওয়ার আগে কেটে নষ্ট করে ফেললে বীজ হতে সুযোগ পায় না এবং নতুনভাবে আগাছা জন্মায় না। সাধারণত লম্বা ধরনের বর্ষজীবী আগাছাকে ফুল ও ফল ধরার আগে কেটে ফেলতে হয়। চাষকৃত জমি ছাড়াও রাস্তাঘাটের আশেপাশের ও অন্যান্য অনেক স্থানের বহুবর্ষী আগাছা নিয়ন্ত্রণে এ পদ্ধতি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। ঘাসের আঙ্গিনার (খধহি) শোভা বর্ধনের জন্য কিছুদিন পরপর ঘাস কেটে সমান করে রাখা হয়। এ পদ্ধতিতে ঘাস মরে না কিন্তু বারে বারে কাটার ফলে ঘাসে শাখাপ্রশাখা খুব বেশি হয়ে আঙ্গিনাকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে ফেলে। এর ফলে ঐ আঙ্গিনায় অন্যান্য আগাছা তেমন জন্মাতে পারে না।

(৪) মাটি কোপানো (Spading) ঃ যেসব বাগানে সারিবদ্ধভাবে যথেষ্ট দূরত্বে গাছ লাগানো হয় সেখানে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে মাটি আলগা করা হয়। কোপানোর সময় মাটিকে উল্টিয়ে দিলে আগাছা মাটির নিচে চাপা পড়ে মরে যায়।

(৫) নিড়ানি দেওয়া (Weeding) ঃ বর্ষজীবী, অগভীরম লী ও শুকনো জমির আগাছা হাতনিড়ানি দিয়ে উঠিয়ে ফেলা হয়। তবে, বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক নিড়ানি আবিষ্কৃত হয়েছে যা দিয়ে সারিতে রোপনকৃত কর্দমাক্ত ও পানিযুক্ত ধান ক্ষেতের আগাছাকে নষ্ট করা হয়।

(৬) জাবড়া প্রয়োগ (Mulching) ঃ এ পদ্ধতিতে গাছের গোড়ায় বা সারির মধ্যবর্তী স্থান শুকনো খড়, কচুরিপানা, করাতে গুঁড়ো, তুষ প্রভৃতি পুরু করে বিছিয়ে দেওয়া হয়। এসবের আচ্ছাদনে নিচে

সূর্যালোকের অভাবে আগাছা জন্মাতে পারে না। জাবড়ার পুরুত্ব নির্ভর করে আগাছার প্রকৃতির ওপর। বহুবর্ষজীবী গভীরমূলী আগাছার জন্য জাবড়া অনেক পুরু করে দিতে হয়। বর্তমানে অনেকে আখ, আনারস প্রভৃতি ফসলে প্লাস্টিক দিয়ে মাটি ঢেকে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করে।

(৭) পোড়ানো পদ্ধতি (Burning) ঃ অনেক দেশে আগাছার ক্ষেতে, চারণক্ষেতে (Pasture) আগুন লাগিয়ে আগাছা ধ্বংস করা হয়। আগুনে যেমন আগাছা পুড়ে যায় তেমনি উত্তপ্ত মাটির সংস্পর্শে এসে মাটির কয়েক সেন্টিমিটার নিচে অবস্থানরত আগাছার বীজও সজীবতা হারিয়ে ফেলে।

(৮) প্লাবন পদ্ধতি (Flooding) ঃ কিছু কিছু বিশেষ আগাছাকে পানির নিচে ডুবিয়ে মেরে ফেলা হয়। কৃত্রিমভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করলে আগাছা তার প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও আলো না পেয়ে মারা যায়। বেলে মাটিতে এ পদ্ধতিতে তেমন ভালো ফল পাওয়া যায় না। কারণ, মাটিতে পানি বেশি সময় জমে থাকে না। পানি সহজলভ্য না হলে এ পদ্ধতি খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। এ পদ্ধতির একটি খারাপ দিক হচ্ছে প্লাবনের জন্য ব্যবহৃত পানির সঙ্গে নতুন আগাছার বীজ প্লাবিত জমিতে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য সবসময় আগাছামুক্ত ক্ষেত থেকে প্লাবনের পানি আনতে হবে।

(৯) মাটি তুলে দেয়া (Earthing up) ঃ গোল আলু, কলা, কচু, মিষ্টি আলু, চীনাবাদাম, আখ প্রভৃতি ফসলে গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দেওয়া হয়। এর ফলে প্রথমে মাটি আলগা করার সময় অনেক আগাছা নষ্ট হয়ে যায় এবং পরে মাটি গোড়ায় দেয়ার ফলে চাপা পড়ে আগাছা হতে পারে না।

(১০) বেড়া দেয়া (Fencing) ঃ বর্ষার সময়ে খালবিলের পানির সাথে কচুরিপানা ভেসে এসে অনেক জমির মধ্যে প্রবেশ করে ফসল নষ্ট করে দেয়। এ পানার প্রবেশে বাধা সৃষ্টির জন্য জমির চারদিকে অথবা স্রোতের বিপরীতে বাঁশের বেড়া নির্মাণ করা হয়ে থাকে।

(১১) শস্য-পর্যায় (Crop rotation) পদ্ধতি ঃ শস্যপর্যায় জমির উর্বরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং আগাছা দমন করে। সাধারণত একই শস্যের চাষ বছরের পর বছর করা হলে বিশেষ বিশেষ আগাছার পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে। কিন্তু ঐ জমিতে প্রতিবছর একই শস্যের পরিবর্তে অন্য শস্যের পর্যায়ক্রমে চাষের ব্যবস্থা করলে ঐসব আগাছা তত বেশি হতে পারে না। সুতরাং কোনো জমিতে পর্যায়ক্রমে ছিটানো ও সারিশস্য এবং তরিতরকারি চাষ করলে সেখানে বিশেষ বিশেষ আগাছার প্রকোপ অনেক কমে যায়।

৩. জৈবিক (Biological) পদ্ধতি

জৈবিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হলো জীব দ্বারা জীবকে নিয়ন্ত্রণ করা। বিভিন্ন প্রকারের কীটপতঙ্গ, পশু, রোগজীবাণু ও উদ্ভিদ দ্বারা অগাছাজনিত ক্ষতির পরিমাণ অনেক কমানো যায়। জৈবিক পদ্ধতিতে আগাছাকে দমনকল্পে তার প্রাকৃতিক শত্রুকে ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতির মূলনীতি হলো কোনো আগাছা দমনে যে জীব শত্রুটিকে ব্যবহার করা হবে তা কেবল ঐ আগাছারই শত্রু হবে এবং ফসল কিংবা অন্য কোনো জীবের কোনো ক্ষতি করবে না।

(১) কীটপতঙ্গ দ্বারা আগাছা দমনঃ কীটপতঙ্গ অনেক আগাছা খেয়ে নষ্ট করে ফেলে। আর্জেন্টিন মথ বোরার দ্বারা অস্ট্রেলিয়াতে প্রিকলি পিয়ারস্ দমন, পোকা দ্বারা আগাছা দমনের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রিকলি পিয়ারস্ প্রথমে বাহারী গাছের জন্য লাগানো হয়, কিন্তু ১৮৩৯ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে এ গাছটি খুব দ্রুত ছড়িয়ে ৬০ মিলিয়ন একর জমিতে বিস্তার লাভ করে এবং চাষি জমির পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে কমে যায়। এ গাছের বিস্তার রোধকল্পে গবেষণা করতে করতে দেখা গেল আর্জেন্টিন মথ *(Cactobastis cactorum)* নামক এক প্রকার বোরার (Borer) তার চরম ক্ষতিসাধন করতে পারে কিন্তু অন্য গাছ আক্রমণ করে না। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে প্রিকলি পিয়ারস্ দমনার্থে অস্ট্রেলিয়াতে এ পোকা আমদানি করা হয় এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এ পোকা এত অধিক সংখ্যায় বংশ বিস্তার করে

যে মৌসুমের মাঝামাঝিতে সব প্রিকলি পিয়ারস্ ধ্বংস হয়ে যায়। পোকা দ্বারা আগাছা দমনের আরও কয়েকটি উদাহরণ আছে এবং বর্তমানে এ পদ্ধতি আমেরিকার পশ্চিমা রাজ্যগুলোতে চালু আছে।

(২) উদ্ভিদ দ্বারা আগাছা নিয়ন্ত্রণ ঃ এ পদ্ধতিতে এক প্রকারের উদ্ভিদ দ্বারা আগাছাকে নষ্ট করা হয়। মিকানিয়া লতা গাছ খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে অল্প সময়ে অনেক এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে পারে। অতএব, সাধারণ পদ্ধতিতে এদের দমন করা খুবই কষ্টসাধ্য। তবে মিকানিয়া আগাছাসম্পন্ন কোনো জমিতে (বিশেষ করে চায়ের জমিতে) মাইমোসা গণের একটি লতানো প্রজাতির বীজ বপন করলে অল্প কিছুদিনের মধ্যে মিকানিয়াকে এমনভাবে ছেয়ে ফেলে যে জীবনধারণের প্রতিযোগিতায় মিকানিয়া টিকতে না পেরে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। স্বর্ণলতাও আগাছা দমনে ব্যবহৃত করা যায়। তবে এ লতা অনেক গাছকে আক্রমণ করে বিধায় তা খুব সতর্কতার সংগে ব্যবহার করতে হবে।

(৩) রোগজীবাণু দ্বারা আগাছা নিয়ন্ত্রণ ঃ অনেক আগাছা ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, প্রটোজোয়া দ্বারা আক্রান্ত হলে নষ্ট হয়ে যায়। এসব জীবাণুর বিশেষ বিশেষ প্রজাতি যারা কেবল বিশেষ বিশেষ আগাছাকে আক্রমণ করে তাদেরকে ব্যবহার করে আগাছা দমন করা হয়। Northern Joint Vetch একপ্রকার লিগুমিনাসজাতীয় আগাছা যা ধানের জমির খুবই ক্ষতিকর আগাছা। *Colletotrichum gloeosporoides* নামক ছত্রাকটি ক্ষেতে ছিটালে ধান গাছের কোনো ক্ষতি হয় না কিন্তু Northern Joint Vetch খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রোগজীবাণু দ্বারা আগাছা দমনের আরও উদাহরণ আছে। এ পদ্ধতিতে আগাছা দমন করতে হলে জীবাণুকে কৃত্রিম আবাদমাধ্যমে চাষ করতে হবে এবং উহাকে আগাছা পূর্ণ জমিতে যথাসময়ে ছিটাতে হবে। অন্যান্য জৈবিক পদ্ধতির ন্যায় এ ক্ষেত্রেও লক্ষ্য রাখতে হবে জীবাণুটি আগাছা বাদ দিয়ে যেন মূল শস্যকে আক্রমণ না করে।

জৈবিক পদ্ধতিতে বিশেষ ধরনের আগাছা দমন করা সুবিধাজনক। তবে, এ পদ্ধতির অসুবিধা হলো যে এতে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন এবং গবেষণাগারের ফলাফলকে মাঠে প্রয়োগ করা বেশ কষ্টসাধ্য।

৪. রাসায়নিক পদ্ধতি

রাসায়নিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ ব্যবহার করে আগাছা ধ্বংস করা হয়। আমাদের দেশের আবহাওয়া আগাছা জন্মানোর জন্য খুবই অনুকূল। সারাবছর বিভিন্ন পরিচর্যা পদ্ধতিতে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা শ্রম ও ব্যয়সাপেক্ষ। বিশেষ করে বর্ষকালে আগাছা সুষ্ঠুভাবে দমন করা খুবই কষ্টকর। তাছাড়া আমাদের দেশে আগাছা দমনে জৈবিক পদ্ধতির তেমন প্রচলন নেই। এসব কারণে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিতে অল্প শ্রম ও ব্যয়ে রাসায়নিক পদ্ধতি আগাছা দমনে ভালো অবদান রাখতে পারে। কিন্তু এদেশে এখনও রাসায়নিক পদ্ধতিতে আগাছা দমন খুবই অবহেলিত। রাসায়নিক পদ্ধতিতে আগাছা ধ্বংস করার প্রধান ভিত্তি হচ্ছে আগাছার শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন ক্রিয়াতে ব্যাঘাত ঘটানো। আগাছা দমনে ব্যবহৃত ওষুধকে আগাছানাশক (Weedicide) বলে। আগাছানাশককে দুভাগে বিভক্ত করা যায়- লতাপাতা গুল্মজাতীয় আগাছা দমনে ব্যবহৃত ওষুধকে গুল্মনাশক (Herbicide) এবং বৃক্ষজাতীয় আগাছা দমনে ব্যবহৃত ওষুধকে বৃক্ষনাশক (Aboricide) বলে।

আগাছা দমনে ব্যবহৃত ওষুধকে আগাছানাশক (Weedicide) বলে।

দমনের প্রক্রিয়া অনুসারে ঃ

(১) স্পর্শক আগাছানাশক ঃ কিছু কিছু আগাছানাশক আছে যাদের সংস্পর্শে আসলেই গাছ মরে যায়। এ ধরনের ওষুধকে স্পর্শক (Contact) আগাছানাশক বলে। এদেরকে গাছের পাতা বা গোড়ায় ব্যবহার করা হয়। যথা- ডিনোসেব (DNBP), পেন্টাক্লোরোফিনল (PCP)। স্পর্শকজাতীয় আগাছানাশকের সংস্পর্শে আসলে আগাছার দেহকোষের মেমব্রেনের ভেদ্যতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে কোষের ভিতরের দ্রব্যসমূহ বাইরে বের হয়ে আসতে থাকে এবং সবশেষে কোষগুলো অবিন্যস্ত হয়ে আগাছা মরে যায়। স্পর্শক আগাছানাশক খুবই বিষাক্ত এবং ব্যবহারের কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাছ মরে যায়।

(২) প্রবাহমান আগাছানাশক ঃ কিছু আগাছানাশক আছে যা প্রয়োগে আগাছার দেহে বিশোষিত হয়ে নানাবিধ শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপে বিঘ্ন ঘটিয়ে গাছকে মেরে ফেলে। এ ধরনের যৌগ মাটি, পাতা বা গোড়া যেখানেই প্রয়োগ করা হোক না কেন গাছের পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এ ধরনের যৌগকে প্রবাহমান (Systemic) আগাছানাশক বলে। যথা- লিনুরোন, ম্যালিক হাইড্রাজাইড, পাইক্লোরাম প্রভৃতি। প্রবাহমান আগাছানাশক আগাছার দেহের মধ্যে বিশোষিত হয়ে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে বিঘ্ন ঘটাতে থাকে এবং গাছ কয়েক দিন থেকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মরে যায়। এ ধরনের যৌগের কার্যক্রম ধীরগতিতে চলে বিধায় স্পর্শক আগাছানাশকের ন্যায় প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে গাছ মরে না। প্রবাহমান আগাছনাশক ব্যবহারে আগাছায় মাইটোটিক কোষ বিভাজনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, কলাতন্ত্র গঠনে (Tissue System Development) বাধা পড়ে, সালোকসংশ্লেষণের হিল বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের চলাচলে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় সালোকসংশ্লেষণে ব্যাঘাত ঘটে, শ্বসন ঠিকমতো হতে পারে না, এনজাইমের কার্যকারিতায় বিঘ্ন ঘটে এবং এসব শারীরবৃত্তীয় অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য আগাছা মারা যায়।

আগাছানাশক প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ মাঠে ফসলের বৈশিষ্ট্য ও বয়স, আগাছার বৈশিষ্ট্য ও বয়স, আগাছানাশকের প্রকৃতি, যন্ত্রপাতির প্রাপ্যতা, দক্ষ জনশক্তি, আর্থিক সুবিধা প্রভৃতির ওপর আগাছানাশকের প্রয়োগ পদ্ধতি নির্ভর করে।

ক্রিয়াশীলতার স্থান অনুসারে ঃ

মাটিতে প্রয়োগ পদ্ধতি- মাটির উপর ও নিচে উভয় স্থানেই দানাদার, গুঁড়ো বা তরল অবস্থায় আগাছানাশক রোপনের পূর্বে, অঙ্কুরোদ্গামপূর্ব বা অঙ্কুরোদ্গামউত্তর পর্যায়ে প্রয়োগ করা যায়। মাটির উপরে পূর্ণ মাঠে, সারিতে সারিতে, বা গর্তে আগাছানাশক ছড়িয়ে দেয়া হয়। কোনো কোনো আগাছানাশক উদ্বায়ী প্রকৃতির (যথা- মিথাইল ব্রোমাইড)। এ জাতীয় আগাছানাশক মাটির ওপরে প্রয়োগ করে পলিথিন বা ত্রিপল দিয়ে কয়েক দিন ঢেকে রাখা হয়। সাধারণত বীজতলার মাটির জন্য এ ধরনের ওষুধ ব্যবহার করা হয়।

মাটির নিচে আগাছানাশককে কোনো না কোনোভাবে স্থাপন করে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বিভিন্ন ধরনের ইনজেকটরের সাহায্যে নির্দিষ্ট দূরত্বে ও গভীরতায় ফিউমিগ্যান্ট (Fumigant) বা ধূয়া সৃষ্টিকারী আগাছানাশক (যথা- ক্লোরোপিকরিন) প্রবিষ্ট করে অথবা সিঞ্চন যন্ত্রের সাহায্যে জমির সারিতে ৭-৮ সে.মি. গভীরে আগাছানাশক (যথা- সাইকোলেট, বিউটাইলেট) ছিটিয়ে প্রয়োগ করা হয়।

পাতায় প্রয়োগ পদ্ধতি- আগাছার অঙ্কুরোদ্গামের পর নির্দিষ্ট হারে স্পর্শক বা প্রবাহমান আগাছানাশক স্প্রে যন্ত্র দ্বারা গাছের উপর ছিটানো হয়। আগাছানাশক ছিটানোর সময় আগাছার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এর সঙ্গে আঁঠালো পদার্থ, ওয়েটিং এজেন্ট, ইমালসিফায়ার অথবা ডিটারজেন্ট ব্যবহার করা হয়। পাতায় প্রয়োগযোগ্য কয়েকটি আগাছানাশক হলো ডালাপান, সিলভেক্স, ম্যালিক হাইড্রাজাইড, ২, ৪-ডি, পাইক্লোরাম, ডাইকুয়াট প্রভৃতি।

সাধারণত একটি আগাছানাশক একবারে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু কোনো কোন সময়ে একাধিক আগাছানাশক একত্রে মিশিয়ে প্রয়োগ করা হয়। অনেক সময় কোম্পানি একাধিক আগাছানাশক মিশিয়ে বিক্রির জন্য বাজারজাত করে। একাধিক ওষুধ মিশানোর জন্য আগাছানাশকের বিষাক্ততার মেয়াদ দীর্ঘায়িত হয়, আগাছা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ পৃথক পৃথকভাবে প্রয়োগ করলে যে ফল পাওয়া যায়, একত্রে মিশিয়ে ব্যবহার করলে বেশি ভালো ফল পাওয়া যায় তাছাড়া শ্রম, সময় ও অর্থও কম ব্যয় হয়। একাধিক আগাছানাশকের মিশ্রণের কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেয়া হলো। যথা-
(১) Atrzaine + TCA_2, (২) MCPA + Dicamba,
(৩) Diuron + TCA, (৪) 2, 4-D + 2, 4.5-T,
(৫) Dicamba + 2, 4-D, (৬) Amitrole + Simazine।

রসায়নিক পদ্ধতির অনেক সুবিধা আছে, যথা- শ্রম ও সময় কম লাগে, ব্যয় কম হয়, ভূমি ক্ষয় হয় না, জমিতে আগাছা মিশে যেয়ে জৈব পদার্থ যুক্ত হয়, নির্বাচিত আগাছা দমন করা সহজ, ফসলের গোড়া পর্যন্ত সব আগাছা ধ্বংস করা যায়, ফসলের কোনো ক্ষতি হয় না এবং ভিজে ও শুকনো সব ধরনের মাটিতে প্রয়াগ করা যায়। এ পদ্ধতির কিছু কিছু অসুবিধাও আছে, যথা- বিশেষ কারিগরি জ্ঞান থাকা দরকার, মাটির গুণাগুণ ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে, আগাছা ছিটানোর জন্য ব্যয় বহুল যন্তেরও প্রয়োজন হয়, সবসময় বাজারে উপযুক্ত আগাছানাশক পাওয়া নাও যেতে পারে।



সারমর্ম ঃ দৈহিক পদ্ধতিতে আগাছা হাতে টেনে, পা দিয়ে মাটিতে দাবিয়ে, পরিচর্যা পদ্ধতিতে জমিতে কর্ষণ দিয়ে, আচড়া দিয়ে, নিড়ানি দিয়ে, জাবড়া প্রয়োগ করে, মাটি তুলে দিয়ে, পানি দিয়ে প্লাবিত করে, শস্য পর্যায়ে চাষাবাদ করে, কীটপতঙ্গ উদ্ভিদ ও রোগজীবাণু ব্যবহার করে, আগাছানাশক ছিটিয়ে আগাছা নষ্ট করা হয়। এক দেশে থেকে অন্য দেশে আগাছার বীজ যাতে না আসাতে পারে সেজন্য কোয়ারেন্টাইন কার্যক্রম বিশেষভাবে প্রয়োগ করতে হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় একের অধিক পদ্ধতি অবলম্বন করে আগাছা নিধনে বেশি সুফল পাওয়া যায়।



পাঠোত্তর মুল্যায়ন ৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। আগাছা দমন পদ্ধতিসমূহকে কত ভাগে বিভক্ত করা যায়?
- ক) দু ভাগে
- খ) তিন ভাগে
- গ) চার ভাগে
- ঘ) পাঁচ ভাগে

২। আগাছাকে সাধারণত কত পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করা যায়?
- ক) তিন
- খ) চার
- গ. পাঁচ
- ঘ) এগারো

৩। স্পর্শক ছত্রাকনাশক কোন্‌টি?
- ক) লিনুরোন
- খ) পাইক্লোরাম
- গ) পেন্টাক্লোরোফিনল
- ঘ) ম্যালিক হাইড্রাজাইড

৪। প্রবাহমান আগাছানাশক কোন্‌টি?
- ক) লিনুরোন
- খ) ডিনোসেব
- গ) পেন্টাক্লোরোফিনল
- ঘ) ভ্যাপাম

৫। আগাছা দমনে কোন্ ওষুধটি ফিউমিগ্যান্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়?
- ক) ক্লোরোপিকরিন
- খ) ডায়থেন এম-৪৫
- গ) কুপ্রাভিট
- ঘ) ডায়ফোলাটান

পাঠ ৬.৩ সমন্বিত আগাছা দমন ব্যবস্থাপনা



এ পাঠ শেষে আপনি–

- সমন্বিত পদ্ধতিতে আগাছা দমনের অর্থ কী তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- সমন্বিত পদ্ধতিতে কীভাবে আগাছা দমন করা হয় তা বর্ণনা করে লিখতে পারবেন।

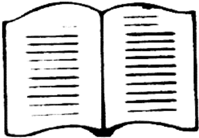


একাধিক দমন পদ্ধতির সমন্বয়ে আগাছা দমনকে সমন্বিত পদ্ধতিতে আগাছা দমন বলা হয়। আগাছ দমনের জন্য এক ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করে ততটা ভালো ফল পাওয়া যায় না। এজন্য একাধিক পদ্ধতি অবলম্বন করে অনেক আগাছাকে দমন করতে হয়। বর্তমানে সমন্বিত পদ্ধতিতে আগাছা দমনের বিষয়টিকে খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

মাঠের জমিকে লাঙ্গল দিয়ে কেবল চাষ করলে তার আগাছা কিছুটা আলগা হয়ে যায় কিন্তু আগাছা তেমন একটা মরে না। এ কারণে ঐ চাষকৃত জমি একটু শুকালে মাটির ঢেলাগুলো গুঁড়ো করার জন্য মই দিয়ে মাড়িয়ে দিতে হয়। এর ফলে আগাছাসমূহ মাটি থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়ে যায় এবং সহজেই তা বেছে সরিয়ে ফেলা যায়।

অনেক জমিতে বড় ও ছোট বিভিন্ন ধরনের আগাছা জন্মাতে দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে অগভীর ম লী আগছাকে মূলসমেত হাতে টেনে উপড়ে ফেলা যায় কিন্তু ছোট ছোট আগাছা হাতে টেনে উঠিয়ে ধ্বংস করা সম্ভব নয়। এ পরিস্থিতিতে বড় বড় আগাছা উঠিয়ে আগাছানাশক ছিটিয়ে অন্যান্য আগাছাকে মারার চেষ্টা করতে হয়। বীজতলা তৈরি করার সময় মটিকে বারে বারে কুপিয়ে গুঁড়ো করা হয়। এর ফলে অনেক আগাছা বিনষ্ট হয় কিন্তু বপন করলে বীজতলায় নতুন করে অনেক আগাছা জন্মাতে দেখা যায়। এ কারণে মাটি গুঁড়ো করার পর ফরমালিন, ক্লোরোপিকরিন, ভ্যাপাম প্রভৃতি মাটিশোধক ওষুধ ব্যবহার করে বীজতলার আগাছার বীজ ধ্বংস করা হয়। এরপরেও চারাগাছের মধ্যে কিছু কিছু আগাছা জন্মাতে দেখা যায়। সেজন্য চারার মধ্য থেকে নিড়ানি দিয়ে সব আগাছা তুলে ফেলতে হয়।

আগাছা দমন করে জমি খালি রাখলে আগাছা দমনের কোনো অর্থই হয় না। কারণ খালি স্থানে অন্য আগাছা জন্মানোর সুযোগ পায়। সেজন্য আগাছা দমন করে সেখানে ফসলের উৎপাদন করতে হয়। অস্ট্রেলিয়ায় অনেক অব্যবহৃত জমিকে ব্যবহার করার জন্য প্রথমে আগাছা কেটে, পুড়িয়ে ও আগাছানাশক ছিটিয়ে আগাছা নষ্ট করা হয়। তারপর আকাশ থেকে বহুবর্ষী ঘাসের বীজ ছিটানো হয়। ঐ বীজ থেকে জন্মানো ঘাস খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে আগাছাকে দমন করে এবং জমি গরুছাগলের চারণক্ষেত্র হিসেবে উপযোগী করা হয়। সমন্বিত পদ্ধতি সবচেয়ে উপযোগী পদ্ধতি তাতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এ পদ্ধতিতে আগাছা দমনের পরিকল্পনা প্রণয়ন বেশ জটিল।



সারমর্ম ঃ এক পদ্ধতিতে আগাছা দমন সফল হয় না। বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পদ্ধতিতে আগাছাকে দমন করতে হয়। একাধিক দমন ব্যবস্থার সমন্বয়ে আগাছা দমন করাই সমন্বিত দমন ব্যবস্থা। বিভিন্ন দৈহিক ও পরিচর্যা পদ্ধতির সমন্বয় করে আগাছা সফলভাবে দমন করা যায়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। সমন্বিত পদ্ধতিতে আগাছা দমনের অর্থ কী?

ক) বিভিন্ন ভৌত পদ্ধতির সমন্বয় করে আগাছা দমন করা
খ) বিভিন্ন রাসায়নিক পদ্ধতির সমন্বয় করে আগাছা দমন করা
গ) বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক পদ্ধতির সমন্বয় করে আগাছা দমন করা
ঘ) সুবিধামতো একাধিক পদ্ধতির সমন্বয় করে আগাছা দমন করা

২। বীজতলার আগাছার বীজ ধ্বংস করার জন্য কোন্‌টি ব্যবহার করা হয়?

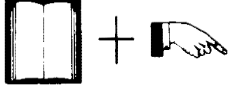
ক) ফরমালিন
খ) ইথানল অ্যালকোহল
গ) এসিটিলিন
ঘ) ক্লোরোফর্ম

৩। কোন দেশে অব্যবহৃত জমিকে ব্যবহার করার জন্য আগাছা কেটে, পুড়িয়ে, আগাছা নাশক ছিটিয়ে আগাছা নষ্ট করা হয়?

ক) ভারত
খ) পাকিস্তান
গ) অস্ট্রেলিয়া
ঘ) শ্রীলংকা

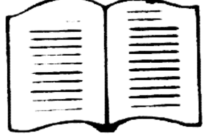
ব্যবহারিক

পাঠ ৬.৪ মাঠ ফসলের প্রধান প্রধান আগাছা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ



এ পাঠ শেষে আপনি–

- আগাছা সংগ্রহ করে সংরক্ষণের উদ্দেশ্য কী তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- আগাছা কীভাবে সংগ্রহ করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সংগ্রহ করার পর আগাছার নমুনা কীভাবে সংরক্ষণ করতে হবে তা বলতে ও লিখতে পারবেন।



আগাছা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্য

- আগাছা সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে সারা বছর ওসব গাছের বৈশিষ্ট্যের সাথে নতুন সংগৃহীত আগাছার বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে একে যথার্থভাবে শণাক্ত করা।
- ব্যবহারিক ক্লাশে ছাত্রছাত্রীদেরকে সারাবছরই যে কোনো মৌসূমের যে কোনো আগাছার সঙ্গে পরিচিত করতে সাহায্য করা।
- বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজে সাহায্য করা।
- অনেক গাছ পৃথিবী থেকে বিভিন্ন কারণে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তাই কখনো কোনো আগাছা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে সংগৃহীত আগাছার মাধ্যমেই তার অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যকে ধরে রাখা।

নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি

উপকরণ ঃ মাটি খোড়ার যন্ত্র , ডালপালা ছাঁটার কাচি, ভাসকুলাম বা পলিথিন ব্যাগ, হালকা প্রেস বা ফিল্ড প্রেস, লেবেল, সূতা, পেন্সিল, খাতা প্রভৃতি।

কাজের ধাপ

- সর্বদা আদর্শ নমুনা বাছাই করুন। এসব নমুনাতে কোনো রোগের লক্ষণ থাকবে না, ছেড়া বা ক্ষত থাকবে না, পোকামাকড়ের আক্রমণজনিত কোনো ক্ষত থাকবে না, গাছ বা এর কোনো অংশ মরা হবে না।
- নমুনা বাছাই করার পর মাটি খোড়ার যন্ত্র দিয়ে শিকড়, কান্ড, পাতা, ফুল ও ফলসহ সম্পূর্ণ গাছ সতর্কতার সঙ্গে সংগ্রহ করুন। সর্বদা একাধিক নমুনা সংগ্রহ করুন।
- শিকড় ও মাটির নিচের অংশ থেকে সবসময় মাটি ও ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করুন।
- নমুনা সংগ্রহের সময় গাছের প্রকৃতি, রঙ, প্রচলিত নাম, সংগ্রহের তারিখ, স্থান, প্রভৃতির বিবরণ নোট খাতায় লিখুন এবং প্রত্যেকটি নমুনার একটি করে সংগ্রহ নম্বর লেবেলে লিখে নমুনার সঙ্গে বেঁধে রাখুন।
- সংগৃহীত নমুনাসমূহ পলিথিন ব্যাগ, ভাসকুলাম অথবা হালকা প্রেসের মধ্যে রেখে গবেষণাগারে নিয়ে আসুন এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করুন।

নমুনা সংরক্ষণ পদ্ধতি

আগাছা সাধারণত শুকিয়ে নমুনা স্থাপন কাগজে (Herbarium sheet) স্থাপন করা হয়। নমুনাকে বিশেষ পদ্ধতিতে শুকাতে হয়।

উপকরণ ঃ ভারি ও মজবুত প্রেস, চোষ কাগজ অথবা খবরের কাগজ, নমুনা স্থাপন কাগজ (Herbarium sheet), আঁঠা, তুঁতে, গামটেপ, লেবেল, সুতা, কাঁচি ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

- প্রথমে একটি চোষ কাগজ অথবা খবরের কাগজের উপর নমুনা রাখুন। নমুনা ছোট আকৃতির হলে একাধিক আগাছা একটি কাগজের উপর ফাঁক ফাঁক করে রাখুন। নমুনা স্থাপনের পর তার উপর আর একটি কাগজ স্থাপন করুন এবং তার উপরে আগের মতো আবারও এক বা একাধিক নমুনা রাখুন। এভাবে নমুনা ও কাগজ একের পর এক সাজিয়ে নমুনার একটি গাদা (Stack) তৈরি করুন। সবশেষে নমুনার গাদাটিকে একটি ভারি প্রেসের দুডালার মধ্যে স্থাপন করুন এবং প্রেসের ফিতা টেনে অথবা স্ক্রু ঘুরিয়ে যথাসম্ভব শক্ত করে আঁটুন যেন চাপের ফলে নমুনার প্রত্যেকটি অংশ কাগজের সংস্পর্শে আসে। প্রেস না পাওয়া গেলে একটি নমুনা একটি কাগজের ভাঁজের মধ্যে রেখে বিছানার নিচে সমান স্থানে ফাঁক ফাঁক করে রাখবেন।

  মোটা আকৃতির নমুনা প্রেসের মধ্যে রাখলে অনেক স্থানে উঁচু নিচু হয় এবং চাপ দিলে নমুনার সবস্থানে কাগজ লাগে না। এ কারণে মোটা নমুনার জন্য একত্রে অনেকগুলো কাগজ নিয়ে তার মধ্যে নমুনা রাখুন। বেশি কাগজ থাকলে প্রেসের চাপে কাগজ নমুনার সব স্থানের সংস্পর্শে আসতে পারে।

  অনেক জলজ আগাছা ফিতার ন্যায় পাতলা হওয়ায় ওগুলোকে পানি থেকে উঠিয়ে চোষ কাগজের মধ্যে স্থাপন করা খুবই কষ্টকর। এ ক্ষেত্রে একটি সাদা কাগজকে লম্বালম্বিভাবে এক চতুর্থাংশ চিরে ফেলুন এবং তা পানিতে ভাসিয়ে ভিজান। তারপর নমুনা গাছটিকে পানিতে নিমজ্জিত কাগজের পাশে রেখে তার উপর আনার চেষ্টা করুন এবং নমুনাসহ কাগজটি উঠিয়ে একদিকে কিছু ঢালু করে কিছুক্ষণ রাখুন। কাগজ থেকে অতিরিক্ত পানি ঝরে গেলে কাগজসহ নমুনা চোষ অথবা খবরের কাগজের মধ্যে রাখুন এবং প্রেসের মধ্যে অন্যান্য নমুনার সঙ্গে এঁটে বাঁধুন।

  খুব বড় আকারের লতাজাতীয় আগাছা হলে তার উপরের কিছু অংশ, মাঝের কিছু অংশ ও নিচের কিছু অংশ কেটে চোষ কাগজে রাখুন।
- নমুনা কাগজের মধ্যে স্থাপন করে ২৪ ঘন্টা রাখুন। তারপর প্রেসের ডালাটি খুলে কাগজের

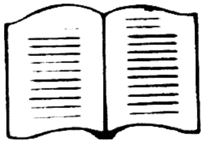
  মধ্যকার নমুনাসম হকে নতুন কাগজের মধ্যে নিয়ে প্রেসের মধ্যে রাখুন ও এঁটে বাঁধুন। ২৪ ঘন্টা প্রেসে অথবা বিছানার নিচে চাপা থাকার জন্য কাগজ নমুনা থেকে কিছু রস চুষে নেয় এবং নমুনার বিভিন্ন অংশ মোলায়েম হয়ে যায়। ভালো নমুনা তৈরি করার জন্য এ সময়ে নমুনার বিভিন্ন অংশ ইচ্ছামতো বাঁকিয়ে নতুন কাগজে স্থাপন করুন। এ সময় নমুনার বিভিন্ন অংশ স্থাপনের মধ্যে কোনো ক্রটি থাকলে তা সংশোধন করুন।
- দ্বিতীয়বারে নতুন কাগজে নমুনা স্থাপন করার পর নমুনার গাদাকে আগের মতো প্রেসে অথবা বিছানার নিচে রাখুন। নমুনা শুকানোর সুবিধার্থে নমুনাসহ প্রেসটিকে খোলা বাতাসে রাখুন। এভাবে ৩-৪ বার কাগজ বদলিয়ে নমুনা শুকিয়ে নিন। তবে, মোটা ও রসালো নমুনা হলে আরও কয়েকবার কাগজ বদলানোর প্রয়োজন হতে পারে।
- বর্ষাকালে নমুনার গাদায় কাগজের মাঝে মাঝে ঢেউ খেলানো কাগজের খন্ড (Corrugated sheet) রাখুন ও গাদাকে রোদে অথবা কৃত্রিম গরম বাতাসে রাখুন। ঢেউ খেলানো কাগজ ব্যবহার করলে তার মধ্য দিয়ে গরম বাতাস চলাচলের ফলে নমুনা শুকানোর কাজ ত্বরান্বিত হয়।
- নমুনা শুকানোর পর তাকে নমুনা স্থাপন কাগজে বা হারবেরিয়াম শিটে স্থাপন করুন। নমুনা স্থাপনের জন্য ৪২ × ২৯ সে.মি. সাইজের হারবেরিয়াম শিট ব্যবহার করুন।
- একটি শিটে একটি করে নমুনা স্থাপন করুন। বড় ও লতাজাতীয় নমুনাকে 'ঠ' অথবা 'ঘ' আকারে ভাঁজ করে স্থাপন করুন। নমুনার কান্ড যদি ভঙ্গুর প্রকৃতির হয় তাহলে যেখানে ভাঁজ করবেন সেখানে কিছুটা ছেচে (Macerate) নিবেন।
- নমুনা স্থাপনের সময় একটি পাতা অন্য পাতার উপর এবং একটি অংশ অন্য অংশের ওপর যাতে না পড়ে তার জন্য প্রয়োজন অনুসারে পাতা ও অঙ্গসমূহ ছেঁটে ফেলুন। ছাঁটার সময়

কর্তিত অংশের নিচের কিছু অংশ রাখুন (যেমন- পাতা ও ফুলের বোঁটা) যাতে বুঝা যায় কর্তিত অংশ কোথায় ছিল।

- নমুনা স্থাপনের সময় লক্ষ্য রাখুন যেন কয়েকটি পাতা সোজাভাবে (অর্থাৎ উপরিভাগ উপরের দিকে) এবং কয়েকটি পাতা উল্টাভাবে (অর্থাৎ নিচের দিকটা উপরের দিকে) থাকে।
- নমুনা বড় ও যৌগিক পাতা হলে লম্বালম্বিভাবে পাতার অর্ধেক কেটে ফেলুন।
- খুব বড় আকারের লতাজাতীয় নমুনার ক্ষেত্রে উপরের কিছু অংশ, মাঝের কিছু অংশ ও শিকড়সহ নিচের কিছু অংশ রেখে বাকি অংশ ফেলে দিন।
- যেসব নমুনার ক্ষেত্রে একটি পাতা ও একটি মঞ্জরীর বেশি শিটে স্থাপন করা যায় না সেসব ক্ষেত্রে পাতার বিন্যাস শিটের পাশে লিখে রাখুন।
- যেসব আগাছার ফুলের পাপড়ি যুক্ত থাকে, সেসব ক্ষেত্রে কয়েকটি সম্পূর্ণ ফুল ও কয়েকটি ফুল লম্বালম্বিভাবে চিরে শিটে স্থাপন করুন।
- নমুনা শিটে আঁটকানোর জন্য আঁঠা, গাম টেপ, সূতা ব্যবহার করুন। আঠাঁ শিটে লাগানোর জন্য প্রথমে একটি কাঁচের সিটে তুঁত মিশ্রিত কিছু আঁঠা পাতলা করে লাগান এবং তার ওপর নমুনাকে কিছু উপর থেকে ফেলুন। নমুনা কাঁচের উপর পড়লে নিচের দিকে আঁঠা লেগে যাবে। পরে সতর্কতার সাথে চিমটা দিয়ে নমুনাকে উঠিয়ে হারবেরিয়াম শিটের উপর ছেড়ে দিন। নমুনা হারবেরিয়াম শিটে পড়ার পর তাকে কখনো নাড়াবেন না। কারণ তাতে নমুনার গায়ে লেগে থাকা আঁঠা শিটের বিভিন্ন স্থানে লেগে একে নষ্ট করে ফেলবে। এসবের জন্য আঁঠা লাগানোর পর নমুনা স্থাপন করার পূর্বে কীভাবে উপর থেকে এটি ফেলতে হবে ঠিক করে নিন। শিটের উপর নমুনা স্থাপন করে গাম টেপ দিয়েও আঁটকাতে পারেন।
- নমুনার প্রয়োজনীয় তথ্য একটি লেবেলে লিখে নমুনার শিটের নিচের দিকে এক কোনায় আঁঠা দিয়ে আঁটকান। লেবেলের একটি নমুনা নিচে দেয়া হলো-

প্রতিষ্ঠান	সংগ্রহ নম্বর-
আগাছার নাম- প্রাপ্তিস্থান- প্রাপ্তিস্থানের অবস্থা- সংগ্রহকারী অনুসন্ধানকারী তারিখ-	

- নমুনা শিট তৈরি করার পর তা আলমারি অথবা তাকে (Shelf) বৈজ্ঞানিক শ্রেণিবিভাজন অনুযায়ী সাজিয়ে রাখুন।
- মাইট ও কীট হারবেরিয়ামকে নষ্ট করে ফেলে। এজন্য আলমারির মধ্যে ছোট ছোট কাপড়ের থলেতে কীট বিতাড়ক প্যারাডাইক্লোরোবেঞ্জিন নিয়ে বিভিন্ন তাকে রাখুন।
- বর্ষার সময় নানা ধরনের ছত্রাক নমুনা নষ্ট করে ফেলতে পারে। এ কারণে হারবেরিয়াম শিট সংরক্ষণাগারে গরম বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করবেন।



সারমর্ম ঃ কোয়ারেন্টাইন আইনের নীতিমালা অনুযায়ী আমদানিকৃত গাছগাছড়া ও এর অংশবিশেষ পর্যবেক্ষণ করে রোগমুক্তির প্রশংসাপত্র দিয়ে খালাস করার ছাড়পত্র দেয়া হয়। রোগ বহন করছে কি-না বুঝতে না পারলে নির্দিষ্ট স্থানে বীজ লাগিয়ে তার থেকে জন্মানো গাছকে পর্যবেক্ষণ করে রোগমুক্তির ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা সফল করতে হলে স্থলপথ, জলপথ ও বিমান বন্দরসহ সকল প্রবেশ পথে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ যথেষ্ট সংখ্যক পরিদর্শক নিয়োজিত করতে হবে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৪

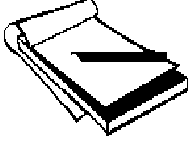
সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। আগাছার নমুনা হারবেরিয়াম শিটে স্থাপনের আগে কীভাবে শুকাতে হয়?
- ক) রোদে রেখে
- খ) চোষ কাগজ অথবা খবরের কাগজের মধ্যে রেখে
- গ) গবেষণাগারের টেবিলের উপর বিছিয়ে
- ঘ) দড়িতে বেঁধে ঝুলিয়ে গরম বাতাস প্রয়োগ করে

২। ভালো নমুনা তৈরি করতে হলে প্রথমে তাকে কতক্ষণ চোষ কাগজে রেখে বের করে নতুন কাগজে রাখতে হয়?
- ক) ১২ ঘন্টা
- খ) ২৪ ঘন্টা
- গ) ৪৮ ঘন্টা
- ঘ) ৬০ ঘন্টা

৩। আগাছা বড় হলে নমুনা কীভাবে তৈরি করতে হয়?
- ক) আগার দিক থেকে কয়েক ফুট কেটে
- খ) পাতাসহ একটি ডাল কেটে
- গ) পাতা ও মঞ্জরীসহ একটি ডাল কেটে
- ঘ) উপরের কিছু অংশ, মাঝের কিছু অংশ ও শিকড়সহ নিচের কিছু অংশ কেটে 'ঠদ অথবা 'ঘ' আকারে সাজিয়ে স্থাপন করে

৪। মাইট ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে নমুনাকে রক্ষার জন্য কী ওষুধ ব্যবহার করা হয়?
- ক) ডায়ালড্রিন
- খ) সেভিন
- গ) প্যারাডাইক্লোরোবেঞ্জিন
- ঘ) নগস



চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ৬

১। আগাছা বলতে কী বুঝায় তা সংক্ষেপে লিখুন।
২। আগাছার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন।
৩। পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে আগাছাকে কীভাবে শ্রেণিবিভাগ করা যায়?
৪। আগাছার জীবনচক্রভিত্তিক শ্রেণিবিভাগটি লিখুন।
৫। প্রতিরোধকরণ পদ্ধতিতে আগাছা দমনের অর্থ কী বুঝিয়ে লিখুন।
৬। জৈবিক পদ্ধতিতে আগাছা কীভাবে দমন করা যায়।
৭। স্পর্শক ও প্রবাহমান আগাছানাশকের অর্থ কী? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে লিখুন।
৮। মাটিতে আগাছানাশক কীভাবে ব্যবহার করা হয়।
৯। সমন্বিত পদ্ধতিতে আগাছা দমনের অর্থ কী? উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করুন।



উত্তরমালা - ইউনিট ৬

পাঠ ৬.১

১। ক ২। ক ৩। গ ৪। ঘ ৫। ক

পাঠ ৬.২

১। খ ২। গ ৩। গ ৪। ক ৫। ক ৬। ক

পাঠ ৬.৩

১। ঘ ২। ক ৩। গ

পাঠ ৬.৪

১। খ ২। খ ৩। ঘ ৪। গ

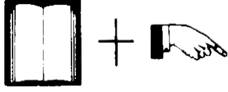
ইউনিট ৭
উদ্ভিদ কোয়ারেন্টাইন

ইউনিট ৭ উদ্ভিদ কোয়ারেন্টাইন

রোগের কারণকে এড়িয়ে রোগ দমন সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে রোগজীবাণু যাতে বিস্তারলাভ করতে না পারে সেজন্য বর্জন (Exclusion) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধন বর্জন পদ্ধতির একটি বিশেষ ব্যবস্থা।

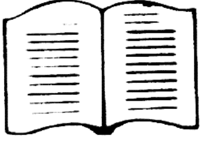
এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে কোয়ারেন্টাইন ও কোয়ারেন্টাইনের নীতিমালা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৭.১ কোয়ারেন্টাইন



এ পাঠ শেষে আপনি–

- কোয়ারেন্টাইনের অর্থ কী তা বলতে ও লিখতে পারবেন।



আবাহাওয়া ও অন্যান্য নানাবিধ কারণের জন্য সব দেশে সব রোগ হয় না কিন্তু কোনোভাবে কোনো রোগজীবাণু এক দেশ থেকে অন্য দেশে এসে পড়লে কয়েক বছরের মধ্যে রোগ বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে। বীজ, গাছ ও অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য চলাচলের মাধ্যমে পোকামাকড় ও আগাছার ন্যায় রোগজীবাণুও এক স্থান থেকে অন্য স্থানে এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এক দেশের কোনো মারাত্মক জীবাণু অন্য দেশে যাতে আসতে না পারে সেজন্য আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এ আইনগত ব্যবস্থার নামই হচ্ছে কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গরোগনিরোধন আইন। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানি ও রপ্তানির সময় গাছগাছড়া ও কৃষিজাত দ্রব্যাদির সাথে নানাপ্রকার রোগ ও তার জীবাণু এক

দেশ থেকে অন্য দেশে যাতে ছড়াতে না পারে সেজন্য বিমান, সাম দ্রিক ও স্থল বন্দরে বিদেশ হতে আগত সকল প্রকার গাছগাছড়া ও এর অংশবিশেষ পরীক্ষা করে দেখার জন্য উদ্ভিদ রোগ সংরক্ষণ বিভাগের কোয়ারেন্টাইন শাখার কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকেন। এসব কর্মকর্তরা কোয়ারেন্টাইন নীতিমালার শর্ত অনুযায়ী আমদানিকৃত কৃষিজ পণ্য পরীক্ষা করে দেশের অভ্যন্তরে নেয়ার অনুমতি দেয়া যাবে কি-না তার ব্যবস্থা নেন। এ ব্যবস্থায় একটা অঞ্চলে নতুন রোগের আগমণ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

ফ্রান্সে সর্বপ্রথম সপ্তদশ শতাব্দীতে রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়। ঐ আইন করা হয়েছিল গমের মরিচা রোগের বিকল্প পোষক গাছ বারবারিকে নষ্ট করার জন্য। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এ ধরনের আইন প্রথম প্রণয়ন করা হয়। ভারতবর্ষে আইনের মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণের প্রথম চেষ্টা নেওয়া হয় ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে। ঐ সময় ÔDestructive Insects and Pest Act নামে’ একটি আইন পাশ করা হয় এবং পরবর্তীতে তা বহুবার সংশোধিত করা হয়। কিন্তু তবুও ঐ আইন একেবারে ত্রুটিমুক্ত হতে পারেনি। তার ফলে ভারতে অনেক রোগ (যথা- গোল আলুর ওয়ার্ট রোগ, ধানের ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট রোগ ও সোনালি কৃমি প্রভৃতি) বিদেশ থেকে এসেছে। আলুর ওয়ার্ট রোগ দার্জিলিং-এ এমন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে এখন আইন করে ঐ অঞ্চল থেকে অন্যত্র আলু রপ্তানি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশেও অনেক রোগ (যথা- ধানের ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট, টুংরো রোগ ইত্যাদি) অন্য দেশ থেকে এসেছে। তবে দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে অন্যান্য দেশের ন্যায় এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে রোগ যাতে বিস্তৃত হতে না পারে তা বন্ধ করার তেমন কোনো আইন প্রয়োগ করা হয় না। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক মারাত্মক রোগের প্রসার বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। আইনের মাধ্যমে রোগের প্রসার একেবারে বন্ধ করা না গেলেও কিছু কিছু রোগের পৃথিবী জুড়ে প্রসার যে বন্ধ হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ আইনের জন্য তামাকের ‘ব্লু মোল্ড’, ভুট্টার উইল্ট, আলুর ওয়ার্ট প্রভৃতি মারাক্তক রোগের অনুপ্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা অমাদের দেশে এখনও সম্ভব হয়নি।



সারমর্ম ঃ এক দেশের কোনো মারাত্তক জীবাণু অন্য দেশে যাতে আসতে না পারে সেজন্য আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এ আইনগত ব্যবস্থার নামই হচ্ছে কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গরোগনিরোধন আইন। ফ্রান্সে সর্বপ্রথম সপ্তদশ শতাব্দীতে রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়। ঐ আইন করা হয়েছিল গমের মরিচা রোগের বিকল্প পোষক গাছ বারবারিকে নষ্ট করার জন্য। ভারতবর্ষে আইনের মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণের প্রথম চেষ্টা নেওয়া হয় ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা নেয়া হয় কোথায়?

ক) কেবল সমুদ্র বন্দরে
খ) কেবল সীমান্তের স্থল বন্দরে
গ) কেবল বিমান বন্দরে
ঘ) দেশের বিভিন্ন প্রবেশ পথে

২। কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা কারা নিয়ন্ত্রণ করে?

ক) পণ্য আমদানিকারকরা
খ) পণ্য রপ্তানিকারকরা
গ) উদ্ভিদ রোগ সংরক্ষণ বিভাগীয় কর্মকর্তারা
ঘ) সীমান্ত প্রহরীরা

পাঠ ৭.২ কোয়ারেন্টাইন নীতিমালা



এ পাঠ শেষে আপনি–

■ কোয়ারেন্টাইন আইনের নীতিমালার শর্তগুলো বলতে ও লিখতে পারবেন।



নীতিমালা

কোয়ারেন্টাইন আইনের নীতিমালার শর্তানুবলে আমদানিকৃত কৃষিজ পণ্য দেশের অভ্যন্তরে নেয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়। নীতিমালা সম্বন্ধে নিচে আলোচনা করা হলো।

পর্যবেক্ষণ ও রোগমুক্তির প্রশংসাপত্রের মাধ্যমে ছাড়পত্র প্রদান ঃ এ পদ্ধতিতে আমদানিকৃত গাছ-গাছড়া বন্দরে পরীক্ষা করে দেখা হয় এরা নিরোগ কি-না। নীরোগ হলে প্রশংসাপত্র বা সার্টিফিকেট দেয়ার পরই ঐসব মাল খালাস করা হয়। অনেক সময় আমদানিকৃত গাছগাছড়া নিরোগ এ মর্মে কোনো প্রশংসাপত্র রপ্তানিকারক দেশের যথার্থ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে দেয়া থাকলে মাল খালাস করার অনুমতি প্রদান করা হয়। এ ব্যবস্থা যে সম্পর্ণ নির্ভরযোগ্য তা বলা যাবে না। বীজ আমদানির সময় সব বীজ যথাযথভাবে পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব নয়। বীজ যে জীবাণু বহন করছে সব সময় তা বোঝা যায় না। এ কারণে বীজ রপ্তানিকারক অনেক দেশে ফসল মাঠে থাকার সময় থেকে বীজ আহরণ সময় পর্যন্ত নজর রাখেন এবং যেখানে রোগের আক্রমণ হয়নি বা হলেও নির্ধারিত নিম্নতম মাত্রার নিচে থাকে কেবলমাত্র সেসব মাঠ থেকে বীজ সংগ্রহ করেন এবং রপ্তানির সময় এসব বীজের সঙ্গে ফাইটোস্যানিটারি সার্টিফিকেট নিয়ে এসব বীজ রপ্তানি করেন। সব দেশে কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা একই মানের নয় এবং এভাবে যে এক দেশ থেকে অন্য দেশে রোগের প্রসার একেবারে বন্ধ করা গেছে তা বলা যায় না। তবে এ ব্যবস্থার জন্য পৃথিবী জুড়ে অনেক মারাত্তক রোগের যে ব্যাপক প্রসার রোধ করা গেছে তাতে সন্দেহ নেই। সাবধানতার জন্য বীজ সেসব দেশ থেকেই আমদানি করা উচিত যেখানে বিশেষ রোগের প্রকোপ খুব কম হয় এবং ফসলের স্বাস্থ্যনীতি ব্যবস্থাগুলো নির্ভরযোগ্য।

শোধনের মাধ্যমে ছাড়পত্র প্রদান ঃ সব দেশের স্বাস্থ্যনীতি সবাই অবগত নহেন। এজন্য অনেক দেশে অন্য দেশ কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসাপত্র ততটা বিশ্বাসযোগ্য হয় না বলে নিজ দেশে আমদানিকৃত পণ্য শোধন করে নেয়ার পর মাল খালাসের ছাড়পত্র দেওয়া হয়।

নির্দিষ্ট স্থানে বীজ থেকে গাছ জন্মানোর পর পর্যবেক্ষণ করে ছাড়পত্র প্রদান ঃ অনেক ক্ষেত্রে আমদানিকৃত গাছগাছড়াকে, বিশেষ করে বীজে রোগজীবাণু পাওয়া না গেলেও তাদেরকে রোগাক্রান্ত বলে সন্দেহ করা হয়। এসব ক্ষেত্রে আমদানিকৃত গাছ বা বীজ প্রথমে কোনো নির্দিষ্ট সংরক্ষিত স্থানে জন্মিয়ে দেখতে হয় গাছে কোনো রোগ হয় কি-না এবং রোগমুক্ত প্রমাণিত হলে দেশের অন্যান্য স্থানে চাষাবাদের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়। বীজবাহিত ভাইরাস রোগের ক্ষেত্রে এ নীতি অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ছোট সাইজের আলুর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আলু স্বাভাবিক অবস্থায় যেমন ছোট হতে পারে ভাইরাসের সংক্রমণেও ছোট হতে পারে। এসব ছোট আলু দেখে বলা যায় না এটি ভাইরাস মুক্ত কি-না। সেজন্য এসব ছোট আলু লাগিয়ে যে গাছ হয় তার বৃদ্ধি ও অন্যান্য লক্ষণ দেখে বোঝা যায় বীজ ভাইরাস মুক্ত ছিল কি-না।

সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রদান ঃ কোনো কোনো রোগ স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রতিবছরই ফসলের প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। এক্ষেত্রে আইন করে এসব স্থান থেকে বীজ ও গাছগাছড়া সরকারী নিষেধাজ্ঞা বলে কোনো মতেই আমদানি করতে দেয়া হয় না। এমনকী নিজের দেশেও আক্রান্ত অঞ্চল থেকে মাল অন্যস্থানে রপ্তানি বন্ধ করে দেয়া হয়। ভারতে এ সঙ্গরোধ নিষেধাজ্ঞার বলে দার্জিলিং জেলা থেকে বীজ আলু ওয়ার্ট রোগের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সমতল এলাকায় নেওয়া যায় না (ওয়ার্ট রোগের জন্য)।

আমাদের দেশে উদ্ভিদ রোগ সংরক্ষণ বিভাগ কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন।

কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা সফল হয় তখনই যখন স্থলপথ, সমুদ্রপথ ও বিমান পথে দেশের বিভিন্ন প্রবেশ পথে কোয়ারেন্টাইন সম্পর্কে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ যথেষ্ট সংখ্যক পরিদর্শক নিয়োজিত থাকেন। আমাদের দেশে উদ্ভিদ রোগ সংরক্ষণ বিভাগ কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন। তবে, উপযুক্ত অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোকের অভাবে এবং উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাবে আমাদের দেশে কোয়ারেন্টাইন আইন প্রয়োগের অনেক ত্রুটি রয়েছে।



সারমর্ম ঃ কোয়ারেন্টাইন নীতিমালা অনুযায়ী আমদানিকৃত কৃষিজ পণ্য পর্যবেক্ষণ ও রোগমুক্তির প্রশংসাপত্রের মাধ্যমে, শোধনের মাধ্যমে, নির্দিষ্ট স্থানে বীজ থেকে গাছ জন্মানোর পর পর্যবেক্ষণ করে দেশের অভ্যন্তরে নেয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারী নিষেধাজ্ঞা বলে কোনো মতেই পণ্য আমদানি করতে দেয়া হয় না।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.২

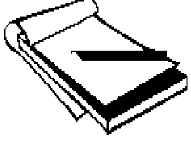
সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। কোয়ারেন্টাইন নীতিমালার সরকারী নিষেধাজ্ঞা বলতে কী বুঝায়?
- ক) আমদানিকৃত বীজ শোধন করা না হলে খালাস করতে অনুমতি না দেয়া
- খ) আমদানিকৃত বীজের সাথে শোধনের প্রশংসাপত্র না থাকলে খালাসের অনুমতি না দেয়া
- গ) আমদানিকৃত বীজ উন্নত ও বিশ্বাসযোগ্য দেশ থেকে না আনলে খালাসের অনুমতি না দেয়া
- ঘ) আমদানিকৃত বীজ কোনো অবস্থাতেই খালাস করার অনুমতি না দেয়া

২। কোয়ারেন্টাইনের কয়টি নীতিমালা?
- ক) দুটি
- খ) তিনটি
- গ) চারটি
- ঘ) পাঁচটি

৩। কোয়ারেন্টাইনের উদ্দেশ্য কোন্‌টি?
- ক) রোগাক্রান্ত ক্ষেতের ফসলে রোগনাশক স্প্রে করে রোগ দমন করা
- খ) রোগাক্রান্ত বীজকে রোগনাশক দিয়ে শোধন করে রোগ দমন করা
- গ) আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে রোগ দমন করা
- ঘ) রোগাক্রান্ত ফসলের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে রোগ দমন করা

৪। কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা কোথায় নেয়া হয়?
- ক) কেবল সমুদ্র বন্দরে
- খ) কেবল স্থল বন্দরে
- গ) কেবল বিমান বন্দরে
- ঘ) সকল প্রবেশ পথে



চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ৭

১। কোয়ারেন্টাইন অর্থ কি ?
২। কোয়ারেন্টাইনের নীতিমালা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করুন।



উত্তরমালা - ইউনিট ৭

পাঠ ৭.১
১। ঘ   ২। গ

পাঠ ৭.২
১। ঘ   ২। গ   ৩। গ   ৪। খ